জয়া

শ্রীঅবিনাশ সাহা



ভাদ্র, ১৩৪০

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

ভারতী লাইব্রেরী

১৪৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
অজিত মিত্র
বুকসাপ্লায়ার্স এণ্ড পাব্লিসার্স,
৯, কালী মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট—
শ্রীজয়গোপাল সাহা

মুদ্রাকর—
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৬ চালতাবাগান লেন,
কলিকাতা—৬

মূল্য—তিন টাকা

াল আমলের সাহিত্যিকরা হচ্ছেন ডাক্তার। আর তা না হয়েও উপায় নেই।" ানবাদের অন্তিম পাদে এখন পৃথিবী। তাকে ভীষণ রোগে ধরেছে, তার উঠেছে াাভিশ্বাস। এ রোগের নিদান খুঁজে পাবার জন্ত মানুষ দিকে দিকে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। তাই সাহিত্যিকরাও কলমকে এখন স্টেথস্কোপের কাজে লাগাচ্ছেন। রোগের লক্ষণগুলো তারা বুঝতে চাইছেন, হেতু কি তাও নির্ণয় করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। কেউবা তাই মানব মনের গভীরে শল্য চালাচ্ছেন কউবা সমাজ দেহে। অবিনাশবাবুও সে কাজে ব্রতী।

তিনি সাহিত্যে নবাগত নন। প্রথম জীবনে তিনি কবিতা হাতে বাণীর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। তরুন মনে তখন অনেক আশা। তাই প্রেমের কূজনে গুঞ্জরণে ভরে উঠেছিল তার কাব্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। [illegible]কালের উপন্যাসেও ছিল তারই পুনরাবৃত্তি। যুগ-ধর্মের টানে জাতীয় [illegible]র স্পর্শও তাতে লেগেছিল। কিন্তু তখনো কলম স্টেথস্কোপে রূপান্তরিত হয়নি, তিনি সমাজের মর্মমূলে শল্য প্রচারের কথাও ভাবেননি। কিন্তু সমস্যার ঘূর্ণি হওয়ায় এবার তিনি নেমে এসেছেন বাস্তবে। এপথ ঘোরালো, আরো জটিল। রাজনীতি, সমাজনীতি আর অর্থনীতিতে আকীর্ণ। ভারতের প্রাণ কেন্দ্র বাংলাকে একদিক বৃটিশ শাসক চেয়েছিল দু'খণ্ড করতে। সেদিন ভারত গর্জে উঠেছিল। কিন্তু আর একদিন সেই ভাগই হ'য়ে গেল ভেদ-বুদ্ধির বীজ বুনে, দুই জাতির ধুয়ো তুলে। সেদিন গর্জন উঠলো না, মেনে নেওয়াটাই হোলো সারকথা, শেষকথা। তারই ফলে বাস্তুহারা সমস্যা। এ সমস্যায় আজ দ্বিধা বিভক্ত ভারত বিপর্যস্ত। এ এক রোগ। এর নিদান সব মহলই খুঁজে বার করতে চাইছেন, প্রতিকারের উপায় কি ভাবছেন। সাহিত্যিকরাও বসে নেই। তারাও নিদান খুঁজছেন, দাওয়াই বাতলাচ্ছেন। কেউবা সংস্কারের পথে প্রতিকার খুঁজছেন, কেউবা বিপ্লবের। অবিনাশবাবুর নির্দেশও সেইদিকে। কিন্তু রাজনীতির দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি ফাঁদেননি, সমাজ ব্যবস্থার বিকৃত রূপ নানা ঘটনার ঘত প্রতিঘাতে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। সেখানে নরনারী জীবন্ত, লেখকের হাতের পুতুল তারা হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসখানিও এই সমাজ ব্যবস্থা অব্যবস্থার একখানি দলিল হয়ে উঠেছে।

এখানি অবিনাশবাবুর কীর্তিস্তম্ভ না হোক, এখানে তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। এ তার সাহিত্যের নিশানা পাথর।

আমরা পাঠকদের কাছে উপন্যাসখানি পেশ করছি, তাঁহা পড়ে দেখুন, বিচার করুন, উপভোগ করুন, নিজেদের অভিজ্ঞতার নিরিখে যাচাই করে দেখুন—এই আমাদের অনুরোধ।

প্রকাশক

এক

আবার ঢাকায় দাঙ্গা। নবাবপুর রোড ধরে এগিয়ে আসে বিরাট বিক্ষুব্ধ জনতা। পৈশাচিক আওয়াজে ফেটে পড়ে দিগন্ত—হিন্দুর রক্ত চাই, কোলকাতায় মুসলিম নির্যাতনের প্রতিশোধ চাই, মুসলমান ভাইলোক সব এক হও...

পঞ্চাশ উর্ধ্ব পরেশবাবু, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক—যিনি বিগত পঁচিশ বছরে অন্তত ডজন দুই দাঙ্গাকে উপেক্ষা করে পরম সাহসিকতার সহিত বাস করে আসছেন এই সদর রাস্তার ওপর স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে, আজ সহসা অন্তরে কেঁপে ওঠেন। পাকিস্থানী জুজুর ভয় যাঁকে তিল মাত্র বিচলিত করতে পারেনি—যিনি শহরের প্রতিটি লোককে নিরর্থক ভিটে মাটি ত্যাগ করে যেতে নিষেধ করে আসছেন, আজ সেই পরেশ মাষ্টার ভয়ে বিহ্বল! কম্পমান পাদক্ষেপে সদরে তালাচাবি দিয়ে, বয়স্থা কন্যা আর অপোগণ্ড দুটি শিশু পুত্র সহ সস্ত্রীক এসে আশ্রয় নেন ছাদের চিলেকোঠার নিভৃত অন্ধকারে। পোষা কালো বিড়ালটা, যেটা পরেশনাথের অর্ধভুক্ত থালার ওপর বসে পরমানন্দে মাছের কাঁটা চিবুচ্ছিল সেটাও আহার্য ছেড়ে ত্রস্ত পদে ছুটে এসে আশ্রয় খোঁজে ওদেরই পাশে। কোলের বছরখানেকের বাচ্চাটা গরমে সহসা চীৎকার করে ওঠে। গৃহিণী তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে স্তন্যদানে

নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন ওকে। কন্যা জয়া বিজয়া, স্ত্রী শিবানী, এমন কি কচি শিশু দুটি হতে আরম্ভ করে মায় পোষা বিড়ালটা পর্যন্ত সকলেরই সজল দৃষ্টি পরেশবাবুর ওপব, ওগো আমাদের বাঁচাও, রক্ষা কর।

নিরুপায় পরেশনাথ কোন উপায় খুঁজে পান না। খিড়কীব দ্বার ঈষৎ ফাঁক করে নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রতিফলিত করে দেন সদর বাস্তার ওপর। ঐ, ঐ ব্যায়ামবীর লোকনাথের তলপেটে কে যেন ছোবা বসিয়ে দেয়। ধুলোয় গড়াগড়ি যায় লোকনাথ—এ পাড়াব শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা। বলরাম ঘোষের সোনা-রূপোব দোকান লুটে নিয়ে যায় একদল দুর্বৃত্ত। প্রাণভয়ে সে কোথাও পালিয়েছে না লোকনাথের দশাই প্রাপ্ত হয়েছে কে জানে? রাস্তার দু'পাশের দোকান-পাট গুলো সব দাউ দাউ কবে জ্বলছে। ওকি! চুপ, চুপ কর তোমরা সব।··ও আমাদের সবিতার চীৎকার না!··· হ্যাঁ, সবিতাই তো। ওই তো আব একদল পিশাচ ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে। বেচারা দুদিন হয় শ্বশুর বাড়ী থেকে বাবার কাছে এসেছে। কই, শশীনাথবাবুব তো কোন সাড়া পাচ্ছিনে! তবে কি তিনিও···না, না কেউ চীৎকার ক'র না। টের পেলে আমাদেরও নিস্তার নেই।···বলতে বলতে রুদ্যমানা স্ত্রী কন্যার মুখে কাপড় গুজে দেন ওদের নিরস্ত করতে। কিন্তু নিজে নিরস্ত হতে পাবেন না। মৃত্যু-বিভীষিকা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতে থাকে।

প্রাণের দায় বড় দায়। বাঁচার শেষ চেষ্টায় নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন কিঞ্চিৎ ছাদের দিকে। ইতস্তত খুঁজে বেড়ান পশ্চাৎবর্তী রহমৎ খাঁকে।···হ্যাঁ. ওই তো রহমৎ সাহেব দোতালার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হাসছেন। তবে কি তিনিও মেতেছেন এই পৈশাচিক খেলায়! বিপদে একমাত্র তিনিই যে ভরসা। বুকভরা আশা নিয়ে করুণ কণ্ঠে মিনতি জানান পরেশবাবু, বড় ভাই—বড় ভাই আমাদের রক্ষা করুন বাঁচান।

চমকে ওঠে রহমৎ খাঁ। পরেশনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে সতর্ক বাণী জানায়, আপনি বাইরে কেন? শীগ্‌গির ঘরের ভেতর যান। ছেলে মেয়ারা সব কোথায়?…

বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় হাত জোড় করে অনুরোধ করেন পরেশবাবু, ঘরের ভেতর গিয়ে আর কি হবে দাদা; শুনতে পাচ্ছেন না, সদর যে ভাঙছে। দোহাই আপনার আল্লার, আমাদের রক্ষা করুন।…

পুনশ্চ বিরক্তি প্রকাশ করে আশ্বাস দেয় রহমৎ, আচ্ছা আপনি ভেতরে যান, দেখি আমি কি করতে পারি।

শ্বাস রোধ করে দুর্গা নাম জপ করতে থাকেন সকলে ঘরের মধ্যে। দেহে যেন প্রাণ নেই।

মিনিট দশ কেটে যায়। আর কোন শব্দ কানে আসে না। হয়ত এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। জনতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু মুশকিল পাড়ার গুণ্ডাদের নিয়ে। জয়া বিজয়ার দিকে দৃষ্টি যেতেই শিউরে ওঠেন পরেশবাবু। দেহের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে হিম হয়ে আসে।

'মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই'—জোরালো কণ্ঠস্বর ভেসে আসে রহমতের তরফ হতে।

সন্তর্পণে দোর খুলে বেরিয়ে আসেন পরেশবাবু।

আশ্বাস দেয় রহমৎ, কোন ভয় নেই আপনাদের। আমি মিলিটারী ক্যাপ্টেনকে বলে এসেছি। ওরা আপনার সদরের কাছেই 'পিকেট' বসাবে। আমি আবার আজ রাত্রেই বরিশাল যাচ্ছি, খুব হুশিয়ার থাকবেন যেন। ওদের নির্দেশ ছাড়া এক পাও নড়বেন না।

শত আশা ভরসার মধ্যেও বুকে বল পান না পরেশনাথ। ভীত শুষ্ক কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ জানান, আমাদের একলা ফেলে চলে যাচ্ছেন

দাদা ! দয়া করে অন্তত আমাদেরও কোলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

রাস্তাঘাট এখন নিরাপদ নয়। সময় হ'লে ওরাই সে ব্যবস্থা করবে। আপনি শুধু ওদের প্রতি একটু লক্ষ রাখবেন। আদর আপ্যায়নের যেন এতটুকু ত্রুটি না হয়।···গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় রহমৎ।

পরেশনাথ আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পান না। নিরুপায় বন্দীর মত খানিক চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকেন। সদরে কড়া নাড়া পড়ে আবার। চমকে ওঠেন আপন মনে। রহমৎ তখন রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। ভীত কণ্ঠে তাকেই পুনশ্চ শুধোন, কে যেন সদরে আবার কড়া নাড়ছে দাদা !

ভয় নেই, ও মিলিটারী ছাড়া আর কেউ নয়। আপনি নিশ্চিন্তে দোর খুলে দিনগে,···নির্দেশ দেয় রহমৎ।

উপায়হীন পরেশনাথ পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলেন। দুর্ দুর্ করে কাঁপতে থাকে বুক। দরজার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে সত্যি মিলিটারী ইউনিফর্ম দেখে কতকটা নির্ভয়েই দোর খুলে দাঁড়ান। দু'জন রাইফেলধারী উঠোনে প্রবেশ করে প্রশ্ন করে, আপনার নাম পরেশবাবু ?

আজ্ঞে হ্যা।

কোন ভয় নেই আপনাদের। আমরা আপনার সদরের কাছেই আছি।

ধন্যবাদ আপনাদের,···জোড় হাত করে ভদ্রতা জ্ঞাপন করেন শিষ্টাচারী শিক্ষক।

সৈনিকদ্বয় আর কোন কথা না বলে সোজা বেরিয়ে যায় রাস্তার দিকে। দোর বন্ধ করতে গিয়ে ভাবেন পরেশনাথ, একটু চা পানের আমন্ত্রণ জানালে হ'ত না !···জয়া বিজয়া দোতালার রেলিং-এ ঝুঁকে সব দেখছিল। হঠাৎ দৃষ্টি ওদের ওপর প্রতিফলিত হতেই কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি খিল বন্ধ করে ওপরে উঠে আসেন। শীতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়।

দুই

রাত আটটা। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত। বুকের ভেতর হাড় কাঁপছে। দুপুর বেলার হৈ চৈ'এ কারও ভাল করে খাওয়া হয়নি। গৃহিণী শিবানী দেবী তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে রাতের খাবার তৈরী করছেন। পরেশনাথ সান্ধ্য আহ্নিকে উপবিষ্ট। "বিপদে শ্রীমধুসূদন", প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়েই ইষ্ট দেবতার ধ্যান করছেন তিনি। ঝি কাজে আসেনি। জয়া বিজয়া নীচের কলতলায় দুপুরের এঁটো বাসনগুলো মাজছে। বুটের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সদরে আবার কড়া নাড়া পড়ে। হকচকিয়ে ওঠে দু'বোন। ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও নিশ্চিত মিলিটারী জেনেই জয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সদর খুলে দেয়। দুজন বলিষ্ঠ সেনানী ঢুকতে এসে থমকে দাঁড়ায়। রাস্তার উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে জল্ জল্ করছে বলিষ্ঠ দেহ। পরিচ্ছদে মনে হয় কোন পদস্থ ব্যক্তিই হবে। ঈষৎ হাসিতে প্রশ্ন করে একজন, তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

প্রথমটা থতমত খেয়ে যায় জয়া। কয়েক পা পেছিয়ে এসে ভাবে, কোনরূপ অসৌজন্য দেখালে নিশ্চয়ই অপরাধ নেবে ওরা। তা'ছাড়া এতে সংকোচের কি আছে। যারা রক্ষক···বিপদের বন্ধু···কলেজে-পড়া মেয়ে পুনশ্চ একটু এগিয়ে এসেই উত্তর দেয়, না, অসুবিধে আর কি? আপনারা যখন রয়েছেন।

হ্যাঁ, কোনরূপ অসুবিধে হলেই আমাদের খবর দেবে ···বলতে বলতে আর একবার উন্মত্ত দৃষ্টিতে তাকায় দু'জন ওর দিকে। মুখ নত করে দেয় বেচারা। সৈনিকদ্বয় পেছন ফিরে শিস দিতে দিতে কয়েক পা রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সদর বন্ধ করতে উদ্যত হয় জয়া।

কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করার পূর্বেই পুনরায় একজন ফিবে এসে অনুবোধ করে, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, রাস্তার দোকানগুলোও সব বন্ধ, একটু চা খাওয়াতে পার ?

আশঙ্কায় দুর্ দুর্ করে ওঠে জয়ার বুক। কিন্তু না বলার উপায় নেই। একটু অপ্রস্তুত হয়েই আহ্বান জানায়, আসুন।

খুশিতে উত্তর কবে ঢেঙাটা, না না এখন নয়। একটু পড়ে ঘুবে আসছি।

যন্ত্রচালিতের ন্যায় সদব বন্ধ করে কাঁপতে থাকে জয়া। কেন যেন সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বিজয়া কাছে এসে প্রশ্ন কবে, কি বলে গেল রে ?

চা খাবে।

বলিস্ কি রে! উপায় ?

উপায় আবাব কি। চা কবে খাওয়াতে হবে ?

হ্যাঁ, চা করে খাওয়াবে না ছাই! তুই ওপরে চল্।

পরেশনাথ কড়া নাড়ার শব্দ শুনে যোগাসন ছেড়ে উঠে এসেও সৈনিকদ্বয়েব নাগাল পেলেন না। ওবা ততক্ষণে কথা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে। পেছন ডেকে আব ঝঞ্ঝাট বাড়ালেন না। জয়াব মুখের ভীতিব ছায়া বিহ্বল করে তোলে। বিরক্তির সুরে শাসিয়ে ওঠেন, তোরা এতক্ষণ নীচে কি করছিলি ? শীগ্‌গির ওপরে চল।

দু'বোন তাড়াতাড়ি বাসনগুলো পাঁজা করে নিয়ে ওপরে উঠে আসে। বিজয়ার মুখ থেকে সৈনিকদ্বয়ের আব্দার শুনে নিজেও অন্তরে দুর্বল হয়ে পড়েন। তবু কৃত্রিম সাহস দেখিয়ে অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করেন, বেশত তোরা সব যোগাড় করে রাখ, আমি ওদের নীচের ঘরে বসিয়ে চা খাইয়ে দেব।

রাত দশটা। আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন। শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভেদ করে

দূরে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে ধূমায়িত অগ্নিশিখা। কোথাও বা ধ্বনিত হচ্ছে প্রেতলোকের পৈশাচিক আওয়াজ, “আল্লাহো আকবর।” সামনের সদর রাস্তার ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা শব দেহ নিয়ে থেকে থেকে চীৎকার করে উঠছে একদল খেঁকী কুকুর টানাটানি আর ভাগাভাগি নিয়ে। সমস্ত নগরী যেন ডুকরে কাঁদছে। পরেশনাথ কোন রকমে নৈশ আহার গলাধঃকরণ করে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর বসে কি যেন ভাবছেন। সারাদিনের ক্লান্তিতে চোখ ঘুমে বুজে আসছে, অথচ ঘুমনোর উপায় নেই। উৎকণ্ঠায় অবসন্ন দেহটা উৎকর্ণ হয়ে আছে সদরের দিকে। শিবানী দেবী কোলের বাচ্চাটা ও পাঁচ বছরের দীপুকে ঘুম পাড়িয়ে জয়া বিজয়াকে খেতে দিতে উদ্যত হয়েছেন, সদরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন পরেশনাথ। সকলের মুখেই নেমে আসে ভীতির ছায়া। কেউ আর খেতে বসে না ওরা।

সদর খুলে দিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানান পরেশনাথ। সৈনিকদ্বয় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে দেখে যেন খুশি হতে পারে না। বিস্ময়ের সুরে চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করে, আপনি! এখনও ঘুমুননি?

আপনাদের চা না খাইয়ে শুই কি করে?—বিনীতভাবে উত্তর করেন কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক।

নির্লজ্জের মত প্রত্যুত্তর করে থ্যাব্‌বাটা, তাতে আর কি হয়েছে? আপনার মেয়েরাই তো রয়েছে।

চমকে ওঠেন পরেশবাবু। ঠিকরে পড়তে চায় দুটি সতেজ বহ্নিমান চোখ বর্বর দুটোর ওপর। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের অসহায়তার কথা ভেবে শান্ত ভাবেই উত্তর দেন, ওরা ছেলে মানুষ, এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সৈনিকদ্বয় ঈষৎ হাসিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পরস্পর। পরেশনাথ

লজ্জা-ক্ষুব্ধ-চিত্তে নীচের পাশাপাশি তুটি ঘবের্ একটিতে এনে বসান ওদেব। দ্বিতীয় কোনরূপ বাক্যব্যয় না কবে ছুটে যান দোতলায় চা আনতে। অন্তরে ঝড় ওঠে, সৈনিকদ্বয় ততক্ষণে মনের আনন্দে সিগারেট ধরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো জয়া-বিজয়াব ফোটোর দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণে চলে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পরেশনাথ একখানি রেকাবীতে করে তু' কাপ চা ও খান কয়েক বিস্কুটসহ পুনরায় হাজির হন। বর্ব্বর তু'টো ফোটো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পূর্ববৎ বিস্ময় প্রকাশ করে, আপনি যে! ওদেব ডেকে দিন?

ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।…মুখ নত করে উত্তব করেন শিক্ষকের গাম্ভীর্য নিয়ে।

ফুঁসে ওঠে ঢেঙাটা, ঘুমুলে কি মানুষ জাগে না? যান, ডেকে দিন ওদেব।

পরেশনাথ ইতস্তত দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার ভাবেন, এক ঘুষিতে দেন পিশাচটার নাক-মুখ থেত করে। পরক্ষণেই নিজের তুর্বল মুহূর্ত স্মরণ করে নিরস্ত হন। জোর দেখান বৃথা। কিন্তু কোন উপায়ও খুঁজে পান না নিষ্কৃতি লাভের।…ঢেঙাটা পুনরায় মাটিতে বুট ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে, দাঁড়িয়ে রইলেন বে, যান? বলছি না, পাড়ার অন্যান্য মেয়ের সম্বন্ধে ওদের সঙ্গে আমাদের জরুরী আলোচনা আছে।

নিরুপায় পরেশনাথ শ্লথ পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সিঁড়ি দিয়ে আর উঠতে পাবেন না। গায়ে কে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে ওপরে উঠে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন স্ত্রীর সম্মুখে। মুখে একটি কথাও সবে না। গভীর মৌনতার মধ্য দিয়ে কেটে যায় মুহূর্ত। অবশেষে কথাটা কোন রকমে ব্যক্ত করে পুনরায় কেঁদে ওঠেন ডুকরে অবোধ শিশুর মত।

জয়া বলির পাঁঠার মত অন্তরে কাঁপছিল। তবু সাহসে নির্ভর করেই সান্ত্বনা দেয় বাবাকে, তুমি মিছে ভয় কর না বাবা। বেশ আমরাই যাচ্ছি।

পাগলের মত ছুটে জড়িয়ে ধরেন গিয়ে ওদের আপন বক্ষে। না—না, সে হ'তে পারে না।···

জয়া পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠেই প্রবোধ দেয়, বিপদে অধীর হতে নেই বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমরা এক্ষুণি ঘুরে আসছি।

উত্তরের জন্য আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় দু'বোন ধীর পদক্ষেপে। বর্বররা আরও দু'জন প্রহরী নিযুক্ত করেছে সিঁড়ির পাশে।—যাতে ওপর থেকে নীচে এসে কেউ না বাধা দিতে পারে।

নমস্কার জানিয়ে প্রবেশ করে দু'বোন দু'টি নিষ্পাপ জীবন। শিকার কাছে পেয়ে উল্লাস জানায় পশুদ্বয় প্রাণের সরসতা দিয়ে, এস—এস; তোমরা নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলে? খুব অতিথি সৎকার জান দেখছি?···

গভীর দুঃখকে চেপে উত্তর করে জয়া, হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল নেই, তাই। এখনও কিছু খাননি দেখছি?

ন্যাকামীতে জবাব দেয় থ্যাব্‌রাটা, কি করে খাব? একা একা কি চা পানে আমেজ আছে?

জয়ার ছাত্রী-মন গর্জে ওঠে। তবু সংযত কণ্ঠেই জবাব দেয়, বেশ, এবার খেয়ে নিন।

একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে পুনরায় সোহাগ জানায় ঢেঙাটা, তোমাদের কোন অসুবিধে নেই ত? বল, তোমাদের জন্য আমরা আর কি করতে পারি?

সুযোগ বুঝে অনুরোধ জানায় জয়া, কাল আমাদের কোলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন?

হেসে উত্তর করে—ওটা, মানে পালাতে চাও তো?

না—না, পালাব কেন? কলেজ বন্ধ, ক'দিন ঘুরে আসতে চাই।

—ওর মানেই ঐ।

অপ্রস্তুত হয়ে যায় জয়া। আব কোন উত্তর খুঁজে পায় না। এক মিনিট ইতস্তত করে পুনরায় অনুরোধ জানায়, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন।

অত ব্যস্ত কেন? আরও একটু কাছে এস!···লোলুপ দৃষ্টিতে উন্মাদনা প্রকাশ কবে পিশাচটা।

জয়া চোখ বিস্ফাবিত কবে প্রতিবাদ জানায়। বুক থর্ থর করে কাঁপতে থাকে। পাশের বর্বরটা শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিজয়ার দিকে। যেন গিলে খাবে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে বেচারা। রাস্তার খেঁকী কুকুরগুলো আবার ঘেউ ঘেউ কবে ওঠে।

ঢেঙাটার প্রাণে রস উথলে উঠেছে। পুনরায় মৃদু হাসিতে জয়াকে হাত ধরে টেনে নিয়ে বসাতে চায় কোলের ওপর। নারীর সর্বশক্তি ফুঁসে ওঠে। সজোরে হাতটা মুক্ত করে নিয়ে চটাস কবে একটা চড় বসিয়ে দেয় পাজীটার বাঁ গালে। ক্রোধে গর্জে ওঠে বর্ববটা। চেয়াব ছেড়ে এগিয়ে আসে উগ্র বুভুক্ষায়। ছুটে পালাতে চেষ্টা কবে জয়া বিজয়ার হাত ধরে। কিন্তু ওপরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ। সিঁড়ির কাছের প্রহরীদ্বয় সঙ্গীন উঁচিয়ে বাধা দেয়। বর্বর দু'টো ততক্ষণে তেড়ে এসে ধরে নিয়ে যায় ওদের হিংস্র বাজের মত। চাপা করুণ আর্তনাদ ঘুরে বেড়ায় আকাশে বাতাসে। অন্ধকারের বুক চিরে দাপাদাপি করে দু'টি অসহায় নারী পাশবিক লাঞ্ছনায়। পরেশনাথ সর্বশক্তিতে ছুটে আসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন সিঁড়ির ওপর সঙ্গীনের খোঁচায়। তাজা রক্তের বন্যা বয়ে যায় ওপর থেকে নীচে। মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় তাঁর ভবযন্ত্রণা মৃত্যুর শীতল স্পর্শে।

পরদিন সকাল আটটা। বিজয়া প্রচণ্ড আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। জয়া কিছুক্ষণ হয় জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। গত রাত্রের বিভীষিকা এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। জানোয়ার দু'টোকে কাছে না দেখে উঠে বসে। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেলে বিজয়াকে কাঁধের ওপর ফেলে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকে। পরেশনাথের শবটা গত রাত্রেই সরিয়ে ফেলেছে বর্বররা।

দোতলার বারান্দায় চিৎ হয়ে পড়ে আছেন শিবানী দেবী। চোখ অর্ধমুদ্রিত। ঈষৎ উন্মুক্ত মুখগহ্বর। দীপু মা মা বলে চীৎকার করে কোন সাড়া পাচ্ছে না। কোলের বাচ্চাটা তেষ্টা মেটাবার জন্য বার বার স্তন টেনে নিষ্ফল চেষ্টায় থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে। বিজয়া ওপরে উঠেই মায়ের অবস্থায় পুনরায় মূর্ছা যায়। জয়া পাথরের মত নিথর হয়ে গেছে। চীৎকার করে কাঁদতে পারে না। আলনা থেকে একটা কাপড় টেনে নিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দেয় মাকে। বসে থাকে নীরব নিথর ছোট দুটি ভাইকে কোলে টেনে নিয়ে।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় বুটের শব্দ ভেসে আসে। এবার আর সদর খোলার বালাই নেই। বর্বররা নিজেরাই তালা-চাবির ব্যবস্থা করেছে। যখন খুশি যায় আসে। জয়া ভয় পায় না অতটুকু।

খট্ খট্ করে ওপরে উঠে থমকে দাঁড়ায় পিশাচদ্বয়। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ওকি! তোমার মার অসুখ করেছে নাকি?

কোন উত্তর না করে শুধু আস্তে আস্তে মার মুখ থেকে ঢাকনাটা খুলে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে জয়া। মাথা হেট করে দাঁড়ায় পিশাচরা। খানিক মৌন থেকে পুনরায় নেমে যায় রাস্তার দিকে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই একখানি এ্যাম্বুলান্স এসে সদরে লাগে। নিয়ে যায় ওদের স্নেহশীলা জননীকে আঁধারের বুকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জয়া এবার গগনভেদী মা মা চীৎকারে। ঢেঙা পিশাচটা সান্ত্বনা

দেয়, তৈরী হয়ে নাও তোমরা। আজকেই তোমাদের কোলকাতায় পাঠিয়ে দেব।

বেলা বারটায় একখানি মিলিটারী 'জিপে' করে বেরিয়ে পড়ে সকলে কোলকাতার পথে। পশ্চাতে রেখে যায় পৈতৃক ভিটে মাটি—মহাশ্মশানের বুকে জনক-জননীকে।

তিন

নাবায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ঘাট। ভয়ার্ত মানুষের ভিড় ভেঙে পড়েছে। চতুর্দিকে শুধু পালাই পালাই রব। কে কোথায় যাবে স্থির নেই। মৃত্যু-বিভীষিকা পেছন থেকে তাড়া দিচ্ছে—তাই চলেছে। এ চলার যেন শেষ নেই। সমূহ স্থান ত্যাগ—তারপর ভাগ্যলিপি।

স্টেশনের নিয়ম কানুনে বিরাট বিশৃঙ্খলা। মানুষের গায়ে গায়ে মানুষ। তদুপরি রাশীকৃত ছেঁড়া মাদুর, ময়লা কাঁথা, কম্বল, পাটি, বালিশ আর বাসনপত্রের পর্বত প্রমাণ স্তূপ। কোথাও তিল ধরণের স্থান নেই। তবু দলে দলে নতুন মানুষ আসছে নতুন নতুন বিপদের সম্ভাবনায়। মলমূত্রে নরক গুলজার। আহার্য নেই, পাথেয় নেই, এমন কি পথ চলার শক্তি পর্যন্ত নেই। তবু আসছে। না এসে যে উপায় নেই। মান যায়, প্রাণ যায়, জীবনের সর্বস্ব যায়।

কোথাও শিশু চীৎকার করে কাঁদছে। ক্ষুধার তাড়নায় বৃদ্ধ বুক চাপড়াচ্ছে, যুবতী স্ত্রীলোক আপাদমস্তক ঢেকে নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখছে। ঘাটে ষ্টীমার বাঁধা আছে, কিন্তু উঠবার উপায় নেই। টিকেট চাই, টিকেট। পাঁচ টাকার টিকেট পঞ্চাশ টাকা, একশ' টাকা, দু'শ' টাকা। যার কাছে যা আদায় হয়। কুলিকামিনরা সব জোট পাকিয়েছে। চার আনার মোট

চার টাকা, দশ টাকা, চল্লিশ টাকা। না দিলে ভিড়ের মধ্যে এগুবার উপায় নেই। নগদ না পাব হাঁড়ি কলসী দাও। হাঁড়ি কলসীতে না কুলোয় সোনাদানা দাও। উপায়হীন মানুষ তাতেই রাজী। কেউ বা সর্বস্ব খুইয়ে, কেউ বা কৌশলে আংশিক বাঁচিয়ে যার আগে যে পারছে স্টীমারে গিয়ে উঠছে। পেটে দানাপানি নেই হয়তো তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন।

জয়া বিজয়া ওদের ছোট দু'টি ভাইকে সঙ্গে করে সোজা মিলিটারী 'জিপে' করেই ঢাকা থেকে ঘাটে এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে বিশেষ কিছু আনতে পারেনি। এক উপায় নেই, দ্বিতীয় কোন আকর্ষণও নেই। শুধু একটা বেডিং, সামান্য ক'খানা জামা কাপড় গায়ের গয়না ও পথ খরচার গোটা কয়েক টাকা মাত্র। আরও অনেক কিছু লাঞ্ছনার আশঙ্কা নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু ঘটেনি। পাড়ার গুণ্ডারা লোলুপ দৃষ্টি হেনেও মিলিটারীর ভয়ে নিরস্তই ছিল। হয়তো ঘোরতর অন্যায়ের পর সামান্য অনুকম্পা মাত্র। গত রাত্রের বর্বর দু'টোর একটা সঙ্গে এসেছে। তবে আজ ওটাকেও কেমন যেন মনমরা বলেই বোধ হচ্ছে। হয়তো বিবেকের তীব্র দংশন।

উচিত মূল্যেই তিনখানি ইণ্টার ক্লাশের টিকেট সংগ্রহ হয়। ওদের উপস্থিত ভাগ্যকে লক্ষ করে আশপাশের অনেকেই প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওদের পানে। অতীব প্রভাবশালিনী ভেবে দু'চারজন অনুরোধও জানায় নিজেদের জন্য। কিন্তু জয়া তেমন উৎসাহ দেখাতে সাহস করে না। ওর কুসুম কোমল হৃদয়ে কোথায় যে কাঁটার দংশন চলেছে সে শুধু ও নিজেই জানে। তাই নীরবেই গিয়ে ওঠে স্টীমারে ছোট দু'টি ভাই আর বিজয়াকে সঙ্গে করে। বর্বরটা বিদায় প্রার্থনা করে। মুখ তুলে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারে না জয়া ওর দিকে। হয়তো ওকে সহস্র ধন্যবাদ জানান উচিত এবং সে শালিন্য বোধও আছে ওর।

একবার কেন দশবার ধন্যবাদ জানাতেও কুণ্ঠিত হত না, যদি না ও জানত কি মূল্য ওকে দিতে হয়েছে সামান্য এই পথ চলায়। তাই নীরবেই মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। সৈনিক ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। বিরাট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্টীমার যাত্রা শুরু করে। কর্কশ ভেঁপুর শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তীরস্থ অক্ষম যাত্রীকুল দিনান্তের শেষ খেয়ার অসাফল্যে। আর যারা সফলকাম হয়েছে, তারা মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ধন্যবাদ জানায়—স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে।

স্টীমার চলে ঝমঝম্ ছমছম্ শব্দে শীতললক্ষার কালো জলকে দলিত মথিত করে। হয়তো এ ওর জয়যাত্রা কিংবা মৃত্যুরাজের দূতালি করা। উভয় তীরের হাট বাজার আপিস আদালত সব বন্ধ। প্রতিদিনের মত ফেরী স্টীমার ও নৌকোগুলি যাত্রী বোঝাই করে তেমন আর ঘাটে ঘাটে ছুটোছুটি করছে না। ভেঁপু বাজিয়ে কলকারখানাগুলিও প্রতিদিনের মত আর তার শ্রমিক সন্তানদিগকে কাছে ডাকছে না। চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত পুরোপুরি সফল হয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, আর জুয়াড়িদের স্বার্থসিদ্ধি। লক্ষার উভয় কূলে নেমে এসেছে মৃত্যুর হিম শীতল নিস্তব্ধতা। কে যেন গলদেশে পা দিয়ে সজোরে চেপে ধরেছে ওর, শ্বাস রুদ্ধ!

নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সীগঞ্জে এসে স্টীমার প্রথম নোঙর ফেলে। সত্যি আজ আর ওর পথ চলার শক্তি নেই। রাশিকৃত বোঝা উদরস্থ করে আজ ও বড়ই ক্লান্ত, শ্রান্ত, দুর্বল। একটি যাত্রীও কোল থেকে নেমে গিয়ে ক্ষণিকের বিশ্রাম দিচ্ছে না। বরং উঠে আসছে আরও বিপুল জনস্রোত স্থানহীন ওর বিরাট বক্ষে। অনেকক্ষণ গররাজীর পর নিরুপায় হয়ে আবার যাত্রা শুরু করে জলচরটা।

শীতললক্ষা খাড়ি দিয়ে এবার এসে পড়ে মেঘনার বিরাট বক্ষে।

গতির বেগ বাড়িয়ে আবার পদ্মার বুকে। দু'কূল ধু ধু করছে দিগন্তে। চতুর্দিকে শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে এক একটা স্টেশন এসে তীরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু সেও জনহীন মরুভূমির মতই ফাঁকা। একটা ফেরিওয়ালা পর্যন্ত নেই কোথাও। কিছু সংখ্যক যাত্রী প্রতীক্ষিয়মান আছে শুধু উঠবার জন্য। ওরা উঠে এলে সব ফাঁকা শ্মশানপুরী। তারপাশার পর উঠবার মতও আর কোন যাত্রী দেখা যায় না। শূন্য স্টেশন চড়ার বুকে শুধুই খাঁ খাঁ করছে।

স্টীমার চলেছে গতির বেগ বাড়িয়ে অন্তিম স্টেশনের নিশানায়—ভাবহীন বৈচিত্র্যহীন। জয়া সেই থেকে ঠায় বসে আছে মধ্যম শ্রেণীর একটা বেঞ্চের ওপর কুঞ্চিত দেহে। কোথাও একটু পা টান করবার জো নেই। শিশু ভাইটি স্তনাভাবে চীৎকার করে কবে কিছুক্ষণ হয় ওর কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপুকে বক্ষে চেপে বিজয়াও পার্শ্বস্থিত বিছানার গাদায় মরার মত পড়ে আছে। অবসন্ন দেহে চোখ মেলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না বেচারা। জয়ার চোখে ঘুম নেই। স্থির দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছে অব্যক্ত বেদনায়। কালকেও এমন সময় মা বাবার আশ্রয়ে ছিল। জীবনের গতিকে স্বপ্নময় রঙিন দেখেছিল। কিন্তু আজ? আজ সব দ্বার রুদ্ধ। কোথায় কার কাছে চলেছে জানে না। কি করবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে তাও জানা নেই। তবু অজানা পথে পা বাড়িয়েছে আর দশজনের মত। জয়ার তাপিত অন্তর মিনতি জানায়, 'ওগো প্রমত্তা পদ্মা, তুমি একদিন তোমার খরস্রোতে রাজা রাজবল্লভের দম্ভকে সমূলে ধ্বংশ করেছ। তার সমস্ত কলঙ্ককে ধুয়ে মুছে তোমার বিরাট বক্ষে ঠাঁই দিয়েছ, জ্বালা জুড়িয়েছ। আজ পার না কি এতগুলি অসহায় মানুষকে বাঁচাতে—শান্তির কোলে আশ্রয় দিতে? মহাপ্রভঞ্জনে গর্জে ওঠ তুমি ভৈরবী। নেচে ফুঁসে ওঠ ক্ষিপ্র ঊর্মিমালায়। গ্রাস কর গোটা জলচরটাকে সংহার মূর্তিতে। ওগো জননি,

তুমি প্রসন্ন হও···, চোখ বুজে আসে। লুটিয়ে পড়ে জয়া বিছানায় গাদায়।

ভেঁপুর ধ্বনিতে শিশু ভাইটি চীৎকার করে ওঠে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে দুধের শিশুর। পার্শ্বে এলিয়ে পড়া জয়ার উন্নত পয়োধর আঙুল দিয়ে খুটে চুষতে থাকে প্রাণপণে। বিদ্যুৎ শিহরণে চোখ মেলে তাকায় জয়া। সজোরে চেপে ধরে পাশ ফিরে বক্ষে। মাতৃত্বের মহিমান্বিত অনুভূতি। বেশীক্ষণ রেশ থাকে না। পুনরায় চীৎকার করে ওঠে দুধের শিশু নিষ্ফল চেষ্টায়। মধুহীন মৌচাক নিরর্থক আজ ওর কাছে। নিরুপায় জয়া—একটা বিস্কুট গুঁড়িয়ে তারই খানিকটা গুঁজে দেয় ওর মুখে ওকে শান্ত করতে। অনেকক্ষণ দাপাদাপির পর পুনরায় নেতিয়ে পড়ে অবোধ অপোগণ্ড ঘুমের ঘোরে। জয়ার বুক ফেটে কান্না আসে।

চার

একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও জলচরটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রাত্র বারটায় গোয়ালন্দে উপস্থিত হয়। আবার ওর বিরাট বক্ষে হৈ চৈ পড়ে যায় শত সহস্র অসহায় নরনারীর। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য পথ উপস্থিত কোলকাতা। কিন্তু তীরে নামতেই পা কাঁপছে। কে জানে, এখানেও কুর্মিটোলা—বিমান ঘাঁটির অবস্থা হবে কি না? যদি গুণ্ডার দল অতর্কিতে আক্রমণ করে? স্টীমার ছেড়ে ট্রেনে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। উৎসাহেরও অভাব নেই। কিন্তু মৃত্যুভয়—মানহানি—পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

স্টীমার ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে কুলি এসে মোট ঘাট আগলে ধরে। এ যেন সেই বুড়ি ছোঁয়ানো গোছের। একজন ধরল তো দ্বিতীয়জনের এগুবার জো নেই। সব এক সুরে বাঁধা। উপস্থিত যাত্রীকুলের সকলেরই এদের সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় আছে। স্বাভাবিক অবস্থা হলে ওদের চাহিদা মত রাজী হয়ে কাজ মিটে যাবার পর নির্দিষ্ট হারে মিটিয়ে বড় জোর দু'চার আনা বকশিশ দিলেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবার নয়। একে রাষ্ট্রগোষ্ঠী তাতে সুযোগ-সন্ধানী। একটু কথার খেলাপ হলে জান মাল দুই যেতে পারে। সুতরাং দর কষাকষি চলে উভয়ের মধ্যে। এখানেও চার আনার মোট চার টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা। আদায়ের নিয়মতন্ত্রে কোথাও ব্যতিক্রম নেই এদের। আবার কারও যদি কোলকাতা পর্যন্ত টিকেট কাটা না থাকে, তবে টিকেট প্রতি আরো বিশ পঁচিশ টাকা না হলে উপায় নেই। যে পার গাড়ীতে ওঠ, যে না পার ঘাটে বসে মর। দয়া মায়া ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। কৈফিয়ৎ দিতেও রাজী নয় কেউ।

পকেট নিঃশেষ করে, হাঁড়ি কলসী পেটরা সমর্পণ করে যার আগে

যে পারছে গাড়ীতে গিয়ে উঠছে। যে না পারছে দিনের পর দিন ঘাটে বসে খাবি খাচ্ছে, বে ইজ্জৎ হচ্ছে। এমন পড়ে আছে শত সহস্র নরনারী মর্মান্তিক লাঞ্ছনার মধ্যে। যে গোয়ালন্দ ঘাটে হোটেলওয়ালা —পানওয়ালা—খাবারওয়ালা—নিয়ত ভিড় করে দাঁড়াত স্ব-স্ব পসরা নিয়ে, আজ সে স্থান শূন্য। বাষ্ট্রধর্মী দু'একটি ফেরিওয়ালা বাসি পচা জিনিস নিয়ে মাঝে মাঝে শিকার ধরবার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু তা' এমনই দুর্মূল্য যে হাত ছোঁয়াবার উপায় নেই। এক কাপ চা এক টাকা, এক খিলি পান এক আনা। নিরুপায় যাত্রীকুল শুষ্ক মুখেই শুধু প্রহর গুনছে কতক্ষণে গাড়ী ছাড়বে।

জয়াদের ইণ্টার ক্লাসের টিকেট কাটা ছিল। ভেবেছিল পথে আর বিশেষ কোন ঝামেলা পোয়াতে হবে না। কিন্তু কুলির জুলুমবাজী থেকে কিছুতেই রেহাই পাওয়া ঘটে ওঠে না। দু'বোনের চারগাছা বালা ও দু'জোড়া কানের রিং সহ নগদ যথাসর্বস্ব কবুল করে গাড়ীতে এসে উঠতে হয়। অবশিষ্ট থাকে শুধু সরু দু'গাছা হার ও একটা আংটি মাত্র।

শিশু ভাই দু'টি সারা দিন না খেতে পেয়ে চিৎকার ক'রে ক'রে নেতিয়ে পড়েছে। বিশেষ কোন সাড়া শব্দ নেই ওদের। জয়ার বড় ভয় করে। ওদের জন্যই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে পালিয়ে আসা। ভবিষ্যতে ওরাই একমাত্র ভরসা। শেষটায় কি?...না...না...আংটিটার বিনিময়ে এক গ্লাস জল মেশানো গরম দুধ সংগ্রহ করে। কোলে বসিয়ে দু'ভাইকে ভাগ ক'রে খাইয়ে দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। নিজেদের কথা ভাববার উপায় নেই।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়—কিন্তু গাড়ী ছাড়বার নাম নেই। বিরক্তি ধরে যায় গাড়ীশুদ্ধ সকলের। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু-বিভীষিকা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতে থাকে।

রাত আড়াইটা তিনটে। ষ্টেশনের ভাব কতকটা থম-থমে হয়ে

এসেছে। একে প্রচণ্ড শীত, তাতে অনাহারজনিত দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি। যাত্রীদের কারও বড় একটা সাড়া-শব্দ নেই। কুলি কামিনরাও যথেষ্ট জুলুমবাজীর পর আর কোন সুযোগ না থাকায় গা ঢাকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু প্রহরারত দু'চারটি পুলিশ ও রেলওয়ে কর্মচারী স্ব স্ব ইউনিফর্ম পরে এমাথা ওমাথা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। কোন কথা জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, ওদের পানে ভাল করে তাকাবার পর্যন্ত সাহস নেই কোন যাত্রীর। চুপ চাপ বসে আছে সব মরার মত।

আর মিনিট দশ কেটে যায়। সহসা মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সমস্ত গাড়ীটা কেঁপে ওঠে। উদরস্থ যাত্রীকুল পুনরায় শিউরে ওঠে আশঙ্কায়। সবগুলো কান একযোগে উৎকর্ণ থাকে গাড়ীর গতির শব্দে। না—না, কোন দুর্ঘটনা নয়। ভেঁপু বাজিয়ে গাড়ীই মন্থর গতিতে চলেছে। রাশিকৃত ভীরু মন উৎসাহে নেচে ওঠে মুক্ত পাখীর মত। যারা ঘুমিয়েছিল, তারা জেগে উঠে বসে। শিশুরা আবার মায়ের স্তনে মুখ দিয়ে আনন্দে চুষতে থাকে।

বিজয়া ট্রাঙ্ক তোরঙ্গ বিছানার গাদায় অসাড়ে গা এলিয়ে দিলেও জয়া সেই থেকে ঠায় বসে আছে নির্বিকার। পদ্মার বুকে স্টীমারে থাকাকালীন একটি বারের জন্যও মনে হয়নি, জন্মের মত দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গাড়ী ছাড়লে অবিরত সেই কথাই মনের কোনে সুঁচ ফুটাতে থাকে। জীবন স্মৃতিতে মুহূর্তে ভেসে ওঠে ছায়া-শীতল ওদের সেই পল্লী মায়ের কথা। সেই গরু, বাছুর, মাঠ, ঘাট, আকাশ, বাতাস—আপনু জনের নিবিড় সান্নিধ্য। ছাত্রী জীবনেও কতবার পূজা-পার্বণে গিয়েছে সেখানে। কত আত্মীয় স্বজনের প্রাণের পরশ পেয়েছে মন-মুগ্ধকর। পল্লীবেষ্টিত ঢাকা শহরেও দেখেছে অতুলনীয় প্রাচুর্য। দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, মাছ, মাংস প্রভৃতির বিরাট সমাবেশ। পিতার যৎসামান্য আয়েও জীবনধারণে কোন-দিন কষ্ট পায়নি। ঘরে কত খাবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ!...

আজ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, ক্ষুন্নিবারণের জন্য একখানি পোড়া রুটিও ভাগ্যে জুটছে না। ঘর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি এ শোচনীয় পরিণাম!...

মহান পিতার আশ্রয়ে থেকে যে জীবনকে স্বপ্নময় দেখেছিল, দেশ ও দশের একজন হবে বলে মনে গ্রহণ করেছিল, দুর্বার সংকল্প আজ সেই জীবন, সেই মন অতর্কিতে কার অভিশাপে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়াবার কোথাও অতটুকু আশ্রয় পর্যন্ত নেই। বাঁচার নেই কোন নির্দেশ।... দুই গণ্ড বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে জয়ার। করুণ—মর্মভেদী!...

ট্রেন চলে গতির বেগ বাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে। মাঝে মাঝে এক একটা স্টেশন এসে পথরোধ করে দাঁড়ায় ক্ষণিকের বিশ্রাম দিতে। প্রতিবারেই যাত্রীকুল হয়ে ওঠে ভীত বিহ্বল। বিপদ কোথাও ঘটে না। আবার যাত্রা শুরু হয় কচ্ কচ্ শব্দে। গতির বেগ বেড়ে যায় মুহূর্তে। দু'পাশের গাছ পালাগুলো দৌড়ে ছোটে তীরবেগে বিরাট এক একটা দৈত্যের মত—অন্ধকারের বুক চিড়ে। ভীত ত্রস্ত যত অসহায় মন। আবদ্ধ কামরায় শুধু প্রহর গুনে চলে প্রভাতের উজ্জ্বল দিবালোকের আশায়। শীতের রাত আর শেষ হয় না। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার গগনে গগনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত গাড়ীখানাকে যেন এক্ষুনি গ্রাস কবে ফেলবে।

কাল-রাত্রির শেষ প্রহর উপস্থিত। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রভাতের পাখী ডেকে উঠবে। পূর্ব দিগন্ত উঠবে রঙিয়ে। সহসা কার অঙ্গুলি নির্দেশে যেন থমকে দাঁড়ায় গাড়ী, বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে—ভ্যাকুয়াম কষে। যাত্রীকুল ওঠে আবার অধীর হয়ে। উঁকিঝুঁকিতে দেখতে চেষ্টা করে এদিক ওদিক সন্তর্পণে। না—না, এ ত' কোন স্টেশন নয়, তবে!...মুহূর্তে আর্তনাদ ভেসে আসে সমস্ত গাড়ীখানার ভেতর থেকে।... মাগো......বাবারে...গেলামরে...কে কোথায় আছ রক্ষা কর। জয়া কোলের ভাইটিকে আরও সজোরে বুকে চেপে গুটিসুটি হয়ে বিছানার গাদায় আত্মগোপন করতে চেষ্টা করে। ওপাশে দীপুকে বুকে জড়িয়ে বিজয়া

মরার মত পড়ে আছে। ওরা কি জেগেছে?…মুখ তুলতেই চেয়ে দেখে একদল সশস্ত্র ছায়ামূর্তি উঠে আসছে ওদের কামরার মধ্যে। গাড়ীর আলো নিভে গেছে। জয়া বিদ্যুৎ গতিতে মুখ নীচু করে চুপচাপ পড়ে থাকে স্বস্থানে! নির্বিচারে চলে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক তাজা তপ্ত রক্ত এসে পড়ে ওর পিঠের ওপর। সমস্ত গা-টা রি রি করে ওঠে অস্বস্তিতে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয় কণ্ঠ চেপে ধরে।

মিনিট পনর কেটে যায়। অপ্রতিহত গতিতে চলে অরাজকতা আর স্বৈরাচার। বাধা দেবার কেউ নেই। হঠাৎ কয়েক রাউণ্ড গুলীর শব্দে অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। কাজ ততক্ষণে হাসিল হয়ে গেছে। গুণ্ডার দল নেমে যায় এক এক করে নির্ভয়ে। যাবার সময় একটা সজোর লাঠির আঘাত পড়ে জয়ার উপরিস্থ বিছানার গাদায়। অল্পের জন্য মাথাটা রক্ষা পায়।

আলো জ্বেলে গাড়ী আবার মন্থরগতিতে চলতে শুরু করে। জয়া কিঞ্চিৎ সাহসে নির্ভর করে চোখ তুলে তাকায়। কামরাটি ছোট হলেও অন্যূন কুড়ি একুশ জন যাত্রী ছিল, আর ছিল গাদা মোট বহর। ট্রাঙ্ক, তোরঙ্গ সব উধাও হয়েছে। শুধু স্থানে স্থানে পড়ে আছে এলোমেলো সামান্য বিছানাপত্র, হাঁড়ী কলসী, আর বোচকা ঝোলা। শাঁখা ভাঙা, ব্লাউজ ছেঁড়া ও কয়েক টুকরা মনুষ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখানে সেখানে সমস্ত কামরাময়। তাজা রক্তের রয়েছে জীবন্ত স্বাক্ষর। ডঙ্কা বাজিয়ে এইমাত্র অমাবস্যার বলি হয়ে গেছে। জয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে যায় বিজয়ার বিছানার কাছে। কই কেউ নেই ত' সেখানে। দীপু…খোকা…না, না, সব শূন্য, সব ফাঁকা। শুধু ওরা দু'ভাইবোন আর অনাথ ঐ দশ বার বছরের ছেলেটা অবশিষ্ট আছে ওদের এ কামরায়। লাফিয়ে নীচে পড়তে যায় জয়া মাটিতে। কচি ভাইটা চীৎকার করে ওঠে ওকোন থেকে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কোলে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জয়া। ট্রেন চলে দ্রুত গতিতে।

পাঁচ

রানাঘাট রেলওয়ে স্টেশন। শিবিরে শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক আর সেবিকাগণকে ভীষণভাবে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। দরদের অতটুকু অভাব নেই। সুযোগ বুঝে বাস্তুঘুঘুরাও ভিড়ে পড়েছে স্ব স্ব শিকার সন্ধানে। ধরা পড়ে কেউ কেউ মার-ধোর খাচ্ছে—পুলিশে যাচ্ছে। তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। বড় বড় কুটিয়াল ব্যক্তির চাঁইরূপে নিযুক্ত শয়তানের দল। এক একটি শিকার পিছু মোটা দক্ষিণা লাভ। পূর্ববঙ্গের স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী ওদের লোলুপ দৃষ্টিকে সক্রিয় করে তুলেছে। একই সঙ্গে চলেছে পরস্পর-বিরোধী দু'টি প্রতিষ্ঠানের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। একটির উৎসাহ উদ্দীপনা মানবতার মহান আদর্শকে কেন্দ্র করে। আর একটির কুটিল চক্রান্ত অসামাজিক স্বার্থান্বেষণে। দুর্ভাগ্য, বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে সহসা কোন প্রভেদ খুঁজে বার করবার উপায় নেই। তাই সতর্কতা সত্বেও হতভাগ্য যাত্রীকুলের একটা স্থূল অংশ ওদের খপ্পরে পরে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করছে।

শিবিরের কোথাও বিন্দুমাত্র স্থান নেই। আবার সেই রাশিকৃত মোট বহর ও অগণিত জন-সমুদ্র। সরকারী বে-সরকারী কোন ব্যবস্থাতেই সংকুলান নয়। তাই সাধ্যমত যাত্রী রেখে পুনরায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যত্র—কোলকাতার পথে।

জয়াদের গাড়ীখানা যখন সীমান্তবর্তী স্টেশন বানপুর পার হয়ে রানাঘাট এসে পৌছিল তখন বেলা প্রায় আটটা। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আবার হৈ চৈ পড়ে যায়। রক্ষীদল, সেবাদল, সাংবাদিকদল যে যার মতে মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে ওঠে স্ব স্ব কর্তব্য সাধনে। অধিকতর মুমূর্ষু অক্ষম পরিবারকে নামিয়ে রেখে বাকী সব যাত্রী নিয়ে গাড়ী আবার যাত্রা শুরু করে। জয়া, সেই যে শেষ রাত্রির হামলায় জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল

এপর্যন্ত আর জাগেনি। জ্ঞান ফিরলে দেখে রানাঘাট শিবির-হাসপাতালের একটি বিছানায় শুয়ে। দুর্বল স্মৃতিপটে গত রজনীর বিভীষিকা থেকে থেকে উঁকি দিয়ে যায়। পার্শ্বচারিণী সেবিকা কাছে এসে সান্ত্বনা দেয়, ভয় নেই, আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।

জয়ার তবু যেন ভয় কাটে না। ঢোক গিলে নিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করে, ওকে কোথায় রাখলেন? আমি এখানে এ কোথায়?···

ওকে, মানে আপনার ছেলের কথা বলছেন ত'? সে নিরাপদেই আছে। খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি আমরা।

জয়ার তবু যেন উৎকণ্ঠা দূর হয় না। পূর্ব্ববৎ আকুলতা নিয়েই অনুরোধ জানায়, না না শীগ্‌গির ওকে নিয়ে আসুন আমার কাছে। দোহাই আপনার···

সেবিকা আর কোন কথা না বলে ঈষৎ হাসতে হাসতে ছুটে যায় পাশের ঘরে। মুহূর্ত্তে ফিরে আসে ঘুমন্ত শিশুকে বুকে করে।

হাত বাড়িয়ে টেনে নেয় জয়া ওকে আপন বক্ষে। পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে দেহ মন। সেবিকা পুনরায় কক্ষের বাইরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসে এক গ্লাস গরম দুধ ও কিছু আহার্য নিয়ে। এবার আর জয়ার কোনরূপ উৎকণ্ঠা নেই। ছোট ভাইটিকে কোলে জড়িয়ে অতীতের সব দুঃখ যেন ভুলে গেছে।

সেবিকা কাছে এসে শান্ত কণ্ঠে অনুরোধ করে, ছেলে রেখে এগুলো খেয়ে নিন দেখি। শরীর যে একদম ভেঙে পড়েছে।

জয়া কোনরূপ প্রতিবাদ করে না। ধীরে ধীরে ভাইটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করে। সেবিকা সাহায্য করে ওকে। এক নিঃশ্বাসে দুধটুকু চুমুক দিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়। পার্শ্বচারিণী খাবারের ডিসটা এগিয়ে দেয় মুখের কাছে। জয়া একটা কমলা লেবুর কোয়া তুলে নিয়ে মুখে পুরে দেয়। মিনিট কয়েকের মধ্যেই খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে

আসে। সেবিকা নিজের কাজ গুছাতে উদ্যত হয়, আচ্ছা আপনার ছেলের বাবা এবং আর আর সব কে কোথায়? শাঁখা-সিঁদুর বুঝি শনি ভেঙে মুছে দিয়েছে? এমন ত' হাজার হাজার রিপোর্ট প্রায়ই আমাদের কাছে আসছে।

জয়ারি মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তরের মণিকোঠায় কে যেন এক শিশি বিষ ঢেলে দেয়। কান্নার সুরে প্রতিবাদ করে, ওতো আমার ছেলে নয়, ছোট ভাই—আমাদের আদরের খোকন···কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর বলতে পারে না। মা-বাবার নির্মম মৃত্যু, দীপু বিজয়ার নিরুদ্দেশ, মুহূর্তে পাগল করে তোলে ওকে।

সেবিকা থতমত খেয়ে যায়। আস্তে আস্তে কাছে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় জয়ার। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনে কেমন যেন নির্বাক হয়ে যায় নিজেও।

জয়া জ্ঞান ফিরে পেয়েছে শুনে সাংবাদিক সতীনাথও উপস্থিত হয় পরক্ষণেই। বেচারা ইতিপূর্বে আরও দুবার এসে ফিরে গেছে। যথা সময়ে খোকন এবং জয়ার ফোটো তুলে নিয়েছে। প্রতীক্ষায় আছে শুধু বিস্তৃত ইতিহাসের জন্য। কিন্তু সে ইতিহাস না জানাই ছিল ওর পক্ষে ভাল। নিত্য নতুন তাজা খবর সংগ্রহের জন্যই কর্তৃপক্ষ ওকে এখানে পাঠিয়েছেন। সাধ্যমত চেষ্টাও করে আসছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কলম যেন অচল। কিছুতেই হাত চলে না। তবু কর্তব্যের তাগিদে দু'পাতা লিখে পাঠিয়ে দেয় পত্রিকা-অফিসে। অজান্তে কেমন করে যেন ঝরে পড়ে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রিপোর্টের পাতায়। সান্ত্বনা দেয় সতীনাথ জয়াকে, যেমন করেই হোক বিজয়া এবং দীপুকে খুঁজে বার করবই।

চোখ তুলে তাকায় জয়া সাংবাদিকের দিকে। আশায় বুক ভরে ওঠে। মাথা নীচু করে চলে যায় সতীনাথ ঘর ছেড়ে।

ছয়

আজ তিনদিন জয়া এখানে আছে। এই তিনদিনে অন্তর্যামী মনের সঙ্গে চলেছে ঘোরতর সংগ্রাম। স্মৃতির জ্বালা তীব্রভাবে দংশন করে চলেছে ওকে। এক একবার মনে করে আত্মহত্যা ছাড়া নিষ্কৃতিলাভের আর কোন উপায় নেই। ঘরে ছিল ছ'জন। রাস্তায় বেরিয়েছিল চারজন। বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জন। সম্মুখে ধূ ধূ করছে অনন্ত ভবিষ্যৎ। সামান্য এই বালিকা বয়সে কোথায় কার আশ্রয়ে পা বাড়াবে ও? চারদিক জুড়ে নিরন্ধ্র অন্ধকার। কোথাও অতটুকু আলো নেই পথ চলার। উপায়হীন দু'টি চোখ চেয়ে থাকে অনন্ত আকাশের দিকে। করুণা ভিক্ষা করে ঊর্ধ্বে দেবলোকে। নিরর্থক হয় না জয়ার প্রার্থনা। দূরে অনন্ত আকাশের বুকে কোথায় যেন ভেসে ওঠে মৃত পিতার ভীষণ ভয়াল ছায়ামূর্তি। আর্তনাদ করে ওঠে জড় কবন্ধ, ওরে আমাকে বাঁচা, রক্ষা কর, দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দে। গর্জে কেঁপে ওঠে জয়া অন্তর···হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে ওকে। কৈফিয়ৎ তলব করতে হবে অন্যায়ের। পাপীকে দিতে হবে শাস্তি। নইলে আজন্মের পিতৃঋণ শোধ হবে না ওর। দেবলোকে তৃপ্ত হবে না পিতার বিমুক্ত আত্মা। শক্তি চাই, সামর্থ্য চাই—প্রতিষ্ঠা চাই।···কিন্তু কে, কে যোগাবে সে শক্তি সে সাহস ওকে। আবার পরক্ষণেই যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আকাশের অপর আর এক প্রান্ত। দশপ্রহরণধারিণী—মাতৃমূর্তি যেন এগিয়ে দিচ্ছেন ওকে জীবনযুদ্ধে। বরণ করে নিচ্ছেন যেন নিজের সমস্ত বিভূতি দিয়ে বিজয়মাল্যে। চোখ মুছে ভাল করে তাকায় জয়া নীলিমার বুকে। শ্রদ্ধায় নত করে দেয় শির মাতৃপদে। ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে ওঠে পিতার ক্লেদাক্ত মুখমণ্ডল। ভাস্বর জ্যোতিতে ভরে যায় দশদিক। মনে পড়ে তাঁর দেওয়া আদর্শের

কথা—শিক্ষার কথা—আত্মনির্ভরতার কথা। শিক্ষিতা হয়েও আজ যদি ও ভেঙে পড়ে, চূর্ণ হয়ে যায় জীবনের সংকল্প, তাহলে অশিক্ষিত ঐ অগণিত নরনারী, যারা জীবনে কোনরূপ আলোর সন্ধান পায়নি, আহার্য আর বাসস্থানকেই যারা জীবনের চরম পাওয়া বলে জেনে এসেছে তাদের উপায় কি ?···বল পায় জয়া অন্তরে। প্রতি শিরা-উপশিরায় প্রধাবিত হতে থাকে বিদ্যুৎবিচ্ছুরণ। হ্যাঁ, দাঁড়াতে হবে ওকে মাথা তুলে। ভাঙা নজয়া জুড়ে পুনঃ জমাতে হবে পাড়ি। জীবনযুদ্ধে কাপুরুষের স্থান নেই।···

শীতের রাত গভীর হয়ে আসে। ক্যাম্পের কলরোল অনেকটা নিস্তব্ধ। আর কোন গাড়ী আসার সম্ভাবনা নেই। সেবক-সেবিকাগণও দিনান্তের পরিশ্রমের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সুযোগ খুঁজছে। সাংবাদিক সতীনাথকে সারাদিন দেখা যায়নি। হয়ত সীমান্তে গিয়েছে নূতন কোন তথ্য সংগ্রহে।

জয়া তিনদিন আছে এখানে। এই তিনদিনে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সতীনাথ ওকে ধরে তুলতে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছে সে, জয়া সামান্য ভিখারিণী নয়। দু'মুঠো ভাত আর দু'খানা কাপড়ে ওর সমস্যা দূর হবে না; এবং হাত পেতে তা' ও কারও কাছ থেকে নিতেও পারবে না। ওকে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে হবে ওর নিজের শক্তির ওপর। পালিয়ে অনেকেই এসেছে, প্রত্যক্ষ সংঘাতও অনেকের জীবনে ঘটেছে; কিন্তু তাদের কথা স্বতন্ত্র। স্বভাবতই আর্থিক চাপে কেউবা তারা ধুকছিল। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় কেউবা আপন মনেই ঘর ছেড়ে পালাবার সুযোগ খুঁজছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাদের সে পথ সুগম করে দিয়েছে। তাই তারা পৈতৃক ভিটে-মাটির ভাবনা অপেক্ষা সমূহ ভাত-কাপড়ের সমস্যাকেই বড় করে দেখছে। লঙ্গরখানার আহার্যে তাদের পেট পূর্তি না হলেও কথঞ্চিৎ তাতেই তারা তুষ্ট।

দিবা-রাত্র তাই তারা শুধু সন্ধান করে বেড়ায় কোথায় আহার্য আর সাহায্য মুফ্‌ত পাওয়া যায়। কিন্তু জয়াকে তিনবার সাধলে একবার খেতে চায় না। কোন কিছু দিতে গেলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর সমস্যার সমাধান কে করবে?···সাংবাদিক সতীনাথ ভাবে, গভীর ভাবে· চিন্তা করে; কিন্তু সহজ কোন উপায় খুঁজে পায় না। তবু ভাবে। এভাবনা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। শিক্ষা সংস্কৃতি নীরব থাকতে দেয় না। মানুষের দুঃখে মানুষ যদি না ভাববে—তবে তাকে মানুষরূপে অভিহিত করা যায় কিরূপে?···

কক্ষে অনেকক্ষণ প্রবেশ করেছে সতীনাথ। পাশাপাশি আরও আট-দশটি শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে জয়া আকাশের দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষ। সম্প্রতি অনাথ এই শিশু কয়টির পরিচর্যার ভার নিজের হাতে নিয়েছে। কাজ না করে দু'বেলা ভাত খাবে কি করে?···

সতীনাথ ভেবেছিল, জয়া নিশ্চয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু ফিরবার পথে একবার খোঁজ নিয়ে যায়। কিন্তু ওকে এভাবে অবস্থিত দেখে কোথায় যেন আপন মনেই ব্যথিয়ে ওঠে সে। ডাকতে মন সরে না।

জয়ার অন্তরে চলেছে কালবোশেখীর রুদ্র নর্তন। আচম্বিতে পাশ ফিরতেই থতমত খেয়ে যায় সতীনাথকে দেখে।

সাংবাদিক সহানুভূতিসূচক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করে, কি অত ভাবছিলেন?

জয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজাসুজি উত্তর দেয়, ভাবছিলাম, মানুষের আজ কি দুর্দিন।

—সবার তা নয়, মিস্ গুপ্তা।

তা ত নয়-ই। যারা নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, তারা মুখে হাজার স্তোক বাক্য উচ্চারণ করলেও মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছে। গোটা বাংলাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে

দিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা আর আত্মপ্রচারে মেতে উঠেছে—এইসব স্বার্থপীরের দল।

—ঘরের শত্রু বিভীষণদের কি আপনি বাদ দিচ্ছেন?

—গণবিচারে কেউ বাদ যাবে না।

—কিন্তু মূর্খ জনগণ সেকথা বুঝবে কবে?

—সেদিনের আর বেশী দেরী নেই। দেখছেন না, পূর্ব দিগন্ত কেমন রাঙা হয়ে উঠছে। শীঘ্রই হয়তো ঝড় উঠবে। জুয়াড়ীদের তাই ত' এত ভয়। একজন নিঃস্বকে তা'ই ত' তারা লেলিয়ে দিচ্ছে আর একজন নিঃস্বের বুকে ছুরি চালাতে।

—আপনি কি তাহলে এটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে চান না?

—মোটেই না। এ হচ্ছে বঞ্চিত আর বঞ্চনাকারীর লড়াই—শ্রেণী সংগ্রাম।

—তাহলে মুসলমান হিন্দুকে আর হিন্দু মুসলমানকে ঠেঙাচ্ছে কেন?

—মূলে ঐ এক-ই উদ্দেশ্য। প্ররোচনাকারীর হিংস্র উস্কানি। নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। দেখতে পাচ্ছেন না দিকে দিকে সহস্র সহস্র ক্ষুধিত মানুষ কেমন একসঙ্গে মিছিল করে চলতে শুরু করেছে নিজেদের দাবী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে? সেখানে হিন্দুতে, খৃষ্টানে, মুসলমানে কোন বিভেদ নেই। সকলেই ক্ষুধিত। সকলেরই এক প্রশ্ন। কিন্তু বঞ্চনাকারী? সেকি সহজেই বিলিয়ে দেবে আজন্মের সঞ্চিত অর্থ পথের লোককে?

—কিন্তু আপনি একজন পদস্থ মুসলমান দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন।

—তা হয়েছি, এবং সেইজন্যেই তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম হিন্দুস্থানে পৌঁছে অন্তত একজন মুসলমানকে না মেরে জলস্পর্শ করব না।

—সে প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা করেছেন?

—না, তার আর প্রয়োজনবোধ করিনি।

—কারণ ?

—প্রথম কারণ, এখানকার মাটি যখন স্পর্শ করি তখন আমার জ্ঞান ছিল না। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান ফিরলে সমস্ত হৃদয় দিয়ে বুঝেছি, দুর্বলতার সুযোগ নিতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমান। সুযোগ-সন্ধানীর সংখ্যা এখানেও কম নেই—এবং তারা কেউ মুসলমান নয়···মুখ তুলে তাকায় জয়া তির্যগভাবে।

সতীনাথ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সোজাসুজি উত্তর দিতে পারে না। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে—পুনশ্চ প্রশ্ন করে, তবে কি আপনি বলতে চান মুসলমানের এতে কোনই দোষ নেই !

—ঠিক আমি তা বলতে চাইনে। শ্রেণীবদ্ধ ঘরে যখন আগুন লাগে তখন সে আগুন কোনটা সজ্জনের আর কোনটা দুর্জনের তা' বিচার করে না। হিন্দু মুলসমানের মনে আজ আগুন লেগেছে। সে আগুন একে অন্যকে ধ্বংস করবেই। কিন্তু কে জ্বেলেছে এই আগুন ? ঐ সেই স্বার্থান্বেষী শয়তান। যে বর্বর দু'টো আমাদের ওপর অত্যাচার করেছিল তারা মুসলমান না হয়ে হিন্দু হলেও আমার বিশ্বাস একই ফল হত। কারণ সেই শয়তানের হাতিয়ার হয়েই এসেছিল ওরা, যে শয়তান চায় আমাদের তীব্রভাবে দংশন করতে। তাই এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—তাই এ গৃহদাহ।

—এ গৃহদাহ কি রোধ হবে না ?···বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করে সতীনাথ।

—যতদিন না উপযুক্ত বারি সিঞ্চনের ব্যবস্থা হয় ততদিন কোন আশা নেই।

—কি বলতে চান আপনি ?

—আমি বলতে চাই, একজন হিন্দু নারীর লাঞ্ছনার বিনিময়ে আর একজন মুসলমান নারীর লাঞ্ছনা নয়। একজন হিন্দুর শিরচ্ছেদে আর

একজন মুসলমানের শিরচ্ছেদও নয়। যে অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতা পরস্পরকে ধ্বংস করতে উত্তেজিত করছে, শিক্ষার মানদণ্ডে সর্বপ্রথম তাকেই জয় করতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাদের উস্কানিতে তুমি একজন শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রাণনাশ করছ, এরা দুর্বল হলে, তাদেরই পায়ের তলে তোমায় প্রতিদিনের গোলামী সহস্র সহস্র বছরের জন্য কায়েমী হবে। এরা কেউ তোমার শত্রু নয়। এদের স্বার্থ তোমার স্বার্থ এক। পরস্পর তোমরা পরস্পরের ভাই।

—একথা কি সহজে কেউ বুঝবে?

—আপনি সাংবাদিক, এ বিষয়ে অন্য অপেক্ষা আপনার দায়িত্ব অধিক। কারও আঘাতের ক্ষতকে বড় করে না দেখিয়ে—তার মনের ক্ষতকে বড় করে দেখানোই আপনার উচিত।

—আপনার যুক্তি ঠিক এবং প্রাণপণে আমি সে চেষ্টা করব।

—এ আমার যুক্তি নয় মিষ্টার দত্ত, এ আমার বাবার জীবনব্যাপী সাধনা —তপস্যালব্ধ ফল।

—কিন্তু জানেন, কালও রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত মানিকতলা বস্তি অঞ্চলে আগুন দিয়েছে।

—তা' ত' দেবেই। আগুনের ভয় দেখিয়ে একদলকে তাড়াতে না পারলে আর একদলের নিকট থেকে যে মোটা সেলামী আর মোটা ভাড়া আদায়ের পথ পরিষ্কার হয় না।

—না না এটা আপনি একটু বাড়িয়ে বলছেন। সর্বপ্রথম ওখানকার মুসলমানরাই একজন হিন্দুকে খুন করে।

জয়া চোখ বিস্ফারিত করে বাধা দেয়, সে হিন্দুর মৃতদেহটি সনাক্ত হয়েছে কি? এবং আপনি নিজের চোখে তা' দেখেছেন কি?

—সব জিনিষ নিজের চোখে দেখা যায় না।...স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দেয় সতীনাথ।

জয়া পুনশ্চ বলতে থাকে, যদি আপনার কথাই সত্যি হয় তাহলেও দেখুন, সংখ্যা গুরুর রাজত্বে সংখ্যা লঘুর এ সাহস আসে কোত্থেকে। মিষ্টার দত্ত, বঙ্গের দুই প্রান্তে দাঙ্গা চলেছে। আপনার কথায় বলতে গেলে পরস্পর পরস্পরকে প্যাঁচাচ্ছে কি ঠেঙাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই একই সঙ্গে চলেছে ওখানকার শেখজী আর এখানকার শেঠজীদের বড় বড় হোটেলে খানাপিনা আর ব্যবসা বাণিজ্যের সলা পরামর্শ। রাজপুরুষগণও বাদ যাচ্ছেন না নেমন্তন্ন থেকে। শুধু শত্রুতা যত একজন কৃষক মজুরের সঙ্গে আর একজন কৃষক মজুরের। আপনি আমায় হাসালেন কিন্তু।...

সতীনাথ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

জয়া বলেই চলে, সাংবাদিক, তথা উচ্চ শিক্ষিত হয়েও যদি আপনাদের দৃষ্টি ভ্রম হয় তাহলে দেশের দুর্ভাগ্য। ঢাকায় দাঙ্গা আমার জন্মেরও বহু পূর্ব থেকে। জ্ঞান হয়ে অবধি দেখে আসছি, কত ঘর বাড়ী জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে, কত সতীর সিঁথির সিঁদুর যাচ্ছে মুছে। উত্তেজনাও দেখেছি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর। প্রথম প্রথম আমারও মনে হ'ত কেন কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের হিন্দু যুবকরা ওদের উড়িয়ে দেন না? কিন্তু আশ্চর্য, আমার বাবাকে একটি দিনের জন্যও উত্তেজিত দেখিনি। শিক্ষকের আদর্শ নিয়েই তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়কে সমান প্রীতির চক্ষে দেখে এসেছেন। পরস্পরকে বুঝিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। বাবার প্রতি আমারও অনেক সময় রাগ হ'ত। বুঝতে চাইতাম না তাঁর আদর্শ—তাঁর শিক্ষা। এখনও বুঝতে পারতাম না, যদি না এতখানি লাঞ্ছনা ভোগ করতাম।

—আমিও তাঁর আদর্শ পুরোপুরি মেনে নিচ্ছি মিস্ গুপ্তা। আজ থেকে চেষ্টা করব—ধর্মীয় ভিত্তিতে জাতিকে ভাগ না করতে।

—আপনি তা' সহজেই পারেন মিষ্টার দত্ত। আপনার লেখনীর মধ্যে রয়েছে অমোঘ শক্তি।

—আজকের রাত্রি আমার নিকট অত্যন্ত শুভ রাত্রি মিস্ গুপ্তা। সারা জীবনে হয় ত' এ রাত্রির কথা ভুলতে পারবো না।···উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সতীনাথের মুখমণ্ডল। উচ্ছ্বাস ভরে আরও অনেক কথাই বলতে চায় সে। কিন্তু ক্যাম্পের ঘড়িতে বারোটা বেজে চলায় বাধা পড়ে।

—জয়া সহৃদয়েই অনুরোধ করে, রাত অনেক হ'ল, যান খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিনগে।

সাংবাদিক মোহ ভঙ্গের মত গম্ভীরভাবে থেমে যায়। দরজার দিকে দু'পা অগ্রসর হয়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ায়। জয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবেন?

সতীনাথ ঈষৎ হাল্কাভাবেই উত্তর করে, কাল আমার সঙ্গে একবার সীমান্তে যাবেন?

মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর করে জয়া, নিশ্চয়ই, কেন, যাব না? আমরা না দেখলে ওদের দেখবে কে? রাস্তায় যখন ছিলাম তখন মনে হয়েছিল হিন্দু হয়ে হিন্দুস্থানে যাচ্ছি—সসম্মানেই স্থান পাব। কিন্তু এখানে পা দিয়েই শুনছি, আমরা শরণার্থী, কৃপাপ্রার্থী। মিষ্টার দত্ত, কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি পারে কি নিজকে এমন ছোট করে ভাবতে, অন্যের দ্বারে হাত পাততে? যা চেয়েছিলাম তা' প্রতিদান হিসেবেই চেয়েছিলাম। ভিখারিণী কিংবা কাঙালিনী সেজে নয়। কিন্তু এখন দেখছি, সে ঋণ শোধ করতে এরা রাজী নয়। আদায় যদি করতে হয় তবে তা' নিজের শক্তি দিয়েই আদায় করতে হবে। দাঁড়াতে যদি হয়—তবে তা'ও নিজের পায়ের ওপর নির্ভর করেই। কারও দয়ার কিংবা দাক্ষিণ্যে নয়। তাই ত' আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে ঐ গণদেবতাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে আসা। আমি যাব,—নিশ্চয় যাব। কাল সকালে বেরুবার পথে আপনি আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন দয়া করে।···

সতীনাথ আর তিলমাত্র দেরী না করে প্রাণের উল্লাসে বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে। জয়া নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ওর পথের দিকে।

সাত

পরের দিন ভোর পাঁচটা। জয়া সতীনাথের সঙ্গে বানপুরের পথে এগিয়ে যায়। সেবা—ঐক্য—আত্মদান জাতির জীবনে আজ একান্ত প্রয়োজন, অটুট সংকল্প গ্রহণ করে জয়া।

অসংখ্য নরনারী পদব্রজে সীমান্ত পার হয়ে আসছে কুয়াশা ভেদ করে। গৃহদাহ থেকে রক্ষা পেয়ে ছুটে আসছে ওরা। তাই এখানকার শীতল স্পর্শে স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ইষ্টদেবতার উদ্দেশে জানায় জয়ধ্বনি। কিন্তু ক্ষুধাতুর মুখে পর মুহূর্তেই নেমে আসে কৃষ্ণার ঘনছায়া। কেউবা প্রিয়জনকে হারিয়ে বিষাদ মগ্ন···। জীবনের সর্বস্ব খুইয়ে কেউবা পথের ভিখারী···। আবার বাঁচার তাগিদে প্রাণ বাঁচিয়ে মান ভয়ে কেউবা জীবন্মৃত। জয়ার কাছে হতভাগ্যদের ও মুখ সুপরিচিত। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকটি মানুষের মনের কথা সঠিক বলে দিতে পারে। কি চায় ওরা? দু'মুঠো অন্ন, একটু বাসস্থান কি? তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় বেদনার ভাগ নিতে। তৎপর হয়ে ওঠে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক আর সেবিকাদের সঙ্গে গরম দুধ, চা ও খাবার বিতরণে। ঠক ঠক করে কাঁপছে ভীত ত্রস্ত অসার দেহ প্রচণ্ড শীতে।···

সাধ্যমত যার যা' ব্যবস্থা করে দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। বরং নিজের মনের মধ্যে অপরিসীম আনন্দ বোধ করে মানুষের একান্ত প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়াতে পেরে। সারাদিন চলে সেবা শুশ্রূষা ও বেদনায় সান্ত্বনা বাক্য দান। আহার নিদ্রার পর্যন্ত সময় নেই। সতীনাথের পুনঃ পুনঃ তাগিদে দু'খানা বিস্কুট ও এক কাপ চা পানেই ভুলে গিয়েছে নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা। কই বিন্দুমাত্রও ত' ক্লান্তিবোধ করছে না! কোথা থেকে শক্তির এই অনন্ত উৎস নেমে এসেছে আজ ওর এই শীর্ণ দেহ-মনকে কেন্দ্র ক'রে!···

সন্ধ্যা সমাগত। রানাঘাট ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করা আশু প্রয়োজন। শিশু ভাইটি একাকী রয়েছে সেখানে। জয়ার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। দেহ মনে নেমে আসে ঘোরতর অবসন্নতা। আর যেন বিন্দুমাত্র কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না। এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে ওকে। সতীনাথও সারাদিনের তথ্য সংগ্রহে ক্লান্তি বোধ করছে। অনেকগুলো প্রামাণিক ফোটো হাতে এসেছে আজ। ক্যাম্পে ফিবে বিস্তৃত রিপোর্ট সহ কাল প্রত্যুষেই পত্রিকা অফিসে না পাঠালে নয়। সুতরাং তার পক্ষেও আর দেবী করা উচিত হবে না। জবাব তাগিদে সেও খুশি মনেই সম্মতি জানায়। মিনিট কয়েকেব মধ্যেই উভয়ে বওনা হয়ে আসে স্টেশনের দিকে।

একে মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীত, তাতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পুর্বে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।, জয়া সহ্য করতে পারে না। ভেতরের হাড় মাংস যেন এক যোগে সব কাঁপছে। দাঁতে দাঁত চেপে সামলাতে চেষ্টা কবেও সতীনাথের কাছে ধবা পড়ে যায়। কোনরূপ সংকোচ না কবে নিজের কীট্-ব্যাগ থেকে পশমী চাদরটা বার করে গায়ে দিতে অনুরোধ করে ওকে সতীনাথ। স্বাভাবিক লজ্জায় বার কয়েক আপত্তি কবেও শেষ পর্যন্ত গায়ে না দিয়ে পারে না। আঃ বাঁচা গেল। আরাম বোধ করে জয়া। সতীনাথের বলিষ্ঠ দেহে পুল-ওভারটাই যথেষ্ট। গাড়ীতে উঠে পড়ে দুজন। আধ ঘণ্টাব মধ্যেই পৌঁছে যায় ক্যাম্পে। সারাদিনের ক্লান্তিতে বিশেষ কোন আলোচনা হয় না উভয়ের মধ্যে। শুধু আজকের সুযোগ দানের জন্য ধন্যবাদ জানায় জয়া সতীনাথকে। নিজের কক্ষের সম্মুখে এসে গা থেকে চাদরটা খুলে দিতে উদ্যত হয়। সতীনাথ বাধা দেয়, ওটা আপনার কাছেই রাখুন, আমার কোন প্রয়োজন নেই।

ক্ষীণ হেসে উত্তর করে জয়া, রাত্রে ভাল ঘুম হবে না। দেখছেন না, কেমন কনকনে হাওয়া দিচ্ছে?

—তা' হোক, আমার যা' আছে তাতেই যথেষ্ট।

—মনে বীরত্ব থাকলেও দেহে সহ্য হবে না। তা'ছাড়া আমারও প্রয়োজন নেই, কম্বল আছে···বলতে বলতে গা থেকে চাদরটা খুলে সতীনাথের কাঁধের ওপর ফেলে দেয়। শরীরের উষ্ণতায় বেশ গরম হয়েছে চাদরটা। সতীনাথ আরাম বোধ করে। দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানান বৃথা বিবেচনায়—নিশ্চেষ্টই থাকে। জয়া পরের দিন ডেকে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করে। সতীনাথও অগ্রসর হয় তার নিজের ক্যাম্পের দিকে।

শিশু ভাইটি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। স্নেহ-ঘন-দৃষ্টিতে খানিক তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। পরে গায়ের কম্বলটা আরও গলদেশ পর্যন্ত টেনে দিয়ে ছুটে যায় কল-ঘরে। যথারীতি ফিরে এসে নৈশ আহারের পর শুয়ে পড়ে। ঘুমে বুজে আসে দু'চোখ সারাদিনের ক্লান্তিতে। শিশু ভাইটিকে বুকে জড়িয়ে মুহূর্তে অচেতন হয়ে পড়ে। কিন্তু সতীনাথের অত সহজে নিষ্কৃতি নেই। সারাদিনে যা' সংগ্রহ করেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার রিপোর্ট না লিখলেই নয়। কর্তৃপক্ষ বহু আশা করে তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। নিত্য নতুন তাজা খবর চাই—প্রামাণ্য ফোটোগ্রাফ···। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসলেও জোর করে রিপোর্ট লিখতে বসে সতীনাথ। জয়ার ফিরিয়ে দেওয়া চাদরটাতে আপাদ মস্তক ঢেকে বিছানার উপর বসে খস্ খস্ করে লিখেও ফেলে পৃষ্ঠা দুই। কিন্তু মোটেই এগুতে পারে না। ঘুমের ঝাঁকুনীতে সব কিছু গোলমাল হয়ে চলে। কি লিখেছে নিজেই পড়তে পারে না। তবে আর বৃথা রাত জেগে লাভ কি? ভোরে উঠে সেরে রাখলেই চলবে। শুয়ে পড়ে সতীনাথ চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার উপর। জয়ার দেহের উষ্ণতা তখনও যেন লেগে রয়েছে চাদরটাময়। মুহূর্তে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

আট

পরদিন প্রভাতে আবার দু'জনের সীমান্তে যাবার কথা। জয়া যথারীতি তৈরী হয়ে আছে। কিন্তু সতীনাথের দেখা নেই। পথ চেয়ে চেয়ে বিরক্তি ধরে যায় ওর। একবার ভাবে নিজে গিয়েই দেখে আসে কি করছে সতীনাথ। আবার মনে করে, অকারণ দেরী করবার লোক তিনি নন। নিশ্চয় কোন কারণ ঘটেছে। হয়ত অমানুষিক পরিশ্রমে সময়মত উঠতে পারেনি বেচারা। আর যদি তাই হয়ে থাকে তবে কি উচিত হবে ওকে ডেকে জাগান? খানিকটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বৈকি? যেভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন, অত সইবে কেন?...

ঘড়িতে সাতটা বেজে যায়। শীতের বেলা কম হ'ল না। কিন্তু সতীনাথের তবু দেখা নেই। এখান থেকে তার ওখানে যাওয়াও নিরাপদ নয়। বাঁকের মোড়ে ক্যাম্প, রাস্তাও দু'মুখো। যদি ভিন্ন পথ দিয়ে সে এসে পড়ে? অনর্থক তা' হলে শুধু দেরীই হয়ে যাবে।...নিরুপায় জয়া সমুহ ভাবনা রেখে কক্ষস্থিত শিশু কয়টিকে খেলা দিতে উদ্যত হয়। সতীনাথ আসে বেলা প্রায় আটটায়। বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় না তার মধ্যে। ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করে জয়া, এত দেরী হ'ল আপনার?

শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর করে সতীনাথ, হ্যাঁ, আজ আর আমার যাবার উপায় নেই। হেড অফিস থেকে তাগিদ এসেছে, আজই কোলকাতা ফিরে যেতে।

জয়ার সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন মুহূর্তে উবে যায়। এক মিনিট নীরব থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন করে, তা'হলে?...

অসমাপ্ত কথাটাকে সমাপ্ত করে সতীনাথ, তা'হলে আপনারও আর গিয়ে কাজ নেই। বরং আপনিও চলুন আমার সঙ্গে কোলকাতা।

জয়া তাই যাবে। মন্দ কি, নিরাশ্রয় জীবনে সতীনাথের মত একজন ভদ্র তথা শিক্ষিতের সঙ্গে পথ চলতে? সে সাংবাদিক, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করে দিতে পারবে। এমন উপযুক্ত সঙ্গী জীবনে হয়ত' আর না-ও মিলতে পারে। জয়ার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সতীনাথ খুশি হয় ওর হাবভাবে। নিশ্চয় সহযাত্রী হবে সে তার। কিন্তু সহসা বেঁকে দাঁড়ায় জয়া। কে যেন দু'বাহু বিস্তার করে বাধা দেয় ওকে। না-না, ও কারও গলগ্রহ হতে পারবে না। দাঁড়াতে যদি হয় ওকে তাহলে নিজের শক্ত পায়ের ওপর নির্ভর করেই দাঁড়াতে হবে। কারও দয়ায় কিংবা দাক্ষিণ্যে নয়। সতীনাথ ওর কে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? অসম্মতি জানায় জয়া—ধন্যবাদ, কিন্তু আজ আর আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। চোখের সম্মুখে মানুষের যে দুঃখ দুর্দশা দেখছি, তাতে ইচ্ছে করছে এখানে থেকেই দিন কয়েক ওদের সেবা করি। তাছাড়া, আমার ভাইটিও এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ওঠেনি······

সতীনাথ প্রথমটা যতখানি খোলামনে আহ্বান জানিয়েছিল, জয়ার উত্তরে কেমন যেন সংকোচ বোধ করে। কোনরূপ হ্যাংলাপনা প্রকাশ পেলো কি তার? না-না একি দুর্বলতা! সে পুরুষ মানুষ। জীবনে কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মণিকোঠায় বাসা বেঁধে আছে। জয়া তার কে? দু'দিনের পথের পরিচয়, পথেই রেখে যেতে হবে। সে ত' কোনরূপ সাহায্য চায়নি ওর কাছে! তবে কেন এমন অযাচিত দৈন্য প্রকাশ করতে গেল! ছিঃ ছিঃ, কি ভাবল মেয়েটি!···লজ্জায় সমস্ত মুখ-মণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে সতীনাথের। উদাস কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করে, বেশ, আপনি তাহলে আপনার কর্তব্য পথে এগিয়ে যান, আমি এখন আসি, নমস্কার।

কক্ষছেড়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয় সতীনাথ। জয়া প্রীতি নমস্কার জানিয়ে বাধা দেয়, আপনি কি এক্ষুণি চলে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, তাই ত' সব গুছাতে দেরী হয়ে গেল।

কাজটা বোধ হয় ভাল করেনি। আপন মনেই কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ে। সতীনাথকে ওভাবে উত্তর না দিলেও চলত। সে ত' বন্ধুর মত দরদী হৃদয় নিয়েই আহ্বান জানিয়েছিল। কি প্রয়োজন ছিল ওর তাকে ওভাবে প্রত্যাখ্যন করা ? লজ্জায়—ক্ষোভে নম্র স্বুরেই পুনর্বার প্রশ্ন করে, আর বোধ হয় দেখা হবে না আমাদের ?

পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে ঈষৎ হেসে উত্তর করে সতীনাথ, কেন দেখা হবে না। প্রয়োজন বোধ করলে এখানে খোঁজ করলেই আমার সাক্ষাৎ পাবেন।

জয়া হাত বাড়িয়ে কার্ডখানা গ্রহণ করে। উভয়ে চেয়ে থাকে উভয়ের মুখের দিকে এক মুহূর্ত। সতীনাথ আর একবার শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে —ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বুকের মধ্য হতে তীব্র একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে জয়ার।

নয়

শিয়ালদহ স্টেশনের ভিড় যারা পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তাদের নিয়ে। আর হাওড়া স্টেশনের ভিড় যারা এখান থেকে যাচ্ছে তাদের কেন্দ্র করে। তফাৎ অনেকখানি। যারা এসেছে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। আর যারা যাচ্ছে তারা কাল্পনিক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হয়ে যাচ্ছে। সমুহ কোন ক্ষতির কারণ ঘটেনি। তাই শিয়ালদহের ভিড় যেখানে জমাটবাঁধা মর্মভেদী—নিয়ম শৃঙ্খলাবিহীন, হাওড়া স্টেশনে সেখানে গায়ে গা লাগে না। এখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে চলায়মান যাত্রীদের ধরে রাখতে। আশ্বাস দিচ্ছে বিপদের কোনরূপ সম্ভাবনা নেই। অনেকে ফিরছে। যারা না ফিরছে তারাও স্ব স্ব তৈজষপত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে পাড়ি দিতে পারছে। সুতরাং হা-হুতাসের কোন কারণ নেই। নিরাপত্তার জন্য রয়েছে রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী পিকেট। ভ্রাম্যমাণ সান্ত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের চতুর্দিক। স্টেশনেও রয়েছে উপযুক্ত প্রহরী। বিক্ষুব্ধ জনতা অতর্কিতে কোথাও কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তজ্জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পূর্বাহ্নেই প্রতিফলিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে জনচিত্তও ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু হয়েছে।

সেদিন শনিবার। ডেলি প্যাসেন্‌জারের ভিড় অন্যান্য দিন অপেক্ষা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। রিক্‌সা, ট্রাম, বাস, ট্যাক্‌সীতে বেলা একটা হ'তে সমস্ত স্টেশন সরগরম। যত বিকেল হয়ে আসছে ভিড় যেন ততই বেড়ে চলেছে। বেলা আড়াইটে আন্দাজ একখানি ফিটন গাড়ী এসে পুব দরজায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা সড়িয়ে দু'জন বলিষ্ঠ যুবক বেরিয়ে আসে ফুটপাথে। পরনে মুসলমানী পোষাক। নির্দিষ্ট গাড়ী ধরবার জন্য খুব ব্যস্ত মনে হয় উভয়কে, হয় ত' উদ্বাস্তু হয়েই চলে যাচ্ছে। একজন

তাড়াতাড়ি ছুটে যায় টিকেট ঘরের দিকে। অবশিষ্ট জন ভাড়া মিটিয়ে তৎপর হয়ে ওঠে গাড়ীর মধ্য হতে বোরকাবৃত একটি স্ত্রীলোককে হাত ধরে নামাতে। কুলির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে এগিয়ে চলে প্ল্যাট্‌ফরমের দিকে। প্রথমোক্ত যুবকটি ততক্ষণে টিকেট নিয়ে ফিরে এসে অধিকতর তাড়া দেয়। না, স্ত্রীলোকটি যেন কিছুতেই চলতে পারছে না। প্রচণ্ড শীতেও যেন বেচাবা বোরকার নীচে হাঁপিয়ে উঠেছে। মুহুর্মুহু ঢাকনা সড়িয়ে শ্বাস ফেলতে চেষ্টা করছে। যুবকদ্বয়ের সরোষ গর্জনেও যেন কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ নেই। উভয়ে এক প্রকার নিরুপায় হয়েই যেন টেনে নিয়ে চলেছে ওকে। ফটকের কাছাকাছি এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্ত্রীলোকটি। খুব আহত হ'ল কি বেচারা? যুবকদ্বয় তাড়াতাড়ি হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করে। দর্শকের ভিড় জমে ওঠে এক এক করে। একজন বেগতিক দেখে ছুটে পালায় জল আনবার অছিলায়। দ্বিতীয়জন কোনরূপ পথ খুঁজে পায় না। স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে ঢাকনা খুলে চীৎকার করে ওঠে, আমাকে বাঁচান, রক্ষা করুন আপনারা। আমি হিন্দু, জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা আ—মা—কে…বলতে বলতে ভয়ে মূর্ছা যায় বেচারা। ক্ষিপ্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে অপেক্ষারত যুবকটির উপর। নির্বিচারে চলে কিল চর ঘুষি। সময়মত পুলিশ এসে না পড়লে হয় ত' জীবন্ত পাওয়া যেত না ওকে। সমস্ত স্টেশনে সোরগোল পড়ে যায়। মুসলমান যাত্রিকুল ত্রস্ত হয়ে ওঠে ভয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় শান্তি অব্যাহত রাখে সান্ত্রীগণ। কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পরেই জ্ঞান ফিরে পায় বিজয়া। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা। সরকারী শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যথাকর্তব্যের পর।

দশ

আজ দশ দিন বিদায় নিয়েছে সতীনাথ। জয়া প্রাণপণে নিজের কর্তব্য করে চলেছে। কোথাও অতটুকু শৈথিল্য নেই। তবু সময় সময় নিজকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হয়। অগণিত নরনারী মিছিল করে চলেছে চোখের সম্মুখ দিয়ে। কিন্তু তাদের কাউকে যেন নাগালের মধ্যে পায় না। যে ছিল আপন, সে যেন কোথায় কোন অদৃশ্যলোকে হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজে বার করবার সমস্ত পথই যেন আজ রুদ্ধ। শূন্য হৃদয় বেদীতে স্মৃতির নিরন্তর দংশন অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই কাজ ফুরুলেই আর একটা কাজের জন্য রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে হয় ওকে। অবসর মুহূর্ত বেদনাদায়ক মর্মঘাতী। হৃদয়-তন্ত্রীর স্তবকে স্তবকে বেজে ওঠে মেঘমল্লার। কিন্তু কে সে মরমী বন্ধু? সে কি সতীনাথ? না—না, সতীনাথ ওর কেউ নয়। কি সম্বন্ধ ওর তার সঙ্গে? প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করে যখন ঠকেছে, তখন রাস্তার লোককে বিশ্বাস কি? কিছুমাত্র ভুল করেনি তার সঙ্গে পথ না চলে। ...ভাবতে ভাবতে অধীর হয়ে ওঠে জয়া। হ'চোখ বেয়ে নেমে আসে উত্তপ্ত অশ্রধারা। কিন্তু মনের কথা কাউকে মুখ ফুটে বলার সুযোগ নেই। নীড়-হারা পাখী ভেসে চলেছে উর্ধ্বে—অনন্ত নীলিমার কোলে। সে কি কখন আশ্রয় পাবে?

ক্যাম্পের কাজ ইতিমধ্যে মন্থর হয়ে এসেছে। আজকাল আর সীমান্তে যেতে হয় না জয়াকে। কেন্দ্রে অবস্থিত রুগ্ন আর শিশুর পরিচর্যায়ই দিন কেটে যায়। আগন্তুকের ভিড় এক প্রকার নেই বললেই চলে। প্লাবনের মত দুর্বার গতিতে ছুটে গিয়েছে যে যেখানে পেরেছে। স্রোত থেমে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে নিদারুণ ভাটা। হয় ত' দিন কয়েকের মধ্যেই উঠে যাবে ক্যাম্প। বন্ধ হয়ে যাবে আলোড়ন। তখন?...নূতন ভাবনা

এসে পাক খেতে থাকে জয়ার দুর্বল মস্তিষ্কে। হয় ত' জোড়া তালি দিয়ে আরও দিন কতক কেটে যেতে পারে, কিন্তু ক্যাম্প সর্বাধিনায়ক সুধীন্দ্র নারায়ণের অযাচিত করুণা বর্ষণ অসহ্য। সতীনাথ চলে যাবার পর থেকেই এই লোকটা নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করছে। পুনর্বাসন অধিকর্তা তাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইচ্ছে করলেই একটা মোটা রকমেব খয়রাতি সাহায্য আদায় করে দিতে পারে। এম্‌প্লয়মেণ্ট অফিসেও হাত আছে, চাকরী যোগারে কিছুমাত্র সময লাগবে না। তা' ছাড়া তার স্বীয় প্রতিষ্ঠান "অন্নপূর্ণাশ্রমেও" নাকি খেয়ে থেকে স্বচ্ছন্দে ভাইটিকে মানুষ করা যায়। এম, এ, পবীক্ষাটাও প্রাইভেট দেওয়া যেতে পারে। বহু নামকরা অধ্যাপক জড়িত আছেন আশ্রমের সঙ্গে ··শুনে শুনে জয়ার বিরক্তি ধরে গেছে। কে চায় ওর সাহায্য? ক্যাম্পের খাওয়া থাকা থেকে আরম্ভ করে, কাজকর্ম, সব কিছুতেই যেন বেহায়াটার ওকে নিয়ে বাড়াবাড়ি। অতটুকু লজ্জা নেই যেন। সরু গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকী হেসে ড্যাব ড্যাব কবে যখন তাকায় পাজীটা, তখন প্রথম রাত্রেই সেই বর্বর দু'টোর কথাই মনে করিয়ে দেয়। অথচ আশ্চর্য, এই লোকটাই নাকি আবাব একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক! সরকাব থেকেও নাকি মোটা সাহায্য দেওয়া হয় ওর প্রতিষ্ঠানকে!

জয়ার অন্তরে স্বস্তি নেই। ক'দিন থেকেই ভাবছে, এখান থেকে চলে যাবে। সুধীন্দ্রনারায়ণকে সহ্য করা আদৌ সম্ভবপর নয়। কিন্তু যাবে কোথায়? সম্মুখে পশ্চাতে কোথাও যে আশ্রয়ের নিশানা নাই। তা'ছাড়া শুধু নিজের কথাই আজ আর ভাবলে চলবে না। শিশু ভাইটিকে যে ভাবেই হোক মানুষ করতে হবে। একমাত্র বংশধর। ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা। দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকতে কিছুতেই অনাথ আশ্রমে পাঠান যাবে না। না, না; কিছুতেই না···জটিল চিন্তায় ললাটের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। উত্তাপ বোধ করে মস্তিষ্কে। ক্যাম্প সঙ্গিনী লতিকা ছুটে এসে খবর দেয়, সুধীন্দ্রনারায়ণ এইমাত্র দিন কয়েকের জন্য বাইরে

গেল। জয়ার অপূর্ব সুযোগ। বড় মুক্ত মনে হয় নিজেকে। পাজীটা যেভাবে পেছন নিয়েছিল, তাতে যেন পালাবারও উপায় ছিল না। আর দেরী নয়। যার নিকট বর্তমান অচল, তার পক্ষে সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনা নিরর্থক। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ও চলে যাবে এ ক্যাম্প থেকে।

দশটার গাড়ীর সিগন্যাল ডাউন হয়েছে। জয়া চট পট গুছিয়ে নেয় বিছানা সুটকেশ। শিশু ভাইটিকে কোলে করে নিমেষে বেরিয়ে আসে ক্যাম্পের বাইরে—স্টেশনের পথে। শরনার্থী আর একটি বালক পৌছে দেয় মোট বিছানা। ট্রেনে উঠে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে জয়া।

এগারো

গাড়ী চলেছে ক্ষীপ্র গতিতে স্টেশনের পর স্টেশন পার হ'য়ে। জয়ার হৃদয়াবেগ বাঁধ মানে না। একের পর এক রাশিকৃত এলোমেলো ভাবনা এসে ব্যাকুল করে তোলে। ক্যাম্পে থাকাকালীন খাওয়া পরার কোন ভাবনা ছিল না। সুধীন্দ্রনারায়ণের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত আহার্য তুলে ধরতে পেরেছে কচি ভাইটির মুখে। কিন্তু এখন? ঘুমিয়ে পড়েছে অভাগা। জেগে উঠেই শুরু করবে দুরন্তপনা। খিদের জ্বালায় হয়ত' এক্ষুণি উঠবে চেঁচিয়ে···জয়ার বুক ফেটে কান্না আসে। এক কৌটা দুধ কিনে খাওয়াবার সামর্থ্য পর্যন্ত আজ নেই। অথচ শৃঙ্খলিত ব্যবস্থাকে পায়ে দলে চলেছে। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গবাক্ষ পথে—দূর দিগন্তে। কোথায় চলেছে ও? একটার পর একটাকে ছেড়ে দাঁড়াবে গিয়ে কোথায়? পশ্চাতে পৈশাচিক বিভীষিকা, সম্মুখে নিরন্ধ্র অন্ধকার। পথ নেই—পথ নেই···ট্রেন এসে দাঁড়ায় শিয়ালদহ স্টেশনে। অধিকাংশ যাত্রীই উদ্বাস্তু—আশ্রয়প্রার্থী। সুতরাং আবার হৈ চৈ পড়ে যায় সকলের মধ্যে। দলে

থলে ছুটে আসে স্বেচ্ছাসেবক আর সেবিকাগণ সাহায্য করতে নামিয়ে নিতে। চেষ্টার ত্রুটি নেই। নানাবিধ সেবা-কেন্দ্র খোলা আছে। তবু নিয়ম কানুনে বিরাট বিশৃঙ্খলা। যত্র তত্র মল-মূত্রে সমস্ত স্টেশনময় পুতিগন্ধ। গা রি রি করে ওঠে। তবু এরই বুকে সহস্র সহস্র মানুষ নিশিদিন ধুকছে। কোথাও ঠাঁই নেই এতটুকু। এক-ই সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে—কলেরা, বসন্ত আর যক্ষ্মা রুগী। তারই পাশে বসে যুবা বৃদ্ধ শিশু বিলিয়ে দেওয়া খাবার খাচ্ছে গোগ্রাসে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কখন দু'মুঠো চীড়ে গুড়, দু'খানা পোড়া রুটি ও একটুকরা ছেঁড়া কাপড় বিতরণ হবে তার সন্ধানে! হায়রে মানুষ, হায়রে তার ভাগ্যলিপি! বনের পশু-পক্ষীরও বোধকরি এমন দৈন্য নেই। মহানগরীর বুকে, সভ্য মানুষের কলাকেন্দ্রে, যেভাবে দিন কাটাচ্ছে মানুষ নামধারী রাশিকৃত এই হতভাগ্যের দল!

জয়া ঘুমন্ত ভাইটিকে সযত্নে কাঁধের ওপর ফেলে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মের ওপর নেমে আসে। দু'জন স্বেচ্ছাসেবিকা সাহায্য করে ওকে। যথারীতি আশ্রয়স্থলে পৌঁছে নাম-ধাম লিখে নেয় এ-খাতায় ও-খাতায়। যাযাবরের জীবন এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে। শোকে দুঃখে অন্তরদেবতা আর্তনাদ করে ওঠে জয়ার। বুঝিবা পাগল হয়ে যাবে ও।...

আজ দু'দিন এখানে আছে জয়া। এ-শিবিরটি সম্পূর্ণ মহিলা-পরিচালিত। দুস্থ স্ত্রীলোক আর শিশুদিগকেই কেবলমাত্র আশ্রয় দেওয়া হয় এখানে। জয়ার ভদ্র মন, পৌঁছেই কাজ খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখাতে পারে না উপযুক্ত নির্দেশের অভাবে। ক্যাম্পকর্ত্রী স্বয়ং আজ ওকে কিছুটা কাজের ভার দিয়েছেন। হয়ত' উপযুক্ত যাচাইয়ের পরই এ-ব্যবস্থা। মনে মনে আশাতীত খুশি হয় ও। না, উমাদেবী সত্যি দরদী স্নেহপরায়ণা। ওর মায়ের বয়সী-ই হবেন। গায়ের রং শ্যামলা হলেও বেশ ছিমছাম। হাবভাব কথাবার্তাও গুরুগম্ভীর। দলনেত্রী

ঠিক মানিয়েছে ওঁকে। শ্রদ্ধায় নত করে দেয় শির। শিশু ভাইটিও বেশ যত্নে আছে এখানে। রানাঘাট অপেক্ষা এদের ব্যবস্থা ঢের উন্নততর। ভবিষ্যতের নিশানাও কিছু পাওয়া যেতে পারে এখানে। নির্বিচারে কাজ করে যায়। উমাদেবীকে প্রসন্নই মনে হয় ওর প্রতি। ফুরসুৎ পেলেই নানাভাবে ভরসা দিয়ে থাকেন তিনি ওকে। নীড়-হারা পাখী কি নীড় ফিরে পাবে আবার?…এখানে কাজ করেও সুখ আছে। কোনরূপ পুরুষ মানুষের ঝামেলা নেই। সময়-অসময় দু'চারজন বয়স্ক তরুণ যুবাকে উমাদেবীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে দেখা গেলেও অন্যান্য মেয়েরা নিশ্চিন্ত। ক্যাম্পের ভেতরে কা'রও প্রবেশ করার হুকুম নেই। বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকলে বাইরে গিয়ে কথা বলতে হবে। দলনেত্রীর কড়া আদেশ।

জয়া পৌঁছে অবধি একটি দিনের জন্যও বাইরে যায়নি। সংসারে কে আর ওর আপনজন আছে যে তার সঙ্গে গিয়ে কথা বলবে? বরং ভয়, বাইরে গেলে পাছে আবার সেই নচ্ছার সুধীন্দ্রনারায়ণটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। পাজীটা যেরূপ হ্যাংলা একবার টের পেলে আবার পেছন তাড়া করবে। কে জানে, সতীনাথের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তাকেই-বা আর ওর প্রয়োজন কি? চোখ মেলে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত জয়া বাইরের দিকে।

দশদিন পার হয়ে যায় এখানে আছে জয়া। এখানকার এই একটানা পরিশ্রমে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই ওর। কাজ আছে বলেই বেঁচে আছে, নয়ত' পাগল হয়ে যেত। উমাদেবীকে সত্যি ওর খুব মনে ধরেছে। মহিলাটি প্রত্যহ নিয়মিত সকাল সাতটায় শিবিরে আসেন আর সেই বেলা বারটায় স্নানাহার করেত বাসায় ফেরেন। আবার বিকেল তিনটে না বাজতে বাজতেই ঘুরে এসে রাত দশটা পর্যন্ত একটানা খেটে যান। কোন কোন রাত বাসায়ও যান না। শিবিরেই কাটিয়ে দেন আর দশটি মেয়ের

সঙ্গে। মেজাজও খুব নম্র। মেয়েরা কখন কোন ভুল ত্রুটি করলে অসভ্যের মত চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করেন না। দরদ দিয়েই শুধরে নেবার সুযোগ দেন। দোষের মধ্যে একটু পান দোক্তা খান। তা' এমন আর কি দোষের? অনেক ভদ্রমহিলারই ত' অভ্যেস আছে। নিজে তিনি ওকে দু'খানা শাড়ী, দু'টো ব্লাউজ ও ছোট ভাইটিকে দু'টো ইজের কিনে দিয়েছেন। মায়ের মতই স্নেহশীলা।...

এখানকার কাজও ইতিমধ্যে অনেকটা মন্দীভূত হয়ে এসেছে। তবু জয়া পূর্বের ন্যায় নিজকে তেমন বিপন্ন বোধ করে না। সকল ভাবনা যেন উমাদেবীর। তিনি যা' আদেশ কবেন, ও চোখ বুজে তাই করে। কয়েকদিন আগে নিজে ডেকে ওকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, 'এখানকাব কাজ শেষ হলেই তোমাকে আমাদের আশ্রমে নিয়ে যাব মা'।...জয়াব মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আশ্রমের কথা শুনে। মায়েব আশ্রম-শান্তির নীড়। কচি ভাইটিব মুখের দিকে উৎসাহদীপ্ত নয়নে খানিক তাকিয়ে থাকে। বুক ভরে ওঠে আনন্দে। সত্যি তা'হলে আব ওকে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে না। বড় হবে খোকন...ভাল লেখাপড়া শিখবে...দেশের ও দশের হবে এক...ছুটে গিয়ে কোলে নেয় সস্নেহে...চুমুতে চুমুতে ভরে দেয় কচি সোনা মুখ।...

বারো

রাত আনুমানিক এগারোটা। মানিকতলার হলদে ত্রিতল বাড়ীর ফটকে এসে একটা ফিটন গাড়ী লাগে। দোতলার রেলিংএর গায়ে বড় বড় অক্ষরের সাইনবোর্ড ঝুলছে "অন্নপূর্ণাশ্রম"। গাড়ী থেকে নামতে হঠাৎ চোখ পড়ে জয়ার। বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। সুধীন্দ্রনারায়ণ তার আশ্রমের নাম এরূপই একটা কি বলেছিল না! যদি এইটেই তার পরিচালনাধীনে হয়ে থাকে। শেষটায় কি স্বেচ্ছায় এসে বাঘের ঘরে পা দিল!···নামবার আর তেমন উৎসাহ থাকে না। উমাদেবী ততক্ষণে বাঁদিকের দরজাটা টেনে রাস্তার ওপর থেকে সম্বর্ধনা জানান, 'এস মা, এইটেই আমাদের আশ্রম।'

কম্পিত চরণে নেমে আসে জয়া। ভাড়া মিটিয়ে ফটকের দিকে রওনা হন উমাদেবী। জয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ। আশঙ্কায় পাক খেতে থাকে অন্তর্যামী[illegible]। কিন্তু উপায় নেই! উমাদেবীর ডাক-হাঁকে একটি পশ্চিমা চাকর এসে বিছানা সুটকেশ ওপরে নিয়ে যায়।

ফটকের বাঁদিকের দেয়ালের গায়ে 'নেমপ্লেটে' লেখা আছে ডাক্তার সোমনাথ সেন, এম, বি, গাইনোকোলজিস্ট। ডাক্তার তখনও জনকয়েক আগন্তুকের সঙ্গে নিজের নির্দিষ্ট আসনে বসে কি সব আলোচনা করছিলেন। সহসা চোখ কপালে তুলে [illegible] তাকিয়ে দেখেন জয়াকে। বয়স পঞ্চাশ উর্ধ্ব, গৌরবর্ণ। সমস্ত মাথা জুড়ে বিরাট টাক বৈদ্যুতিক আলোতে চিক্ চিক্ করছে। চোখাচোখি হতেই অপ্রস্তুত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় জয়া। কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। ডানদিকের বিরাট [illegible] তার প্রসূতি-আগার। রাস্তার দিকের জানালায় পর্দা টাঙানো। মনে হয় নিম্ন পর্যায়ের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে। কোন রুগিনী আছে

কিনা বুঝা যায় না। এ-পাড়ার লোক সোমনাথকে খুনে বলে অপবাদ দেয়। তাদের মতে সোমনাথ নাকি অবৈধ প্রসব করিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। শিশু রপ্তানিতেও নাকি তার জুড়ি নেই। প্রথম প্রথম বারকয়েক পুলিশ হামলা হলেও ইদানীং আর কোন উৎপাত নেই। সোমনাথের হাতযশে শহরের বহু হোমরা-চোমরা ব্যক্তির পাশপোর্ট সংগৃহীত হয়েছে। কেউ কেউ সাক্ষাৎ পায়ের ধুলো দিতেও কার্পণ্য করেন না। দান খয়রাতও আছে বহু ধনকুবেরের।

দোতলায় উঠে আসেন উমাদেবী জয়াকে সঙ্গে করে। সাতখানি ঘর। পাঁচখানি জুড়ে কুটির শিল্পের সাজসরঞ্জাম। সেলাইয়ের কল, তাঁত, খেলনা, আচার, ডালের বড়ি, বেতের ঝুড়িতে বোঝাই। শুধু দক্ষিণ কোনের ঘর দু'খানি আশ্রমবাসীদের বসবাসের জন্য। ওরই একটিতে বসে তখনও সাত-আটটি সধবা, অধবা, বিধবা, তরুণী, যুবতী আর চার-পাঁচটি তরুণ, যুবক মিলে হাসি গল্প করছিল। উমাদেবীর হঠাৎ আবির্ভাবে সকলেই স্তম্ভিত নয়নে উঠে দাঁড়ায়। জয়াকে নিমেষে ঘরখানি দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে উদ্যত হন তিনি। কক্ষস্থিত সকলেই ঈষৎ হাসিতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে পরস্পর। উমাদেবীর সরোষ কটাক্ষে সংযত হতে চেষ্টা করেও তাল সামলাতে পারে না ওরা। তীব্রভাবে আঘাত লাগে জয়ার অন্তরে। চতুর্দিক থেকে যেন বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসি ঘৃণা প্রকাশ করছে ওর উদ্দেশ্যে। মুখ ঢেকে ওপরে উঠে আসে উমাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ। শিশু ভাইটি কাঁধের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় ভারী বোধ হতে থাকে। নিরালায় কোথাও একটু বসতে পারলে বাঁচা যায়।

তেতলায় উঠে প্রথম ঘরটিতে ঢুকেই কোচের ওপর গা এলিয়ে দেন উমাদেবী। ক্লান্তিতে আই-ঢাই করতে থাকেন। জয়াকে সম্মুখের আর একটিতে বসতে ইঙ্গিত করে খানিক জিরিয়ে নেন। ভাইটিকে কোলের ওপর শুইয়ে দিয়ে চতুর্দিক নিরীক্ষণে বিস্মিত হয় জয়া!

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। আধুনিক রুচিতে সুসজ্জিত। দেয়ালে দেয়ালে বিলেতী ছবির লহর। টিপয়ের ওপর ফুলদানীতে আজও রজনীগন্ধার গুচ্ছ পালটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অজান্তেই কেন যেন জয়ার মুখ থেকে ঝরে পড়ে, একজন আশ্রমবাসিনীর এত ঐশ্বর্য !···

রাত অনেক হল, চল ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়া যাক। হাই তুলে উঠে দাঁড়ান উমাদেবী। স্ক্রীন টেনে সংলগ্ন বড় ঘরটিতে প্রবেশ করেন জয়াকে সঙ্গে করে। বিস্মিত নয়ন অধিকতর বিস্ময় বোধ করে জয়ার। প্রকাণ্ড খাটের ওপর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা। আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, রেডিও, আলমারীতে সুসামঞ্জস্য। উমাদেবী জামা-কাপড় ছাড়তে উদ্যত হন। জয়াকে পার্শ্ববর্তী কোনের ঘরটি দেখিয়ে দেন। দীর্ঘ শিবির-জীবন যাপনের পব আজকের এই অবস্থায় জয়ার অন্তরদেবতা কেঁদে ওঠে। এক নিমেষে মনে পড়ে যায় অতীতের সবকিছু। মা, বাবা, বাড়ী, ঘর, দোর কাকেও যেন ভুলতে পারে না। কেমন করে যেন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু। ঝি'য়ের তাড়ায় সামলে নেয়। ভাইটিকে তক্তপোষের ওপর শুইয়ে দিয়ে হাত মুখ ধুতে কলঘরে যেতে হয় তক্ষুণি।

উন্মুক্ত ছাদ পার হয়ে পশ্চিম কোনে কলঘর—পায়খানা। উত্তর দিকের সম্মুখে রান্নাঘর ও খাবার ঘর। একাদশীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। আলসেতে আলসেতে টবের ওপর বিচিত্র পাতাবাহারের গাছ ও বিলেতী মরসুমী ফুলের ঝাড়। ছাদে কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই। শুভ্র চন্দ্রালোকে উৎফুল্ল দিগ্‌বলয়। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় জয়া। উমাদেবীকে আন্দাজ করে উঠতে পারে না। এত ঐশ্বর্য, অথচ তেমন কোন লোকজনের সাড়াত' পাওয়া যাচ্ছে না! ঐ ত' মাত্র একটি ঝি। বড় জোর রান্নাঘরে রাঁধুনি কেউ থাকতে পারে! তবে কি···না, না, ছিঃ, একি মিছে সন্দেহ ওর! নিশ্চয় কোন ধনীর দুলালী হবেন। কোন

কারণে হয়ত' সারা জীবন কুমারী থেকে সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। নাটকে, নভেলেত' এমন অনেক চরিত্র দেখা যায়। জয়ার মেখলা মনে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায়। বেশ লাগে শুভ্র এই পরিবেশ। ভাগ্যবতী ছাড়া এমন আশ্রয় পাওয়া সম্ভবপর নয়।

হাত মুখ ধোয়া হ'লে আবার নিজের কাছে ডেকে পাঠান উমাদেবী। প্রচণ্ড শীত পড়েছে আজ। খাবার ঘরে গিয়ে খেতে মন সরে না। জয়াকে নিয়মতান্ত্রিক সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করে আদুরীর মার উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়েন, কইগো মেয়ে, আমাদের জায়গাটা আজ এখানেই করে দাও, বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে।··

আদুরীর মা, অর্থাৎ যে মেয়েটি ঝি'য়ের কাজ করে তার মা। বয়স ত্রিশ বত্রিশ, বিধবা। মা মেয়ে একাধারে পাচিকা ও পরিচারিকা। জয়ার খাবার কথা পূর্বেই জানিয়ে গিয়েছিলেন উমাদেবী। সুতরাং তৈরীই ছিল সব। তাড়াতাড়ি মেঝেটা আর একবার মুছে নিয়ে দু'খানি কার্পেটের আসন বিছিয়ে ঠাঁই করে দেয়। উভয়ে খেতে বসে পাশাপাশি। লুচি, মাংস, দু'তিন রকমের ভাজা, তরকারী, সর্বশেষে উৎকৃষ্ট সন্দেশ। কোথাও ত্রুটি নেই। একজন আশ্রয়-প্রার্থীর পক্ষে এরূপ আহার্য আশাতীত। মুখ নত করে একটা লুচি ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিতে উদ্যত হয় জয়া। কেমন যেন সংকোচে ভাল করে খেতে পারে না। উমাদেবী কিছুটা অনুমান করেই সান্ত্বনা দেন, লজ্জা কি মা, এ তোমার নিজের বাড়ী। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। খোকনকে তুলে আবার দুধ খাওয়াতে হবে। রাত কম হ'ল না।···জয়া মুখ বুজে খেয়ে চলে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে থাকে একজন ভিখারীর মত আজ ও অন্যের অনুগ্রহে পুষ্ট হচ্ছে।···

দেয়াল ঘড়িতে বারোটা বেজে যায়। নিজের ঘরে আসে জয়া। ঝি এক বাটি গরম দুধ এনে দেয়। খোকনকে তুলে, কোলে করে খাইয়ে

দয় সযত্নে। বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু জয়ার ঘুম আসে না। কত কথাই না মনে হতে থাকে একবার ভাবে, উমাদেবী মানবী নন, সাক্ষাৎ দেবী। আবার কে যেন কণ্ঠরোধ করে ভয় দেখাতে চেষ্টা করে, দেবী নয়, দেবী নয়, মূর্তিমতী ডাইনী—পালাও ··জয়ার দম বন্ধ হয়ে আসাব উপক্রম হয়। একি অলীক আশঙ্কা, ছিঃ! এপাশ ওপাশ করতে করতে কখন যেন তন্দ্রায় ঢলে পড়ে।

তেরো

এক এক করে সাতদিন পার হ'য়ে চলে উমাদেবীব আশ্রমে আছে জয়া। উপাদেয় আহার্য আর পোষাক পরিচ্ছদের জৌলুস প্রথম দিন কয়েক মনে স্ফূর্তি এনেছিল। কিন্তু আজ দুদিন, আপন মনেই কেমন মন ঝিমিয়ে পড়েছে। উমাদেবীর দেওয়া বসন-ভূষণ আর আহার্য কোন-ক্রমেই গলাধঃকরণ হতে চায় না। প্রতিদিনই ভাবে, আজ নিশ্চয় কোন কাজের নির্দেশ পাবে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় দিন কেটে যায়। কিন্তু কোন সুযোগ আসে না। শুধু খাও, ঘুমোও আর সাজ পোষাক কর। ছিঃ, একি অনাসৃষ্টির কথা। আশ্রম জীবন, কোথায় কঠোরতা থাকবে, দিনরাত খেটে কুল পাবে না, তা না, যত সব বাজে কথা আর শুয়ে বসে দিন কাটান।···কেমন যেন ভয় ভয় করে জয়ার মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না। উমাদেবীর বাহ্যিক স্নেহ যত্ন নিঃসন্দেহে আশাতীত। কে জানে হয়ত' নিজের গর্ভজাত সন্তানের মতই দেখছেন। মায়ের প্রাণ, কোন কঠোর কাজই করতে দিতে চায় না।··· অশান্তি হলেও অপেক্ষা করেই চলে জয়া ·· কিন্তু বিবেক যেন কিছুতেই

নিশ্চিন্ত থাকে না। প্রতিটি অবসর মুহূর্তে মনে হয়, দিন এভাবে যাবে না। একটা কিছু করতেই হবে ওকে। পরের কি অত দায় পড়েছে—সারা জীবন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে!...

সুদীর্ঘ এই দশদিনের ভেতর মাত্র একদিন উমাদেবী নিজে সঙ্গে করে দোতলার শিল্পালয় দেখিয়ে এনেছেন। কা'র সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় পর্যন্ত হয়নি। কোথায় কে কি কাজ করে, কিংবা আদৌ কোন কাজ হয় কিনা, তা' ও বিন্দু বিসর্গ জানতে পারেনি। একি বন্দী জীবন! হোক না মেয়ের মত, নীচে যেতে দোষ কি? কই নিজে ত' রাস্তা-ঘাটে চলতে এতটুকু দ্বিধা করেন না! পেটের মেয়ের মতই যদি ভাববেন, তা'হলেত নিজের সমস্ত কাজ ওকে বুঝিয়ে দেওয়াই সমীচীন। তা'ছাড়া ঘরে বসে কাজ করতেই বা আপত্তি উঠবে কেন? না, আর ভাবতে পারে না। কা'কে কোন কথা জিজ্ঞেস করে যে কিছু জেনে নেয় সে উপায়ও নেই। আদুরীর মা হয়'ত কিছু বলতে চায়, কিন্তু কোন সুযোগ নেই বেচারার। সদা সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তার ওপর। একাকী কাছে ঘেঁসবার পর্যন্ত জো নেই। এ'কদিন নিজেও বড় একটা বাড়ীর বার হচ্ছেন না। মাত্র দু'দিন ঘণ্টা তিনেকের জন্য বিকেলের দিকে ঘুরে এসেছেন।, তাও আদুরীর মার কাছে একাকী রেখে নয়। দোতলায় শান্তি বলে যে মেয়েটি আছে, দরদ দেখিয়ে তাকেই কাছে ডেকে দিয়ে গেছেন সঙ্গী হিসেবে। অন্তর সায় না দিলেও—মুখ ফুটে কোনরূপ আপত্তি করতে পারেনি জয়া। উমাদেবীর মধুর সম্ভাষণ সকল দুর্ভাবনাকে জল করে দিয়েছে।

প্রথম দিন শান্তিকে কাছে পেয়ে ভেবেছিল, ওর কাছ থেকে কিছুটা রহস্য উদ্ধার করবে। কিন্তু মেয়েটা এতই প্রগলভা যে এঁটে ওঠা শক্ত। উপরন্তু গোড়াতেই অনুচর বলে ঘৃণা জন্মে। ভাল করে কথা বলতে পর্যন্ত মন-সরে না। কিন্তু হলে কি হবে, শান্তিকে পাশ কাটাতে

চেষ্টা করলেও শান্তি অত সহজে ওকে নিষ্কৃতি দেয় না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে ঝালাপালা করে তোলে। নিজের দেমাকটাই কি কম? আশ্রমের সকল ভার যে এখন ওর ওপর ন্যস্ত, একথা অন্তত দশবার জানিয়ে দিয়েছে এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে। জয়ার বিতৃষ্ণা প্রবলতর হয়ে ওঠে। কোথায় আত্নীয় মার সঙ্গে বসে দু'দণ্ড সুখ দুঃখের কথা কইবে তা না, যত সব আজে বাজে কথা। ছিঃ, একটু ঘেন্না পর্যন্ত নেই বেহায়াটার! এত বকব বকরও লোকে করতে পারে!…

শান্তি থামে না। জয়ার মনের অবস্থা কিছুটা অনুমান করেই যেন অধিকতর খোঁচাতে থাকে, রাগ করিসনে ভাই, আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, সব কথা কি গুছিয়ে বলতে জানি? তা ভাই, নাগরকে কোথায় রেখে এলি?

জয়ার সমস্ত গায়ে কে যেন জল বিছুটির চাবুক মারে। কি উত্তর দেবে সহসা ভেবে পায় না। অসম্ভব রাগ হতে থাকে উমাদেবীর ওপর। জেনে শুনে এমন একটা বাচাল মেয়েকে ওর কাছে ডেকে দিয়ে গেলেন, ছিঃ! ঘুরে আসুন, যা'হয় একটা বুঝাপড়া করবেই। না হয় এখান থেকে চলে যাবে। অত ভয় কিসের? চোখ মুখ রক্তিম করে নীরবেই শান্তির প্রশ্নের জবাব দেয়। কিন্তু ভয় পাবার মেয়ে শান্তি নয়। এতটা বয়সে এমন ঢের ঢের মেয়ে ও দেখেছে। তাছাড়া ওর নিজেরও বড় একটা কম রূপ যৌবনের জৌলুস ছিল না। এখনই না হয় কিছুটা ভাটা পড়েছে। অত দেমাক কিসের? পুনশ্চ বাঁকা হেসেই পুনরাবৃত্তি করে, তা ভাই, নাগর না থেকেও যদি ছেলে হয়, তা হলে আমার ঘাটই হয়েছে, মাপ কর। কিন্তু এমন হাল হ'ল কি করে?

গর্জে ফেটে পড়ে জয়া, যা জানেন'না, তা নিয়ে কথা বলবেন না।

কি জানিনে লো? তোর ঐ ছেলের কথা? হ্যাঁসালি মাইরী।

জয়ার তরফ থেকে পুনশ্চ প্রতিবাদ আসার পূর্বেই সিঁড়িতে জুতোর

শব্দ শোনা যায়। ক্ষণকাল পরেই উমাদেবী প্রবেশ করেন। জয়ার হাব-ভাবে কিছু একটা ঘটেছে অনুমান করেই সান্ত্বনা দিতে থাকেন, শামণির কি হ'ল? শাস্তিটা বুঝি এতক্ষণ জ্বালিয়েছে? কি দুষ্টু মেয়ে বাবা, সকলের পেছনেই লাগা চাই। তা তুমি ওর কথায় কিছু মনে ক'র না। মুখে ও তোমাকে যা-ই বলুক, কাজের বেলায় দেখবে, ওকে তোমাব খুব পছন্দ হবে।

শান্তি আপন মনেই হাসতে থাকে। জয়ার তবু যেন গ্লানি দূর হয় না। জীবনে কখনও এরূপ কটূক্তি শোনেনি। কিন্তু উপায় কি? উমাদেবী সে সব কিছু জল করে দেন। একবারও কি পারল প্রতিবাদ করতে? নিশ্চয় যাদু জানেন।...

সারারাত্রি ঘুম হয় না জয়ার। অনেক করে ভেবে দেখতে চেষ্টা করে এই উমাদেবীকে। শান্তিকে দিয়েই যদি বিচার করতে হয় তাহলে কোনক্রমেই এ আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা যায় না। কিন্তু সেইটেই কি ঠিক? মায়ের মত দরদ দিয়ে এই যে একজন মহিলা দিনের পর দিন যথারীতি কর্তব্য করে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতের সকল বোঝা হাসিমুখে বহন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কি কোন মূল্যই নেই?... নেহাৎ ছেলে মানুষ নয়। লেখা পড়াও কিঞ্চিৎ শিখেছে। সুতরাং নিছক অভিমান বশত যদি এখান থেকে চলে যায়, তাতে নিজের ছাড়া অন্য কারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। তাছাড়া, শান্তি কে যে তাকে নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতে হবে? উনি ত' আর ওর হাতে তুলে দেননি, তবে? না মিশলেই হ'ল পাজীটার সঙ্গে...রাত প্রায় ফর্সা হয়ে আসে তবু জয়া ঘুমোতে পারে না। অকারণেই যেন শান্তির কথাগুলো শেলের মত বিঁধতে থাকে। কোন ভদ্র সন্তানের পক্ষে কি কখনও সম্ভবপর এরূপ হীন উক্তি করা?...আবার ভাবে, উমাদেবীর কথাই যদি সত্য হয়, শান্তির স্বভাবটা যদি এমনি ধারা হাল্কা প্রকৃতিরই হয়ে থাকে তা'হলেত'

ওকে হাতিয়ার করেই আশ্রমের সঠিক পরিচয় জানা যায়। একটু মন যুগিয়ে চললেই হ'ল। এতটা বয়েস হয়েছে তবু কেমন খুকীটি সেজে থাকে। গুছিয়ে একটু বলতে পারলেই হ'ল। টলাতে কতক্ষণ? সে ছাড়া উপায়ই বা কি? আদুরীর মাকে ত' কাছেও পাবার জো নেই।··· ভাবতে ভাবতে কখন যেন তন্দ্রায় ঢলে পড়ে জয়া। জেগে উঠতে অনেকটা বেলা হয়ে যায়।

চৌদ্দ

অনেক দিন থেকেই শেঠ কিষেণ লাল বিরক্ত করে আসছেন। দেখা যাক এবার তাকে খুশি করা যায় কি না? আশ্রমেব জন্য টাকাও বড় একটা কম খরচ করেন না···উমাদেবী দ্বিতীয় দিনেও শান্তিকে জয়ার কাছে প্রহরী রেখে বড়বাজারেব উদ্দেশ্যে রওনা হন। জয়াও তার নির্গমনে স্বচ্ছন্দ উল্লাস জানায়। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে আব্দার করে, মাসীমণি, একা একা ভাল লাগে না। শান্তিদিকে একবার দোতলা থেকে ডেকে দিয়ে যাবেন।

গদ গদ কণ্ঠে সোহাগ জানান উমাদেবী, শোন মেয়ের কথা। কবে তোকে আমি একা রেখে গিয়েছি? শান্তি এক্ষুণি আসছে। বলেছিলাম না, ওকে তোর খুব ভাল লাগবে?···

জয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদ করে না। মুখ টিপে [illegible] সলজ্জ হাসতে থাকে।

বেলা তিনটে আন্দাজ উমাদেবী বেরিয়ে যান। মুহূর্ত পড়েই শান্তি পান চিবাতে চিবাতে সহাস্যে উপস্থিত হয়।

সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানায় জয়া, আসুন, আসুন দিদিভাই। ক'দিন যে এমুখোও হননি ?…

হেসে হেসেই জবাব দেয় শান্তি, খুব খুশি দেখছি যে। নাগরকে ফিরে পেয়েছিস বুঝি ?

খুশির কথা নয় দিদি, আগে বল, আমাকে তুমি ক্ষমা করেছ কি না ?

আমি আবার তোকে ক্ষমা করতে যাব কেন ? কি অপরাধ তুই করেছিস ?

বল কি দিদি, অপরাধ করিনি ! কোথায় তুমি ভাল মন্দ দু'টো কথা জিজ্ঞেস করলে, আর তোমাকে আমি ভুল বুঝলাম ? না দিদি, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।…বলতে বলতে প্রায় শান্তির পায়ের গোড়ায় উবুড় হয়ে পড়ে জয়া !

শান্তি দুহাত দিয়ে তুলে ধরে আপন ঢংয়েই বাধা দেয়, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, কি হয়েছে বল দিকি ? আমার কারও গাল মন্দ মনে থাকে না।…

জয়া অনেকটা হাল্কা হয়েই প্রত্যুত্তর করে, আঃ তুমি আমায় বাঁচালে দিদি। আমি ত' ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি জীবনে আর আমার মুখও দেখবে না।

বলিস্ কিলো, তোর মুখ দেখব না ! আমি যে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেছি।

যাও তুমি ভারি দুষ্টু।…বলতে বলতে জয়া শান্তিকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে এসে বসে। এদিক ওদিক দৃষ্টিতে ধারে কাছে কাকেও না দেখে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না।

শান্তি কিছুটা অনুমান করেই প্রশ্ন করে, কিলো, অমন ছটফট করছিস কেন ? কি হ'য়েছে বল না ?

কি আবার হবে, এমনিই ?

হ্যাখ ছুঁড়ী, আমার চোখে ধূলো দিতে চাসনি ?

জয়া পুনশ্চ কিছুটা ইতস্তত করেই জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দিদিভাই, তুমি ত' অনেক দিন এখানে আছ, কেমন ?

তা'ত আছিই, সেই গোড়া থেকে। কিন্তু হ'লে কি হবে, তোর মত ডবল প্রমোসন ভাগ্যে জোটেনি।

মানে ?

মানে আর কি ? এত করেও তোর মত ফুলদিকে বশ করতে পারিনি।

জয়া হতবাক হয়ে পুনশ্চ প্রশ্ন করে, সেকি দিদিভাই, ফুলদি আবার কে ?

কেনলো, তোর গলার মালা ! আশ্রমশুদ্ধ সকলেরই ত' উনি ফুলদি। তবে তোর কথা আলাদা।...

জয়া হেসে হেসেই উত্তর করে, আমি মাসীমা বলেই ডাকি।...

তা হবে ! তবে, শুধু মাসী নয়, একেবারে মালিনী মাসী। নইলে কি আর সোজা তেতলায় স্থান হয় ? আর হবেইবা না কেন ? পুরুষ মানুষ হলে আমিই যে তোর প্রেমে হাবুডুবু খেতাম।

পুনশ্চ হেসে সেই বাধা দেয় জয়া, মাসীমণি কিন্তু সত্যি পুরুষ নন দিদিভাই !

হতে কতক্ষণ ? এই না সেদিন কাগজে দেখছিলাম, কোথাকার কোন হাসপাতালে জন কয়েক রুগিণী মেয়ে থেকে পুরুষ হয়ে চলেছেন !

তবে ত' তোমার সুযোগটা নেওয়া উচিত ছিল দিদিভাই।

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রত্যুত্তর করে শান্তি, আমার কি আর তোর মত ডানাকাটা রূপ আছে যে কাকেও ভুলাতে পারব ? ফুলদি নিজেও যেমন একটি বোঁটা কাটা বেল ফুল, তেমনি জুটিয়েছেনও আর একটি গোলাপ কুঁড়ি। তা' একটু মন যুগিয়ে চলিস যেন !...

বল কি দিদিভাই, তোমার রূপ নেই! অমন···

মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয় শান্তি, দেমাক দেখাসনি ছুঁড়ী। রূপই যদি থাকবে, তবে এখানে পড়ে মার খাব কেন? তবে হাঁ, রূপ না থাকলেও জৌলুস যে একদিন ছিল না, তা' নয়। কিন্তু ঐ মুখপোড়াইত সব খেলে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে জয়া, সে আবার কে দিদিভাই?

কে আবার? তোকে সেদিন বল্‌লুম না, বেলতলার জমিদার বাড়ীর ছোট কুমারের কথা! যিনি এখন স্বদেশী সেজে সরকারের তক্ত তাউসে জেঁকে বসেছেন! ঐ হারামজাদাই ত' আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিল বিয়ে করবে বলে।

তারপর?···

তারপর আবার কি? যা'হয়—তাই। দিন কয়েক মধু লুটে নিয়ে শেষটায় ঐ সোমনাথ ডাক্তারের দোর গোড়ায় এনে হাজির। ডাক্তার মোটা দক্ষিণা নিয়ে খালাস করল বটে কিন্তু বাবু তদ্দিনে হাওয়া।

আপনি 'কেস' করলেন না?

তুই থাম ছুঁড়ী, 'কেস' করে আবার বিয়ে হয়! নিজের মুখে চুণ কালী পড়েছে যথেষ্ট। মুখ বুজে সহ্য করে গেলেই হ'ল। মিছে লোক হাসিয়ে লাভ কি? তা'ছাড়া ওদের সঙ্গে লড়বার মত সঙ্গতি কোথায়? জানিসনে আইন আদালত সব ওদের দিকে।···

তাই বলে এমনিই ছেড়ে দিলেন?

না, বেহায়াটা নিজে থেকেই খোর-পোষ দেবে বলে স্বীকার করেছিল।

এখন দেয় না?

না, আমিই ফিরিয়ে দিয়েছি। কি হবে ঐ পিশাচটার অর্থ নিয়ে, নিজের পেটেরটাকেই যখন নষ্ট করে ফেলতে হ'ল?—কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠে শান্তির

জয়া আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে থাকে। উমাদেবীর প্রতি সকল শ্রদ্ধা মুহূর্তে উবে যায়।

শান্তি প্রসঙ্গান্তরে জিজ্ঞেস করে, তোর ছেলে কোথায়রে?

জয়া শান্তভাবেই জবাব দেয়, ও আমার ছেলে নয় দিদি, ছোট ভাই।

বলিস কিরে! তবে যে ফুলদি বল্‌ল তোর ছেলে! কে এক হতভাগা ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে!

জয়া সহসা আর কোন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। মানুষ যে এতটা নীচ হতে পারে তা' ভাবতেও পারেনা।

শান্তি কতকটা বুঝেই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, বুঝেছি ভাই, দুঃখ করিসনে। নারীই নারীর সর্বনাশ ডেকে আনে।

ধরা গলায় নিজের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে থাকে জয়া।

ব্যথায় মর্মাহত হয় কলঙ্কিনী নারী। নিজের আঁচল দিয়ে জয়ার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে পুনর্বার সহানুভূতি জানায়, তোর ব্যথা আমি বুঝি বোন। কিন্তু কি করব···

মুখের কথা শেষ না হতেই জয়া ফেটে পড়ে, তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম দিদি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

না, বোন, ভুল তুই বিন্দুমাত্রও করিসনি। আমাদের মত মেয়েকে বিশ্বাস করা কারও পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি সেটা বড়ই কাঁচা। যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারি। তাই এখানে নূতন কারও পদার্পণ দেখলে দুঃখ হয়। জানি, হয়ত' কা'রও কোন উপকারেই আসব না। তবু যদি বুঝি অনিচ্ছা সত্বে পা পড়েছে, তাহলে কঠিন আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিতেই চেষ্টা করি।

জয়া আবেগভরে পুনশ্চ বাধা দেয়, বুঝেছি, আর তুমি আমাকে অপরাধী ক'র না দিদি। সেদিন তুমি আমাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত না করলে হয়ত সর্বনাশ হয়ে যেত। আমাকে তুমি ক্ষমা কর···

ক্ষমা নয় বোন, আমি তোকে আশীর্বাদ করছি। যে আগুনে নিজে পুড়ে মরছি, তোর গায়ে যেন সে শিখা না লাগে।

তাই কর দিদি—তাই কর। আমি এক্ষুণি—এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর।...

কোথায় যাবি শুনি?...গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করে শান্তি।

তা জানিনে, তবু এখানে আর নয়। এখানকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে...

পাগলামো করিসনে। পালিয়ে কোথাও বাচতে পারবিনে। যম পেছন তাড়া করবেই। বরং নারীর সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়া। শিক্ষিতা নারী তুই, অত সহজে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? বুদ্ধি দিয়ে—নিষ্ঠা দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দে, তোর আমার জীবন, খেলার বস্তু নয়। পণ্য দ্রব্যের মত এ কিনতে পাওয়া যায় না।

জয়া কেমন যেন বিস্ময় বোধ করে। কে এ রক্ত কমল পাঁকে গড়াগড়ি যাচ্ছে!...সুপ্ত শক্তি বুঝি জেগে ওঠে সহসা। সত্যি ভয় কিসের? রাস্তার শেয়াল কুকুরের ভয়ে পথ চলবে না? নিজে নিজেই আঁচল দিয়ে চোখ মুছে শান্তির হাত চেপে ধরে, সত্যি দিদি, তুমি আজ আমাকে বাঁচালে। আমি আর বিপদকে ভয় করিনে। যত ভয়াবহ রূপ নিয়েই আসুক, মাথা উচু করেই প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করব। বার বার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েও দুর্বল হয়ে পড়ি...

চুপ কর, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনছিস? ফুলদি বোধ হয় আসছে।

জয়া ঝটিতে পট পরিবর্তন করে। যথারীতি হাল্কা হয়েই কি যেন বলতে যায়। উমাদেবী ততক্ষণে ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করেন, তোদের এতক্ষণ কি হচ্ছিলরে শান্তি? মামণিকে যেন আজ খুব খুশি বলে মনে হচ্ছে?

শান্তি অধিকতর হাল্কা হ'য়েই উত্তর করে, না ফুলদি, তোমার মেয়ে

দেখছি কাজ কাজ করে হাঁপিয়ে উঠেছে। বলেছি, আজ তোমাকে জোর করে চেপে ধরব, তাই এত খুশি।

তা' হবে না? বসে থাকবার মেয়ে কি ওরা? কিন্তু মামণি, কাজ অপেক্ষা ডিগ্রীটা তোমার আগে নেওয়া যে দরকার। ওটা থাকলে কিছুই আটকাবে না।

বিতৃষ্ণায় জয়ার অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠে। তবু অন্তর্দ্বন্দ্বকে অন্তরস্থ রেখেই উত্তর দেয়, না মাসীমা, টাকা আমার না হলেই নয়। খোকনকে মানুষ করতে হবে। সমূহ কাজ পেলে, পরীক্ষাটা অবসর মত প্রাইভেটও দিতে পারব।

সহাস্যে প্রত্যুত্তর করেন উমাদেবী, শোন মেয়ের কথা! আমি যেন এক্ষুনি ওদের তাড়িয়ে দিচ্ছি!

জয়ার কোন মিষ্টি কথাই ভাল লাগে না। তবু পূর্ববৎ বিনয় সহকারেই অনুরোধ জানায়, না—না—তাড়িয়ে আপনি দেবেন কেন? তবু...

অসমাপ্ত কথাটাকে সমাপ্ত করে শান্তি, তা বেশতো, ও যখন কাজ কাজ বলে এতটা উতলাই হয়েছে, তখন তুমি ওকে একটা কাজেই লাগিয়ে দাও না?

তোরও তাই মত? বেশ, কাল ত' কিষেনলালজী আসছেন, দেখি ওঁকে বলে একটা কিছু করা যায় কি না?

শান্তি মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। জয়ার মনভারও যেন কতকটা হাল্কা হয়ে যায়। মন্দ কি যদি একটা কাজ পায়? কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না। ইচ্ছে করলে আলাদা বাসা করেও থাকতে পারবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। উমাদেবী উভয়কে হাত মুখ ধুতে তাড়া দিয়ে নিজে কলঘরের দিকে উঠে দাঁড়ান। শান্তির হয়ত' আরও কিছু বলার ছিল জয়াকে, কিন্তু সুযোগ পায় না। বাধ্য হয়ে দোতলায় চলে যেতে হয়। জয়া যথারীতি নিজের কাজে উঠে যায়।

পনেরো

পরের দিন রবিবার। শেঠ কিষেনলালের আসার কথা বিকেল পাঁচটায়। উমাদেবী ঘড়িতে চারটা না বাজতেই জয়াকে তৈরী হয়ে নিতে তাড়া দেন। নিজের আলমারী খুলে আধুনিক রুচির ধোপ দোরস্ত এক সেট শাড়ী ব্লাউজ বার করে দেন। জয়া ভেবে পায়না দর্শনপ্রার্থী একজন উদ্বাস্তু মেয়ের পক্ষে এগুলোর কি প্রয়োজন। তবু প্রতিবাদ করার অবকাশ নেই। ক'টা দিন মন যুগিয়ে চলতেই হবে। তারপর যদি দিন পায়,...না না উমা দেবীকে কোন ক্রমেই চটান উচিত নয়। যদি তাঁর চেষ্টায় একটা কাজ হয়ে যায়?...তাছাড়া শান্তিকেই যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে হবে তারইবা মানে কি? কে জানে, কার মনে কি লুকান আছে? একটার পর একটা যখন বিপত্তি ঘটতে শুরু করেছে, তখন শেষ না দেখে কোন সিদ্ধান্তে পৌছান ভাল হবে না। কে জানে, হয়ত' অবিচারই হয়ে যাবে। একজন ভদ্র মহিলা, যিনি স্নেহ বশত অসময়ে স্থান দিয়েছেন, যাঁর সঠিক কোন দোষই নজরে পড়ছে না, সহসা কারও কাণ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারান সমীচীন নয়। জয়া সম্পূর্ণ না হলেও কতকটা সহজভাবেই তৈরী হয়ে নেয়। মনটাও খানিক খুশিতে ভরে উঠেছে। শেঠজীর মহানুভবতার কথা ক'দিন থেকেই শুনে আসছে। যদি দয়া হয়, যদি তাঁর আপিসে একটা কাজ পায়...স্থির থাকতে পারে না জয়া। ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ছোট্ট খোকন বড় হবে, আর লেখা পড়া শিখবে, আবার দিন ফিরে পাবে ওরা...চুমুতে চুমুতে ভরে দেয় কচি সোনা মুখ।

উমাদেবী পেছন থেকে এসে বাধা দেন, ওকে আর এখন জাগিয়ে কাজ নেই মা। শেঠজীর আসার সময় হল, ওঘরে গিয়ে বসো।

ভাইকে তক্তপোশের ওপর শুইয়ে দিয়ে, খুশিতে উঠে যায় জয়া ড্রয়িং-রুমের দিকে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক আবির রাগ এসে পড়েছে সোফাটার গায়ে। বসে বেশ আরাম বোধ করে। কি অপূর্ব মানিয়েছে আজ ওকে পিঁয়াজী রংয়ের জর্জেট শাড়ীটায়। সাপের মত লতিয়ে পড়েছে বেণীটা পিঠের ওপর দিয়ে। উমাদেবী চোখ ফেরাতে পারেন না। শেঠজীর নিশ্চয় মনে ধরবে।

জয়ার রাহুগ্রস্ত জীবনে প্রথম অরুণোদয়। ঘর ছাড়ার পর এরূপ সৌখীন পোষাক চোখেও দেখেনি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন আজ।

একটু পরেই সদরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। উল্লাসে লাফিয়ে ওঠেন উমাদেবী। সুপরিচিত ধ্বনি। তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যান। জয়ার বুক কাঁপতে থাকে আশংকায়। কে জানে, ফল কি হবে।

উমাদেবী কিষেনলালকে সঙ্গে করে যথারীতি ফিরে আসেন। অন্যদিন হ'লে হয়ত' কিছুটা হাঁপাতেন। কিন্তু আজ যেন কোনরূপ শ্রান্তি নেই। বড় সোফাটায় আরাম করে বসেছিল জয়া। উঠতে গিয়ে বাধা পায়, থাক থাক, শেঠজীকে আর লজ্জা করতে হবে না, তুমি বস মা। বলতে বলতে নিজে একক সোফাটাতে গা ছড়িয়ে বসে পড়েন। শেঠজী নির্বিচারে জয়ার পাশেই স্থান নেন। বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। গায়ে গা লেগে যায় প্রায়। তীব্র অস্বস্তি হতে থাকে জয়ার। তবু মুখ বুজে ধৈর্য অবলম্বন করে।

উমাদেবী পরক্ষণেই উভয়কে পরিচিত করিয়ে দিতে উদ্যত হন, শেঠজী, এই হ'ল আমার মেয়ে, যার কথা আপনাকে বলে আসছি। আর মামণি, তোমাকে বোধ হয় বুঝিয়ে বলার দরকার হবে না, ইনিই শেঠ কিষেন-লালজী।

জয়া দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার জানায়। যতটা খুশি হওয়া উচিত ছিল ঠিক যেন ততটা খুশি হতে পারে না।

কিষেনলাল মোটা কাচের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে ওপর

চোখে খানিক চেয়ে থাকে জয়ার দিকে। মদালস নির্লজ্জ দৃষ্টি। ভাল লাগে না জয়ার। স্থূলকায় লদলদে দেহ। কাঁচা-পাকা চুল। মোটা গোঁফ ঝুলে পড়া নিম্ন ওষ্ঠের ওপর উপচে পড়েছে। ড্যাবা ড্যাবা চোখের চারদিক জুড়ে কলঙ্ক কালিমা। সামনের দাঁত দু'টো সোনা দিয়ে বাঁধান। কথা বললে প্রায়শঃ থুথু ঠিকরে পড়ে। পরণে দামী ইউ, পি কোট, কাশ্মিরী টুপী ও ফিন্‌ফিনে ধুতি। সমস্ত অঙ্গ জুড়ে ভুরভুর করছে গোলাপী আতর গন্ধ। জয়ার নিরন্তর মনে হতে থাকে উঠে যায়। উমাদেবী হয়ত' কিছুটা অনুমান করেই তাড়াতাড়ি কথা পাবেন, শেঠজী, ওর একটা ব্যবস্থা কিন্তু করতেই হবে আপনাকে।

দীর্ঘকাল বাংলাদেশে আছে কিষেনলাল। ব্যবসার খাতিরে দিন কয়েক শিক্ষক রেখে এ দেশের ভাষা শিক্ষাও করেছে। পরিষ্কার করেই প্রায় কথাবার্তা বলতে পারে। তবে অসাবধানতা বশত মাঝে মাঝে নিজের মাতৃ ভাষার প্রয়োগ ঘটে যায়। খুশিতে কিঞ্চিৎ হেসেই উমাদেবীর কথার জবাব দেয়, আপনি অমন করে লজ্জা দেবেন না। আমি জরুর চেষ্টা করবে। কবে আপনার কথা না রেখেছি বলুন ?

উমাদেবী পুনরায় আব্দার করেন, না না, ওসব রাখারাখি নয়। দু'একদিনের মধ্যেই ওকে আপনার অফিসে জায়গা করে দিতে হবে। হাসির মাত্রা চড়িয়ে প্রত্যুত্তর করে কিষেনলাল, বহুৎ আচ্ছা, সে-ই হোবে। লেকিন জয়া বিবি, আপনি লেখাপড়া ছেড়ে ক্যান্‌ চাকরী করতে চাচ্ছেন ? উমাদেবী তো আপনাকে বহুৎ খাতির করে !

জয়ার অন্তর মন সহসা চমকে ওঠে। বিবি, একি অসভ্য সম্ভাষণ! তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে উদ্যত হয়। না-না, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। শান্তি ঠিকই বলেছিল। নিশ্চয় উমাদেবীর কোন মতলব আছে। ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। আবার পরমুহূর্তেই কি যেন মনে করে শান্ত হয়। ভেবে নেয়, ভদ্রলোক হয়ত-নূতন বাংলা শিখছেন।

কাকে কি সম্বোধন করতে হয় জানেন না। তাই ভদ্রতা রক্ষা করেই জবাব দেয়, না না, লেখাপড়া ছাড়ছিনে। তবে সমূহ আমাব একটা চাকুরি প্রয়োজন।

উমাদেবী বেশ কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। কিষেনলালকে নিয়ে হয ত' শেষ রক্ষা করা দায় হবে। কিন্তু জয়ার আচরণে পুনরায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়েই মাত্রা বাড়িয়ে চলেন, জানেন শেঠজী, মেয়ের আমার কাজ কাজ করে চোখে ঘুম নেই। ও কিছুতেই আমাকে আপন ভাবতে পাবছে না।

জয়া মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয়, বা রে, তা' কেন হবে? তবে···

কথা শেষ না হতেই কিষেনলাল সমর্থন জানায়, সে ত' ভাল কথা। হামি লোকভি কাজ বহুৎ পছন্দ কবি। দু'চাব দিনের মধ্যেই আপনাকে এক জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছি।

উত্তরে মনে মনে খুশি হয় জয়া। উমাদেবী উভয়কে কিছুক্ষণের জন্য সময় দিয়ে কক্ষান্তরে প্রবেশ করেন। কিষেনলাল জয়ার আরও একটু গা ঘেঁসে এসে সোহাগ জানায়, আপনার এমন খুবসুরত চেহারা, আপনি কি আপিসের মেহানত সহ্য করতে পারবেন?

জয়া রীতিমত লজ্জা পায়। তবু নিজের দেহটাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে জবাব দেয়, কাজ পেলে আমাব সব সহ্য হবে।

লেকিন আমার আপনাকে দেখে বহুৎ কষ্ট হচ্ছে। আমি বলছি···

আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। শুধু দয়া করে একটা কাজ দিন আমাকে।

না-না, দয়া কেঁন হোবে। আপনি ভাল লিখা পড়ী জানেন, আপনাকে ত' আমার দবকারই আছে···বলতে বলতে আরও একটু সরে এসে গায়ে গা লাগাতে[illegible] করে বিরাট বলিষ্ঠ দেহ। জয়ার তীব্র অস্বস্তি হতে

থাকে। উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় উমাদেবী আতুরীর মাকে সঙ্গে করে চায়ের সরঞ্জাম সহ পুনঃ প্রবেশ করেন। কিষেনলালের প্রতি কটাক্ষান্তে পেয়ালায় চা ঢালতে রত হন। ইঙ্গিত বুঝে ধীরে ধীরে ফিরে আসে কিষেনলাল নিজের জায়গায়। লজ্জায় চোখ মুখ রক্তিম হয়ে ওঠেছে জয়ার। ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারে না।

যথারীতি চা পানান্তে উমাদেবী পুনশ্চ কথা পাড়েন, তা'হলে শেঠজী, আপনী ভুলে যাবেন না নিশ্চয়? মামণিকে দু'চার দিনের মধ্যেই জায়গা করে দিচ্ছেন? চলুন, এবার নীচের কাজটা সেরে নেওয়া যাক।···বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান আসন ছেড়ে। কিষেনলালের হয়ত এত শীগ্‌গির উঠতে মন নেই। তবু উমাদেবীকে উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায়।

জয়া গম্ভীরভাবে পুনশ্চ নমস্কার জানিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে। কেন যেন নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বলে বোধ হতে থাকে। পুনঃ পুনঃ পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলে কিষেনলাল। একাকী নিরালায় কাছে পেয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠেই আক্রমণ করেন উমাদেবী, আপনি ও রকম অভদ্র ব্যবহার করছিলেন কেন বলুন ত'? জানেন না, ও শিক্ষিতা মেয়ে, মর্যাদাবোধ আছে?

আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল বিবিসাহেবা। আমাকে মাপ করুন।

আপনার দেখছি অতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই, ছিঃ!

ঈষৎ হেসে হেসেই জবাব দেয় কিষেনলাল, কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কি আর এখানে আসি?

উমাদেবী চোখ বিস্ফারিত করে বাধা দেন, তার মানে?

হায়—আউর এক দফে মাফি মাঙতা বিবিসাহেবা। মেহেরবানী··· আপনি আমায় হাসালেন শেঠজী।

হাসুন, বহুৎ খুশিছে হাসুন। লেকিন, দিল নেহি [illegible]তা।

উমাদেবী পূর্ববৎ হেসে হেসেই প্রত্যুত্তর করেন, একটু ধৈর্য ধরুন শেঠজী, একটু···

সে আপনার দয়া !···

দয়া আমার নয়, আপনার। হ্যাঁ, আমাদের গত মাসের 'ডোনেসনটা' কিন্তু এখনও পাঠিয়ে দেন নি।

বহুৎ আচ্ছা বাদ। আমি ত' তৈরী হয়েই এসেছি। লিজিয়ে, একশ' রূপেয়া।

উমাদেবী হাত বাড়িয়ে একশ' টাকার নোটখানি ব্যাগে পুড়ে খুশিতে ধন্যবাদ জানান।

শেঠজী সদরের কাছাকাছি এসে অধিকতর গদ গদ কণ্ঠে পুনশ্চ অনুরোধ জানায়, চলুন না, একটু হাওয়া খেয়ে আসবেন ?

হাল্কা হাসি হেসেই উত্তর করেন উমাদেবী, আমার সঙ্গে হাওয়া খেয়ে দিল খুশি হবে না। আপনি আজ আসুন।

খুশিতে রাম রাম জানিয়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে কিষেনলাল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায় গাড়ী সার্কুলার রোড ধরে।

ষোল

রানাঘাট ক্যাম্প থেকে প্রত্যাবর্তন কবে সতীনাথকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জয়পুব যেতে হয়েছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। সঠিক সংবাদ পবিবেশনে তাব জুড়ি নেই। সতীনাথেব মধ্যেও ইতিপূর্বে কোনরূপ উৎসাহেব অভাব পবিলক্ষিত হয়নি। সাংবাদিকতা কবে সামান্য যে কয়টি টাকা পায ত' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সুতবাং কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই একাজ সে গ্রহণ কবেনি। তার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন দেশেব জ্ঞানী গুণীব সঙ্গে সম্যক পরিচয লাভ ও দেশ বিদেশে ঘুবে বেড়ান। জযপুবেব ধবল পাহাড় ও মরুভূমির বিরাট শূন্যতা সে হিসেবে অপবিহার্য। কিন্তু সতীনাথকে এ যাত্রা যেন তেমন উৎসাহী দেখা যায় না। তাব পরিবর্তে সে অমিয়নাথকে পাঠাতেই প্রস্তাব কবেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছুতেই রাজী হননি। স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছুটি নিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে না।··

জয়ার কাছে একবার অপ্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার দুর্বলতা দেখান সম্ভবপর নয়। তাছাড়া সত্যিই ত', জয়া তার কে? কেনই বা সে তার কথা ভাববে? নিতান্ত অসহায় ভেবেই সাধ্যমত চেষ্টা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা' যখন সে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করেছে, তখন তার অত কি [illegible] পড়েছে—অকারণ মাথা ঘামাবার? দয়া দাক্ষিণ্য পাবার লোক রাস্তা ঘাটে অভাব নেই।···সতীনাথ বোঝাটা ঘাড় থেকে বার বার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেও কেন যেন পেবে উঠছে না। অকারণেই কেন যেন থেকে থেকে জয়ার কথা মনে হয়। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথাই হয়ত' এই যে আকস্মিকভাবে হৃদয় গহনে আঘাত করে, তাকে সহজে অন্তর থেকে মুছে ফেলা যায় না। বারবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করেও ভুলতে

পাবে না সতীনাথ জযাকে। জয়পুর থেকে ঘুরে এসেও সাধ্যমত খোঁজ করেছে। যেখানে যত প্রকার সাহায্য কেন্দ্র খোলা আছে কোথাও বাকি রাখেনি। এক ফাঁকে রানাঘাটও ঘুরে এসেছে। পুনর্বাসন অফিসার বন্ধুলোক, তার কাছেও খোঁজ নিয়ে দেখেছে এনামে কেউ কোন সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছে কিনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোথাও কোন সন্ধান মিলে নি। বনে মিলিয়ে গেছে মনের পাখী। থেকে থেকে গুমড়ে মরে ভাবাক্রান্ত হৃদয়। যাকে নিরন্তর ভুলে যেতে চেষ্টা করে আসছে সে কেমন করে জুড়ে বসেছে সমগ্র হৃদযাসন? ভালবাসে কি সতীনাথ জযাকে? না না, জযাকে না হলেও তার কাজকে নিশ্চয। সে যে কথা দিয়েছিল, আজীবন তার আদর্শের জন্য সংগ্রাম করবে। সাম্প্রদাযিকতার বিরুদ্ধে ধরবে বলিষ্ঠ লেখনী। সে কথা আজও ভুলে যাযনি। অগ্নিস্রাবী ভাষায় লিখে চলেছে দিনের পর দিন। স্বাক্ষরিত রচনায ভরে দিয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। কে জানে, হয়ত' জয়ার দৃষ্টি গোচরও হয়ে থাকবে। যদি জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা না ও হয়, ক্ষতি নেই, সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। কথা দিয়ে কথা রক্ষা করেছে। আজীবন রক্ষা করবে। উৎসাহে ভরে ওঠে দেহ মন। নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সতীনাথ।

সতরো

বিজয়া সেই যে পুলিশ হেপাজতে আছে এ পর্যন্ত ছাড়া পায়নি। ইয়াকুবের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারের সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে আপিল গ্রাহ্য হয়নি। অপর আসামী ওসমান ফেরার আছে। গ্রেফতারি পরোয়ানাকে ফাঁকি দিয়ে হয়ত' সে নির্বিঘ্নে পাকিস্থানে বিচরণ করছে, অথবা এখানে থেকেই ধূলো দিচ্ছে পুলিশের চোখে।

সরকার-পরিচালিত একটি ক্যাম্পে স্থানান্তরিত হয়েছে বিজয়া। সর্বহারা উদ্বাস্তু স্ত্রীলোকদিগের জন্য এখানকার ব্যবস্থা। সংসারে যাদের কোনরূপ অবলম্বন নেই, কেবলমাত্র সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকেই এখানে রেখে নানাবিধ শিল্প-কলা শিক্ষায় স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেলাইয়ের কাজ, খেলনা গড়ার কাজ, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ থেকে আরম্ভ করে যোগ্যতানুসারে কিছু কিছু আপিস আদালতের কাজ শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা শেষে অর্থ উপার্জনের কোথায় কতটুকু সুযোগ থাকবে সেবিষয়ে নিশ্চয়তা না থাকলেও শিক্ষার্থীগণ সকলেই কোন না কোন কাজে আত্মনিয়োগ করে নিশ্চিন্ত। কিশোরী যুবতী হতে আরম্ভ করে প্রৌঢ়া বৃদ্ধারও অব্যাহতি নেই। রুগ্না পঙ্গুদিগের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকলেও তা' অব্যবস্থারই নামান্তর। জগন্নাথের হাটে বারোয়ারী খানা খাও আর তাঁবুতে শয়ন কর। মন বলে যেন কোন পদার্থই নেই হতভাগ্যদের। সুতরাং ওদের উন্নতি অবনতিতেও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই কাহারও। নিরাশ্রয় জীবনে আশ্রয় পেয়েছে ঢের ভাগ্য। কীট পতঙ্গের মত শুধু দুটো খেয়ে থেকে দুর্গা নাম জপ কর। অন্য প্রশ্নে কাজ কি?…

সংসার-জীবনে গাড়ি জমিয়ে যারা ভাটার পথে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা যাদের হয়ে এসেছে মন্থর, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও হাজার হাজার ঐ যে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জীবন, সরল শিশু বালক বালিকা, যারা বাপ-মার কোলে শুয়ে একদিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল, রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল—তারাও কি হাটের গোলমালে হারিয়ে যেতেই বসেছে না? দুমুটো অন্ন, আর দুখানা জামা কাপড়েই কি দূর হবে তাদের জীবন সমস্যা? পেশাদারী ভিখারীর সঙ্গে ওদের তফাৎ কোথায়? সরকারের সদাশয়তায় হয়ত' কেনেস্তারার ডিবে হাতে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে না ওরা। কিন্তু সেইটাই কি জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা? উপযুক্ত বারি সিঞ্চনের অভাবে একদিন কি ওদেরই দেখতে পাব না আবর্জনার স্তূপে? সেখানকার সে পূতিগন্ধ যদি হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ে এসে আমাদের সুখের নীড়কেও দূষিত সংক্রামিত করে তোলে, তবে কি সেটা হবে নিতান্তই বিধিলিপি?…

বিজয়ার সামান্য বালিকা বয়স। অতীতে লেখাপড়া কিংবা খেলাধূলো ব্যতীত অন্য কোন আবিলতার কথা ভাববার অবকাশ পায়নি। আজ ভাগ্য বিপর্যয়ে কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! প্রৌঢ়া, সধবা, বিধবা যাদের সাংসারিক জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে রন্ধনশালায় কিংবা অনুরূপ কোন হাতের কাজে—তাদের পক্ষে এ-ব্যবস্থা নিতান্ত বেমানান্ না হলেও, ওর মত যারা নবীন পথিক—যাদের জীবন নাট্যের কোন রহস্যই পাখা মেলে বিস্তার লাভ করবার অবকাশ পায়নি—তাদের পক্ষে এ-ব্যবস্থা গ্রহণ যোগ্য কি? অন্তর থেকে তেমন ভাবে সাড়া না পেলেও সেলাইয়ের কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে বিজয়া। ছাত্রী-জীবনের সঙ্গে যদি কিছুমাত্র মিল থেকে থাকে তবে তা এইটিই। প্রবেশিকার দ্বার পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গেই চর্চা করতে হয়েছিল।

সুতরাং কারও নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করা অপেক্ষা নিজের অর্জিত বিদ্যার অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তাই এক্ষেত্রে অধিক। চেষ্টা করলে হয়ত' এখানকার শিক্ষয়িত্রীর পদেও বহাল হতে পারে। কিন্তু মন যে কিছুতেই বশে আসে না। জীবনের স্বপ্ন যে ছিল আরও মধুর। কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী লাভের পরেও গবেষণাগারে নিবদ্ধ থাকা, আর কোথায় সামান্য দর্জিগিরি। পিতার প্রদীপ্ত মুখ ভেসে ওঠে নয়ন সম্মুখে। দুটি গণ্ড ভেসে যায় শ্রাবণের ধারায়। ভাল করে খেতে ঘুমাতে পর্যন্ত পারে না। পাগল হয়ে যাবে কি ও? ক্যাম্পে সমবয়সী আরও অনেক মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের কথা স্বতন্ত্র। তারা যেন নির্বিঘ্নে মেনে নিয়েছে এ জীবন। দিব্যি খায় দায়—হাসি খুশি। দু'দশজন প্রতি সন্ধ্যায় দল বেঁধে বেড়াতেও বার হয়। থিয়েটার বায়স্কোপের পয়সাও নাকি জোটে তাদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে।... বিজয়া ভাবতে পারে না। নিরাশ্রয় জীবনে যাদের আশ্রয় দেবার কেউ নেই—তাদের এ সস্তা আমোদ প্রমোদের পয়সা আসে কোত্থেকে! ক্যাম্পকর্ত্রী অনেকদিন ওকেও উৎসাহ দেন ওদের সহযাত্রী হতে। অনেক সময় ভর্ৎসনাও করেন, কেন কোথাও একটু ঘুরে বেড়িয়ে মনটাকে হাল্কা করে আসে না। মেয়েদের মধ্যেও টানাটনি করে থাকে অনেকে। কিন্তু বিজয়া এসে অবধি একটি দিনের জন্যও ক্যাম্পের বাইরে যায়নি। বড় ভয় করে ওর। যে কথা একদিন বুঝে ওঠা শক্ত ছিল, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তা' যেন কিছু কিছু বুঝতে পারে এখন। শত কষ্টের হলেও মুখ বুজেই দিন গুণে চলে।

দু'মাস পার হয়ে যায়। একঘেয়ে জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়। অনেক সাধাসাধির পর হাসি দীপ্তির সঙ্গে একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বার হতে রাজী হয় বিজয়া। ওর মতই লেখাপড়া জানা মেয়ে হাসি, দীপ্তি। চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশেরই হবে।

সৌন্দর্য অপেক্ষা স্বাস্থ্যের জৌলুস উভয়েরই আকর্ষণীয়। থাকেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দামী না হলেও কখনও কোন ছেঁড়া শাড়ী-ব্লাউজ ব্যবহার করে না। ক্যাম্পকর্ত্রীও যেন বিশেষ ভাবে প্রসন্না ওদের প্রতি। এখানকার জীবনের কোন নিয়মানুবর্তিতাই কঠোরভাবে পালন করতে হয় না ওদের।

অন্যপর কোন মেয়ের তাল থেকে তিল খসলে বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। কিন্তু হাসি দীপ্তির গুরুতর অপরাধেও বেকসুর খালাস। কে জানে, কি ব্যাপার? বিজয়া আন্দাজ করে উঠতে পারে না। অনেকটা গায়ে পড়েই ভাব জমিয়ে নিয়েছে দু'জন ওর সঙ্গে। নিঃসঙ্গ জীবন কাটেই বা কেমন করে? ইদানীং নিজেও কিছুটা হাল্কা হয়েই মিশতে শুরু করেছে সকলের সঙ্গে।

সন্ধ্যা সাতটা। ধর্মতলা ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে এসে পৌঁছে তিনজন। ভাল লাগে না বিজয়ার। শনিবার,—চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। ও চেয়েছিল নিরালায় কোথাও একটু বসে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেয়। কিন্তু একি মিছেমিছি হাটের মধ্য দিয়ে পথ চলা! হাসিটা যেন কিছুতেই কথা শুনছে না। চলেছে ত' চলেছেই। লোকগুলোও কি বেহায়া! পারে ত' গিলে খায় যেন! গলা উঁচিয়ে কি দেখছে হাবাতের দল? জীবনে কি কখনও মা বোনদের দেখেনি পাজীগুলো, ছিঃ?···ঘেন্নায় গা গুলাতে থাকে বিজয়ার। মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ক্যাম্পে ফিরে যেতে। হাসির উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানায়, হাসিদি, ফিরে চলুন, আমার ভাল লাগছে না।

উল্লাস জানিয়ে উত্তর করে হাসি, সেকি রে, এখুনি ফিরব কি? চল মাঠে গিয়ে একটু বসি?

মাঠের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয় বিজয়া। কোলকাতায় ইতিপূর্বেও দু'বার এসেছিল। বাবার সঙ্গে খানিক ইডেন গার্ডেন আর আউটরাম ঘাট

ঘুরে শেষটায় এসে মাঠের মাঝখানে বসেছিল। বসন্তের সে স্নিগ্ধ বাতাস আজও যেন দোলা দিয়ে যায় প্রাণে। বাবা এক এক করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোনটা ফোর্ট উইলিয়ম, অক্টরলোনী মনুমেন্ট, আউটরামের স্ট্যাচু, কার্জন পার্ক।...রেঙ্গুনের জাহাজ ছাড়ে কোন জেটি থেকে... ইত্যাদি সে এক আজব কাহিনী। সেদিন এসেছিল স্নেহময় পিতার সঙ্গে সখ করে বেড়াতে। আর আজ? আজ জীবনের দুর্বিষহ জ্বালা থেকে কিঞ্চিৎ হাঁপ ছাড়তে। শত দুঃখের হলেও গড়ের মাঠের শ্যামল শোভা হাত ছানিতে ডাকে যেন। কতদিন হয় সবুজ মাঠ-ঘাট দেখেনি। উৎসাহে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে চলে বিজয়া। সহজভাবেই হাসির কথার জবাব দেয়, তবে তাড়াতাড়ি সেখানেই চলুন। এত হট্টগোল আমার ভাল লাগছে না। হাসি, দীপ্তির মুখের দিকে তির্যগদৃষ্টিতে চেয়ে কিঞ্চিৎ হাসতে থাকে। বিজয়ার ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনেই ছুটে চলেছে। এসপ্ল্যানেডের পথে কিছুটা অগ্রসর হয়ে—পুনবায় থমকে দাঁড়ায় হাসি দীপ্তি। বিজয়াও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাঁদিক কেটে বেরিয়ে গেছে সরু একটা বন্ধ গলি। গ্যাসের আলো মিটমিট করে জ্বলছে পাশের দেয়ালটার গায়ে। স্যাঁতসেঁতে, লোকজনের বিশেষ কোন যাতায়াত নেই। হাসি দীপ্তি ঢুকতে উদ্যত হয় ওর মধ্যে। বিজয়া অস্বস্তিভরে প্রশ্ন করে, ওর মধ্যে আবার কি কাজ, বড় রাস্তা দিয়েই চলুন না?

হাল্কা হাসি হেসে উত্তর করে হাসি, তোর ভয় করছে নাকি? ঐ বাড়ীটায় বিজু মাসীমা থাকেন, চল একটু দেখা করে যাই।

বিজয়াকে দ্বিতীয়বার কোনরূপ কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই উভয়ে ঢুকে পড়ে গলিটার মধ্যে। নিরুপায় হয়ে বিজয়াও বাধ্য হয় ওদের সহযাত্রী হতে। গাটা যেন কেমন ছম ছম করতে থাকে। কোলকাতায় এরকম সরু গলি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেনি। নিজের মনেই প্রশ্ন করে,

খুব জায়গায় এসে বাসা নিয়েছেন মাসী। এখন ভালয় ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচা যায়।

বেশীদূর অগ্রসর হতে হয় না। বড় রাস্তা থেকে দু'টো বাড়ীর পরেই একটা ত্রিতল বাড়ীর ফটক। চত্বর থেকে সোজা উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি। ফটকের এক পাশে একটা খাটিয়ার ওপর বসে দু'জন হিন্দুস্থানী দরোয়ান খৈনী টিপছিল। একজনের হাতে মোটা একটা কাঠের ডাণ্ডা। নিম্ন পর্যায়ের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে অনেক উঁচুতে। দৃষ্টিতে আবছা মনে হয়। হাসি দীপ্তি বিজয়াকে সঙ্গে করে এদিক ওদিক চেয়ে ঝা করে ঢুকে পড়ে বাড়ীটার মধ্যে। দরোয়ানদ্বয় তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে সকলকে। বিজয়ার চক্ষু স্থির। ও ভাবতে পারে না, এ আবার কেমন মাসী! যার দরজায় দু'জন রক্ষী, তার বোনঝি কেমন করে সরকারী ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়!···সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে তিনজন ঠক ঠক পা ফেলে। দরোয়ানদ্বয় মুখ টিপে হাসতে থাকে পরস্পর। নবীনার কাছ থেকে মোটা বকশিশ আদায় হবে আজ।

দোতলার দুপাশ জুড়ে সারবন্দী হলঘর। অধিকাংশই তালাবন্ধ। কোন কোনটার গায়ে পিতল ফলকে লেখা নানা আপিস কারখানার নাম। লোকজনের বড় একটা সাড়াশব্দ নেই। হাসি যে ঘরটার সম্মুখে এসে হাঁপছেড়ে দাঁড়ায়, তার দরজার মাথায় বড় বড় হরফে লেখা—'হেলথ্ লজ্—সাইন্‌টিফিক ম্যাসাজ এণ্ড বাথ্ চেম্বার'। দীপ্তি তিলমাত্র অপেক্ষা না করে স্ক্রীন ঠেলে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। হাসি বিজয়াকে সঙ্গে করে।

মস্ত বড় হলঘর কাঠের প্রাচীর দিয়ে টুকরো টুকরো ভাগ করা। হয়ত' দশ-বারটি কামরা হবে। প্রতিটির দরজায় দরজায় ঝুলছে সুদৃশ্য রঙিন পর্দা। স্তিমিত নীল আলোরশ্মি বৈদ্যুতিক পাখার

আবর্তনে ছায়াবাজী খেলছে পার্শ্ববর্তী দেয়ালে। চট্‌—পটা—পট্‌—পট্‌… ডলাই মলাইয়ের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে কোন কোনটার মধ্য হইতে। নারীকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জরণেও মুখরিত কোন কোনটার বুক। সম্মুখের বড় ঘরটি বোধ হয় আপিস ঘর। সোফার ওপর বসে সিগারেট ফুকছিল তিনটি বলিষ্ঠ যুবক। দু'জনের পরনে অবাঙ্গালী পোষাক। সবল সুস্থ সুশ্রী চেহারা। অবশিষ্ট জনকে সহজেই বাঙ্গালী বলে চেনা যায়। সম্ভবত তৃতীয় ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যাক্‌ব্রাস্‌ চুল। গোঁফ বাটারফ্লাই করে ছাটা। গায়ে দামী প্যাণ্ট ও বুস্‌কোট। রিস্ট ওয়াচটা বাম মণিবন্ধে চিক্‌ চিক্‌ করে জ্বলছে হীরার আংটিটার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। ঘরের মাঝখানে টিপয়ের ওপর রক্ষিত ছাইদানীটার পাশ জুড়ে এলোমেলো ছড়ান গোটাকয়েক বিলেতী স্পোর্ট ম্যাগাজিন। স্বাস্থ্যের নামে অস্বাস্থ্যের সমাবেশ। ডিস-টেম্পার্ড করা দেয়ালের গায়ে গায়ে টাঙান কুৎসিত উলঙ্গ ছবি। মনে হয় এখান থেকেই আগন্তুকদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দীপ্তিকে লক্ষ্য করে অনুযোগ উপস্থিত করে বাঙ্গালী যুবকটি, এত দেরী হ'ল তোমাদের?

দীপ্তি চোখ টিপে কি যেন ইঙ্গিত করতেই নিরস্ত হয় সে। মুখ-চোখে ফুটে ওঠে খুশির হাসি। তাড়াতাড়ি সকলকে ভেতরে যেতে আদেশ করে—পুনরায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে সঙ্গীদের সঙ্গে। অবাঙ্গালী যুবকদ্বয় যেন পাথর হয়ে গেছে। বিজয়ার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। সহাস্যে আশ্বাস দেয় বাঙ্গালী যুবক, ঠিক হায় দোস্ত। এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।…

বিজয়া ভাবতে পারে না ও হাসবে কি কাঁদবে। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ঠিক বুঝে নেয়, এ পাপপুরী। ম্যাসাজ্‌ ক্লিনিকস্‌-এর কেলেঙ্কারীর কথা ইতিপূর্বে বহুবার খবরের কাগজে পড়েছে। হাসি

দীপ্তিকে আর কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। চক্রান্ত করেই ওরা ওকে এখানে টেনে এনেছে। কিন্তু উপায়? কি করে ছাড়া পাবে এই শয়তানের আড্ডা থেকে?···পা কাঁপতে থাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকপুকানি শতাধিক বেড়ে যায়। সহসা কোন বুদ্ধিই মাথায় আসে না। একবার ভাবে, যদি সহজ আপত্তিতেই ছেড়ে দেয় বদমাশগুলো, তাহলে আর মিছে ঝামেলা বাড়াবে না। নচেৎ প্রাণপণে চীৎকার করা বই গত্যন্তর নেই। প্রকাশ্য রাজপথ কি এত বড় অনাচার মুখ বুজে সহ্য করবে? কেউ কি ছুটে আসবে না সাহায্য করতে?···ভয় আর উত্তেজনায় ভেতরের দিকে অগ্রসর হয় বিজয়া। শয়তানগুলো তাকিয়ে আছে নির্লজ্জের মত।··

অন্তঃপুরের আর একটা ছোট কামরায় বসে সমবয়সী পাঁচ-সাতটি মেয়ে কি যেন সব জটলা করছিল। নবীনার পদার্পণে পরস্পর মুখ টিপে হাসতে থাকে। দীপ্তি দীপ্ত নয়নে কি যেন ইঙ্গিত করতেই যে যার মতে ঘর ছেড়ে উঠে যায়। পরে সোহাগ-মিশ্রিত স্বরে বিজয়াকে উদ্দেশ্য করে অনুরোধ জানায় দীপ্তি, সত্যি ভাই, বিজুমাসী আজ আসেননি। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম, ভারী মজার মানুষ।

ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল বিজয়ার। অসম্ভব গাম্ভীর্য নিয়েই উত্তর করে, আমার কারও সঙ্গে পরিচয়ে কাজ নেই। আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হাসতে হাসতেই প্রত্যুত্তর করে দীপ্তি, অত অভিমান কিসের লো? মাঠে গেলেই ত' হ'ল? বোস না আর একটু এখানে?···

না, মাঠে ঘাটে আর নয়। আমি সোজা ক্যাম্পেই ফিরে যেতে চাই।

একা একা যেতে পারবি?

খুব পারব। আপনাদের সাহায্যের দরকার হবে না।

খুব যে রাগ দেখাচ্ছিস?

ফুঁসে ওঠে বিজয়া, কেন আপনারা আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেন ?

কি প্রতারণা করেছি শুনি ?…কর্কশ গলার স্বর শ্লেষে ফেটে পড়ে দীপ্তির।

প্রতারণা নয় ? বেড়াবার নাম করে কেন আপনারা আমাকে এ হতচ্ছাড়া জায়গায় নিয়ে এলেন ?

দীপ্তি হো হো করে হেসে ওঠে, ওলো, আব সতীপনা দেখাসনে। মুসলমানের সঙ্গে ঘর করে এসে আবার চরিত্রেব বড়াই ! লজ্জা করে না ?

বিজয়ার মুখ চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে। মাথা ঘুরে পড়ে যাবে বোধ হয় এক্ষুনি। সহসা আর কোন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না।

দীপ্তি দম নিয়ে পুনরায় সোহাগ জানায়, যা বলি শোন। ঢুকতেই যে উঁচু লম্বা ফর্সা ভদ্রলোককে দেখলি, উনি দেবীদাস বাবু। বিরাট পয়সার মালিক। যদি মন যুগিয়ে চলতে পারিস সুখে থাকবি। মিছিমিছি রাগ দেখিয়ে লাভ নেই।…

বিজয়া কান্নার সুরে প্রতিবাদ জানায়, না—না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব।…

ওরে আমার আহ্লাদিরে, চলে যাবে ! চলে যাবার জন্যেই যেন ওকে এখানে আনা হয়েছে…ঠোঁট উল্টিয়ে শাসাতে থাকে দীপ্তি।

চেঁচামেচি শুনে শিশিরকুমার স্বয়ং এসে উপস্থিত হয় হাসিকে সঙ্গে করে। চোখ রক্তবর্ণ করে হুঙ্কার ছাড়ে, কি, হয়েছে কি ? এত গোলমাল কিসের ? ওকে এক নম্বর কামরায় পাঠিয়ে দাও। আমি দেবীদাসবাবুর সঙ্গে কনট্রাক্ট করেছি।

বিজয়ার কণ্ঠদেশ কে যেন জোর করে টিপে ধরে। আগের মত চীৎকার পর্যন্ত করতে পারে না। নীরবেই দীপ্তির মুঠা হতে স্বীয় হাতটা এক ঝাঁকানীতে ছাড়িয়ে নিয়ে দোর ঠেলে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হয়।

শিশিরকুমার মুখ থেকে একগাল সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করে পুনশ্চ শাসিয়ে ওঠে, হুঁ, ভাল কথায় কাজ হবে না দেখছি। পাঁড়ে…চোবে…। পাঁড়ে চোবের আসার পূর্বেই ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে ওঠে। রিসিভার কানে দিয়েই শঙ্কায় পুনর্বার চীৎকার করে ওঠে শিশিরকুমার, সর্বনাশ, পুলিশ হামলা শুরু হয়েছে। তোমরা যে যেখানে পার পালাও। সমস্ত হলে ধর পাকড় চলেছে…বলতে বলতে স্বয়ং ছুটে যায় সিঁড়ির দিকে। অন্যান্য মেয়েরাও যে যেদিকে পারে। হাসি দীপ্তি ফিরেও তাকায় না একবার। ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নেমে যায় সকলে। বিজয়া বিহ্বলের মত খানিক চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। পরে এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে নিজেও গলির মধ্যে নেমে আসে। বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশ ভ্যান লক্ষ্য করে পুনশ্চ গলির মধ্যে দিয়েই—উল্টোদিকে ছুটতে থাকে। তিন চারটে বাড়ীর পরই বড় একটা দ্বিতল বাড়ীর এক তলার ঘরে বসে দু'জন ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। সম্মুখের দরজাটা খোলা ছিল। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে বিজয়া তাদের সম্মুখে। ভদ্রলোকদ্বয়ের তরফ হতে কোনরূপ প্রশ্ন আসার পূর্বেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অশক্ত দেহ।…

আঠার

বিকেল চারটে। জয়া তৈরী হয়ে আছে। কিষেনলালের পরিচালিত একটি শিশু রক্ষা সমিতিতে চাকুরি ঠিক হয়েছে ওর। ষ্টোর ইন্‌চার্জের কাজ। বহু চেষ্টা করেও সদাগরি অফিসে কোন পদ খালি করতে পারেনি কিষেনলাল।···জয়া খুশিই হয়েছে। এক গাদা পুরুষ মানুষের সঙ্গে বসে কেরাণীগিরি করা অপেক্ষা একাজ ঢের ভাল। তা'ছাড়া নিজের ভাইটিও উপযুক্ত আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হবার সুযোগ পাবে। জায়গাটা একটু দূর। তা' হোক, ওর তাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। ওখানেই ফ্রি কোয়ার্টার পাওয়া যাচ্ছে। বরং ভালই হল উমাদেবীর স্কন্ধ থেকে সহজ নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ পেয়ে।···আজ শুধু দেখেশুনে আসা। দু'দিন বাদে গিয়ে কাজে ভর্তি হতে হবে। জয়া ট্রামে বাসে করেই বরাহনগরে যাবে স্থির করেছিল। কিন্তু উমাদেবী রাজী হন্‌নি। শেঠজী সপ্তাহে দু'বার করে প্রতিষ্ঠান দেখতে যায়। আজ পালা আছে। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। বাঁধ বাঁধ ঠেকলেও সম্মত না হয়ে পারেনি জয়া। তা'ছাড়া যে মনিব হতে চলেছে তাকে লজ্জা করেই বা লাভ কি? ঔৎসুক্য সহকারেই পথের দিকে কান পেতে আছে।

যথা সময়ে গাড়ী এসে সদরে লাগে। তেতলার অলিন্দ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে জয়া। ড্রাইভার ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ নেই। আনন্দিতই হয় মনে মনে। সত্যি, শেঠজীর পাশে বসে যেতে লজ্জাই করত। একবার ভাবে খোকনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিন্তু উমাদেবী কিছুতেই রাজী হন না। নিজেও জরুরী একটা কাজের ছুতোয় পাশ কাটান। কিষেনলালও নাকি অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে অনেক আগেই পৌঁছে

গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। শান্তি দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। খুব যেন প্রসন্ন মনে হয় না ওকে। কিছু বলতে চায় কি? না না, ওসব বাজে ঝামেলায় কাজ নেই। দু'দিন- বাদেই এখান থেকে চলে যাচ্ছে। কে ভাল, কে মন্দ তা' নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার আবশ্যক কি? অনেকটা খুশি মনেই গিয়ে গাড়ীতে ওঠে জয়া। উমাদেবী খোকনকে কোলে করে এসে তুলে দিয়ে যান।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে একটা সরু রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে বরাহনগরের দিকে। কিছুদূর এগিয়ে প্রকাণ্ড একটা বাগান বাড়ী—চতুর্দিক প্রাচীরে ঘেরা। মোটরের হর্ণ বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কাঠের ফটক খুলে যায় দুদিক থেকে। লাল খোয়া বিছানো প্রশস্ত রাস্তা। দুদিকে বিলেতী পামের সারি। বাঁক ঘুরে ভেতরে প্রবেশ করে গাড়ী এসে দাঁড়ায় সুদৃশ্য একটা একতলা বাংলোর গায়ে। ডানদিকে প্রকাণ্ড ঘাট বাঁধান পুকুর। চত্বরে উলঙ্গ পরীর মুখ দিয়ে ফোয়ারার জল বেগে ঠিকরে পড়ছে। ঘাটের উভয় পার্শ্বে মার্বেল পাথরের বেঞ্চি পাতা। স্বচ্ছ জলে চলে মাছের মিছিল। বাঁদিকে বিরাট মরসুমী ফুলের বাগান। বকমারী ফুলের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। কুঞ্জের আড়ালে কোথাও কোথাও পাশাপাশি বসার বেদী সুশোভিত। সীমান্তবর্তী আম, জাম, তাল, নারিকেল বৃক্ষের অপূর্ব সমাবেশ। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। কে কোন জন-মনুষ্যের সাড়া শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে বন বিতান অনুরণিত। জয়ার বুকের ভেতর সহসা ছ্যাৎ করে ওঠে। ভোজপুরী দরোয়ান গাড়ী ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সদর বন্ধ করে দিয়েছে। কই, কোন শিশুর চীৎকার ত' শোনা যাচ্ছে না। তবে কি··· ড্রাইভার দরজা খুলে সেলাম জানায়। দ্বিতীয়বার হর্ণ বাজতেই বাংলোর কপাট খুলে বেরিয়ে আসে একটি প্রৌঢ়া পরিচারিকা। স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানায় সে, আইয়ে বিবি সাহেবা।···

জয়ার দেহের রক্ত নিমেষে হিম হয়ে আসে। অবশ নিশ্চল দেহলতা। বুঝতে বাকী থাকে না। একটার পর একটা শয়তানের চক্রজাল ঘিরে ধরেছে ওকে। কিন্তু উপায় নেই। সহজে নিষ্কৃতি দেবার লোক এরা নয়। আশ পাশে কোন লোকালয়ও নেই যে চীৎকার করে। নীরবেই পরিচারিকার সঙ্গে হলঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কাল বৈশাখীর রুদ্র নর্তন চলে দেহ মনে। পরিচারিকা ড্রাইভারের প্রতি কটাক্ষ করে মুখ টিপে হাসতে থাকে। সেও অনুরূপ ভঙ্গীতেই জবাব দিয়ে গাড়ী নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

বিরাট হলঘর। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে ধপ্‌ধপ করছে। অর্ধাংশ জুড়ে পুরু গদী বিছান শুভ্র বিছানা। সবুজ ডিস্‌টেম্পার করা দেয়ালের গায়ে গায়ে উলংগ ছবির লহর। দু'দিকে দুটো বড় আয়না। দাঁড়ালে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। এক কোনে একটা কাচের আলমারীর মধ্যে সার সার পান্‌ পাত্র সাজান। বিলেতী মদের বোতলও রয়েছে কয়েকটা। সম্মুখের টিপয়ের ওপর ঝক্‌ ঝক্‌ করছে ডিকেন্‌টারটা। হয়ত' সোডা কিংবা জিন্‌জারের জলে পরিপূর্ণ। অপর কোনের সেলফের ওপর চার অক্‌টেভ্‌ একটা ভাল হারমোনিয়ম ও কয়েক জোড়া ঘুঙুর। খান কয়েক দামী সোফা বিছানার তিন দিক জুড়ে। জয়া ঘরে প্রবেশ করেই হতবাক হয়ে যায়। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে একক সোফাটার ওপর বসে পড়ে। জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে শুরু হয়েছে বিপর্যয়। প্রথম প্রথম বিচলিত হয়ে পড়ত। ইদানীং শক্ত হতে চেষ্টা করছে। মানুষের কৃতঘ্নতার জবাব রূঢ় ভাবেই ফিরিয়ে দিতে হবে ওকে। বিনিময়ে যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় ক্ষতি নেই। তবু কারও নিকট দয়া-দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করবে না। মানুষের স্বভাবই অবনত মস্তক পদদলিত করা। শির উন্নত করে দাঁড়াতে হবে।…খোকনের জন্য মনটা উতলা হয়ে ওঠে। কে জানে, জীবনে আর ওর সঙ্গে দেখা

হবে কিনা! সাংবাদিক সতীনাথ আর যা-ই হোক ভদ্র ছিল। যদি তার কথা মত সেদিন রাজী হ'ত, তাহলে হয়ত এ শোচনীয় পরিণতি দেখা দিত না। স্রোতের জলেই ভাসিয়ে দিতে হল খোকনকে। দুধের শিশু এতক্ষণ হয়ত' দাপাদাপি করছে। ডাকিনীটা কি একটু যত্নও করবে না? শুধু একটু দুধ···একটু স্নেহ-চুম্বন?···না না, সতীনাথকেই বা বিশ্বাস কি? শিক্ষা দীক্ষায় উমাদেবীই কি কম? কিন্তু কি করল পাষাণী নারী! অর্থ লালসায় বেচে খাবে কি দুধের শিশুটাকে? বিবেক বুদ্ধি, সেকি মমতাময়ী নারীকে রাক্ষুসী করে তুলবে?···এলোমেলো চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়ে জয়া। মুক্তিলাভের সহজ কোন উপায়ই খুঁজে পায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার শক্ত হতে চেষ্টা করে। মনে পড়ে, শান্তির নিকট প্রতিজ্ঞার কথা। যত রূঢ়ই হোক, রুখে ওকে দাঁড়াতেই হবে। হিংস্র বাঘিনীর মত জ্বল জ্বল করে জ্বলে ওঠে সতেজ দু'টি নয়ন-তারকা। সারা অঙ্গ ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে প্রতিহিংসায়। কতটুকু···কতটুকু শক্তি ধরে কিষেনলাল আর ঐ উমা রাক্ষুসী!··পরিচারিকা কি যেন রসিকতা করতে গিয়ে ধাক্কা খায়। এই নাচ ঘরে অগণিত নটীকে দেখে এসেছে সে। ওষ্ঠের হাসি, চোখের জল, দেহ লাবণ্যের জৌলুস। কিন্তু জয়ার রূপে যেন ভয় পায়। রণ-দীপ্ত পটের দুর্গা প্রতিমা কি ধূম্রজাল ঠেলে বেরিয়ে এল?···

স্বীয় ভাব আত্মস্থ করে ঈষৎ হাস্যে অবস্থা লঘু করে জয়া, তোমার নাম কি ভাই?

ভরসা পেয়ে পরিচারিকা অধিকতর হাল্কা হয়, আমার আবার নাম—পিয়ারী! সে বয়েসও নেই, সেদিনও নেই।···

কি যে বল, তোমার আবার বয়েস নেই? আমি ত'···

থাক গো থাক। ঠাট্টা বিদ্রূপে আর কাজ নেই। নাম দিয়ে কি হবে ছাই? আমাকে তুমি খোকার মা বলেই ডেকো।

জয়া হেসে হেসেই রসিকতা করে, না না, খোকার মা নয়, তুমি মালিনী মাসী।

ফোকলা দাঁত বার করে খোকার মাও মাত্রা টেনে চলে, তা' তোমার যা খুশি পিয়ারী। এখন ওঠ, হাত মুখ ধোবে।

জয়া সে কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ গুছাতে উদ্যত হয়, আচ্ছা মালিনী মাসী, শেঠজী এখনও আসেন নি, কেমন?

অঃ হরি, নাগরকে না দেখে তাই তোমার রাগ হচ্ছে? আসবে গো আসবে, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কাল সারাটা রাত বেহুঁসে কেটেছে, একটু দেরী হবে বৈ কি।

বাবুর বুঝি কাল সারারাত খুব ফুর্তিতে কেটেছে মাসী?

না বাপু, ঢের দেখেছি। কিন্তু এমন জাদ্‌রেল মেয়ে মানুষ আর কক্ষণ দেখিনি। সে-ই কাল দুপুরে এসেছিল, আর এইত' তুমি আসার একটু আগে বিদেয় হ'ল। নগদ পাঁচশ'টি টাকার কড়্‌কড়ে নোট না নিয়ে কিছুতেই উঠলে না গা মাগী!...

তুমি বল কি মাসী!...জয়া কৃত্রিম হতবাক হয়েই প্রশ্ন করে।

কথাটা তোমার কানে দিয়ে ভাল করলেম না বাছা। জানি, তুমি দুখ্যু পাবে। তা' শুধু কালকে রাত্রেই কেনগো? মাসের মধ্যে অমন তিরিশটা রাতই ত' কাটে এমনি ভাবে। আর হবেই বা না কেন? ঐ হতচ্ছাড়া মুখপোড়াগুলোই ত' সব উসকিয়ে দেয়।

তারা আবার কে মাসী?

তা' কি ছাই আমিই চিনি? কথা-বার্তায় ত' সব ভদ্দর লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু...

খরচ পত্র বুঝি সব একলা তোমাদের বাবুই করে থাকেন?

তা' না তবে কি তুমি বলতে চাও ঐ ছুঁচোগুলো একটা কানাকড়ি টেঁক থেকে খসাবে? এদ্দিন আছি, খাটা খাটনিও কম করিনে। কিন্তু কোন

মুখপোড়া পার্বনী বলেও এপর্যন্ত একটা পয়সা হাতে দিয়েছে? শুধু দেখবে ফুকুটে লপেটাগিরি।...

না না, মাসী, এভারী অন্যায়। তোমাকে পর্যন্ত কোন বকশিশ করে না?

না গো, না। আমার কি আর তোমাদের মত রূপ যৌবন আছে যে হক কথায় হাজার টাকা পায়ের গোড়ায় ঢেলে দেবে?

জয়া মুখ টিপে হাসতে থাকে। মালিনী মাসী আপন ঢংয়েই অনুরোধ করে, নাও, এখন ওঠ। তোমাকে আবার জল খাবার দেওয়া হয়নি শুনলে শেঠ কর্তা রাগ করবেন।

জয়া হাসি মুখেই বাধা দেয়, দাঁড়াও মাসী, তোমরা ত' আর এক রাত্রের বেশী থাকতে দেবে না। এই সুযোগে একটু বসে আরাম করে নিই।

মালিনী মাসী সামনের ফোক্‌লা দাঁত দুটো বার করে পুনশ্চ রসিকতা করে, এমন ঠাণ্ডার দিনে একা একা বসে কি আরাম আছে পিয়ারী! তার চেয়ে নাগর আসুক গলা জড়িয়ে ধরে...

—দোল খাব, কেমন?...অসমাপ্ত কথাটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে সমাপ্ত করে জয়া। মালিনী মাসী পূর্ববৎ দাঁত বার করেই হাসতে থাকে। জয়া একটু দম নিয়ে পুনশ্চ আব্দার জানায়, আচ্ছা মাসী, শেঠজীর বৌ নেই?

তা' আবার নেই! গায়ে গতরে লক্ষ্মী পিরতিমা!

ছেলে মেয়ে?

ছেলে মেয়ে হবে কি করেগো? ফিটের ব্যামো আছে যে। তা'ছাড়া ...না বাছা, তুমি দেখছি পেটের কথা সব বার করে নিচ্ছ। আমি আর কিচ্ছু বলব না, এখন ওঠ।

না মাসী, আমি এখন কিছু খাব না।...কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে উত্তর করে জয়া।

কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ পায় মালিনী মাসীর, তা' বাছা না খাও না খাবে। হাত মুখটা ধুয়ে একটু সেজে গুজে নেবে ত', না তাও না?

তুমি রাগ করলে মাসী? বেশ, ক'টা ফল আর একটা ছুরি এনে দাও আমি খেয়ে নিচ্ছি। হাত মুখ বাসা থেকেই ধুয়ে এসেছি।

ফল খাবে কিগো, তোমার জন্য যে লুচি মাংস রয়েছে?

জয়া হাসতে হাসতেই প্রত্যুত্তর করে, তুমি দেখছি ভারী বোকা মাসী। একা একা কি ওসব খাওয়ায় আমেজ আছে?

তাই বল। আমি ত' ভেবেছিলাম, আমার হাতে বুঝি তুমি খাবে না। তা' ফল না হয় আমিই কেটে দিচ্ছি?

আবার ভুল করলে ত' মাসী? নাগরকে নিজে হাতে কেটে ফল খাওয়াতে চাই যে। চেষ্টা করে দেখি, অন্তত দু'টো রাতও যাতে তোমাদের কাছে থাকতে পারি।

তা' তুমি পারবে বাছা। তোমার যে রকম দরদ, শেঠ কর্তা ত' পুরুষ মানুষ, আমারই তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।...বলতে বলতে পুনশ্চ দাঁত বার করে হাসতে থাকে মালিনী মাসী।

জয়া তেমনি রসান দিয়েই প্রত্যুত্তর করে, তুমি বল কি মাসী! সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

হবে গো হবে। তুমি একটু বস। আমি এক্ষুণি ফল আর ছুরি নিয়ে আসছি।

উনিশ

দু'খানি ডিসে ফল কেটে সাজিয়ে রাখে জয়া। খোকার মা অনেক করে অনুরোধ জানায় কিছু খেতে। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয় না। খাওয়া ত' দূরের কথা, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোন রকমে বাহ্যিক কৃত্রিমতা নিয়ে পুনশ্চ আব্দার জানায়, শেঠজীকে রেখে একা একা কিছুই খাবে না।

মালিনী মাসী খুশি হয়। লঘু হাসি ঠাট্টায় হয়ে ওঠে মুখর। জয়ার চাটুবাক্যে মাত্রা রাখতে পারে না। একের পর এক অনর্গল বলে চলে নিজের জীবন কাহিনী-শেঠজীর বিচিত্র কীর্তিকথা। কত সাহেব সুবাদার হতে আরম্ভ করে রাজা মহারাজার ভিড় জমে এই বাগান বাড়ীতে। দেশী বিদেশী কত অসহায় নারীর বেদনাশ্রুতে ভেসে যায় বাংলোর ধবধব পাথরের মেঝে। বকুল গাছতলায় চিরদিনের মত শুয়ে জীবন জ্বালা জুড়োয় কত সতী সাধ্বী রুদ্ধ নিশ্বাসে।…সমবেদনায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হতভাগিনী নারী। স্বীয় জীবনের ব্যর্থতায় হয়ে পড়ে মর্মাহত। বছর পঁচিশ পূর্বে সে-ও একদিন এসেছিল এই বাগান বাড়ীতে ভরা যৌবন নিয়ে। তখন বাগানের মালিক ছিল শীল বাবুরা। ভাগ্য বিপর্যয়ে আজ কিষেনলালের হাতে এসেছে।…তারও হাত দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে অনেক নিশুতি রাতে রঙিন গোলাপী সুরা। চঞ্চল অঙ্গ ভঙ্গীতে খেলে গিয়েছে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ।…অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস, আজ সামান্য একজন দাসী মাত্র। মেয়েটা যদি বেঁচে থাকত, জয়ার মতই হ'ত।…আঁচলে চোখ মুছে উঠে যায় কলঙ্কিনী নারী। জয়া একাকিনী বসে ভাবতে থাকে। মৃত্যু বিভীষিকা ভয় দেখাতে থাকে। না…না…নারীত্বের এহেন কদর্যতা সহ্য করার নয়। এক ফাঁকে ফল কাটা ছুরিটা ব্লাউজের নীচে রেখে দেয়। বিপদের একমাত্র ভরসা। যদি মুক্তি পায়ত' ওটার সাহায্যেই পাবে। অন্যথায় ওকেও বকুল গাছ তলেই আশ্রয়

নিতে হবে। নিষ্কৃতিলাভের অন্য কোন উপায় নেই। অঝোরে ঝরতে থাকে বেদনাশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে। খোকনের ভবিষ্যৎ ভেবে কুল পায় না। কে দেখবে ওকে ওর অবর্তমানে? যদি ভেসেই যাবে, তবে কেন সঙ্গে করে এনেছিল এই দূর বিদেশে?…না…না…সে হতে পারে না, কখনও না। খোকার মা আবার ফিরে আসে দোর ঠেলে। ভুলে গেছে সমস্ত অন্তর বেদনা রিক্তা নারী। স্বভাব সিদ্ধ হাসি ঠাট্টায় আবার মুখর হয়ে ওঠে। শেঠজীর শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে বশ করতে চেষ্টা করে পুনরায়। জয়া নিজেও পট পরিবর্তন করে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়।

দেয়াল-ঘড়িতে এগারটা বেজে যায়। ঘুমের তাড়নায় উদ্বেগ বোধ করে মালিনী মাসী। শেঠজী এবং ওর খাবার এঘরে দিয়ে শুতে যেতে অনুরোধ করে ওকে জয়া। আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরে শেষটায় প্রায় বারটার কাছাকাছি উঠে যায় বেচারা। মোটরের হর্ণ শুনে পুনরায় হাজির হবে।

নিশুতি রাত। অমাবস্যার স্তিমিত অন্ধকার থম থম করছে। নিস্তব্ধ বাগান বাড়ীর শূন্য কক্ষে একাকিনী জয়া। সদরে দরোয়ান ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ আছে কিনা জানা যায় না। কিন্তু পালাবারও কোন পথ নেই। উচ্চ প্রাচীরে চতুর্দিক বন্ধ। মালিনী মাসী এতক্ষণ নিশ্চয় তার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শীতের রাত্রে সময় মত উঠে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু ওর চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। মস্তকের সমস্ত শিরা উপশিরায় উত্তপ্ত রক্তস্রোত বইছে। হিংস্র শ্বাপদের দৃষ্টি দু'চোখে। উত্তেজনায় বুকের মধ্য হতে ছোরাটা আর একবার বার করে নিয়ে ধার পরীক্ষা করে দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওতেই চলবে। শেঠ কিষেনলালের বক্ষ বিদীর্ণ করতে অক্ষম হলেও নিজের কণ্ঠনালী ছিন্ন করতে আটকাবে না। বড় আয়নাটায় স্বীয় রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে নিজেই যেন চমকে ওঠে। বাগান প্রান্তরে আম্র শাখে নৈশ প্রাণীর পাখসাট শোনা যায়। অন্তরে বাদুর চেঁচিয়ে ওঠে।

কুড়ি

রাত সাড়ে বারটা। নিস্তব্ধতা ভেদ করে মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। দরোয়ান সদর খুলে কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়। চোখ রগবাতে রগরাতে ঠিক সময় মত এসে হাজির হয় মালিনী মাসী। আশ্চর্য মাত্রা বোধ! জয়ার বুকের ভেতর হাড় কাঁপতে থাকে। গভীর উদ্বেগে অপেক্ষা করে চলে। গাড়ী থেকে নেমে অপর দুই সাঙাতের কাঁধে ভর করে টলতে টলতে উঠে আসে অশক্ত মাতাল। মুখে মদের ঝাঁজালো গন্ধ। গায়ের শাল লুটিয়ে মাটিতে পড়ছে। জয়া ঝটিতে পট পরিবর্তন করে কৃত্রিম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ভেতরে প্রবেশ করেই জড়িত কণ্ঠে উচ্ছ্বাস জানায় কিষেনলাল, বাঃ বাঃ বহুৎ আচ্ছা বাদ মেরা পিয়ারী। দিল্ পর আ-যাও—দিল্ পর·· বলতে বলতে সাঙাতদ্বয়ের স্কন্ধ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জয়ার স্কন্ধে ভর করতে চেষ্টা করে।

গা বাঁচিয়ে খানিকটা দূরে সরে যায় জয়া ঈষৎ হাস্যে। সাঙাতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে কটাক্ষপাত করে লজ্জা নম্র চোখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মাতাল অধিকতর গদ গদ কণ্ঠে শুরু করে, ওহো, এহি বাদ? আ-চ্ছা···। এ-ই তো-ম-লোক সব ভা-গ যা-ও হি-য়া-ছে। তো-ম-ছে কো-ছ জ-রু-র-ৎ নে-হি···

সাঙাতদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ক্ষণকাল পরেই মোটরের ঘড় ঘড় শব্দ কানে ভেসে আসে। জয়া ভেবে নেয়, হয়ত' একেবারেই চলে গেল ওরা। খুশিতে তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে মদ ঢালতে থাকে।

মাতাল পূর্ববৎ হাস্য রসেই আরম্ভ করে, তো-ম্-তো বহুৎ আচ্ছা হে মেরী পি-য়া-রী! লেকিন ও শালীলোক, তুমকো লিয়ে বহুৎ রূপেয়া খায়

হামছে। বিলকুল ঝুটা হা-য়—ছি-নাল···উমাদেবীর উদ্দেশ্যে গভীর ঘৃণা প্রকাশ করে। ঢোক গিলে নিয়ে পুনরায় আরম্ভ করে, আ-যা-ও মে-রা দিল্ পর আ-যা-ও রাণী···সরাপকা কোছ জরুরৎ নেহি। হাম্ আচ্ছাছে পিয়া লিয়া ··

জয়া মিষ্টি হেসে পূর্ণপাত্র এনে মুখের কাছে ধরে।

এক নিঃশ্বাসে শেষ করে পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে কিষেনলাল, আরে, এতনা সব খানা পিনা থা! তোম কোছ খায়া নেহি?

মালিনী মাসী তাড়াতাড়ি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর করে, বিবি সাহেব আপনাকে ছেড়ে কিছু খাবে না বলছিলেন।

চোখ কপালে তুলে অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে কিষেনলাল, সাচ্, এহি বা-দ? মেরা দিল্ বহুৎ খু-শি হোয়া রাণী! লেকিন আভি কোচ্ খা লেউ, হাম কো ভি থোরা দেউ।···

জয়া মালিনী মাসীর দিকে সলজ্জভাবে তাকায়।

কিষেনলাল পুনশ্চ চেঁচিয়ে ওঠে, এ-ই তোম্‌ভি কাহে হিয়া পর ঠারা হায়? ভাগো, জল্‌দি ভাগো হিয়াছে।

মুচকি হাসি হেসে বেরিয়ে যায় মালিনী মাসী। জয়া অর্গল বন্ধ করে দেয়। বুকের রক্ত টক্‌বগ করে ফুটতে থাকে। তাড়াতাড়ি আর এক পাত্র ঢালতে উদ্যত হয়।

কিষেনলাল উচ্চস্বরে বাধা দেয়, নেহি—নেহি; আরভি কোছ জরুরৎ নেহি। খানা খাকে আভি মেরা দিল্ পর আ-যা-ও···ডান হাত ঠুকে নিজের বুক দেখিয়ে দেয়।

জয়া পুনরায় পাত্র পূর্ণ করে মুখের কাছে ধরে। চটুল চাহনিতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে মাতালকে।

কিষেনলাল যথারীতি নিঃশেষ করে আবেগে চিবুক স্পর্শ করতে হাত বাড়ায়। মুখ ঘুরিয়ে আর এক পাত্র ঢালতে উদ্যত হয় জয়া। অধৈর্য

মাতাল হাত বাড়িয়ে আঁচল টেনে ধরে। সজোর ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নিয়ে আর এক পাত্র উপস্থিত করে জয়া।

কিষেনলাল অধিকতর চাঞ্চল্যে পাত্র হাতে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরতে যায়।

নারীর সর্বশক্তি ফুঁসে ওঠে। ঝাঁকানীতে হাতের পাত্র মেঝেতে পড়ে চুড়মার হয়ে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে জয়া।

তীব্র বুভুক্ষায় পুনশ্চ টলতে টলতে উঠে আসে মাতাল শিকার ধরতে। চোখে শ্বাপদের শ্যেন দৃষ্টি। নিকটস্থ হয়ে স্বাভাবিক আবেগেই পুনশ্চ সোহাগ জানায়, এ্যা ক্যা বাদ মে-রা রা-ণী? তোম কা'হে এ্যায়ছা করতা? দিল্ পর আ যাও···মেরা দিল্ পর···থ্যাবড়া থ্যাবড়া থাবায় ধরতে যায় জয়ার উন্নত বক্ষ।

রণরঙ্গিণী মূর্তি গর্জে ওঠে। মদের শূন্য বোতলটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে ললাট লক্ষ্য করে। মাতাল সামলে নেয় ঝুকে পড়ে! মেঝের ওপর ঝন্ ঝন্ শব্দে চুড়মার হয়ে যায় কালো বোতলটা। নিরুপায় জয়া বুকের ভেতর থেকে ছোরা বার করে রুখে দাঁড়ায়।

কিষেনলাল আর অগ্রসর হয় না। পেছন ফিরে টলতে টলতে দোর খুলে হাঁক ছাড়ে সাঙাতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে। পূর্বের পিশাচ দু'টো হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে এসে উপস্থিত হয়। ছোরাটা মুঠার মধ্যে শক্ত করে ধরে এক কোনে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে জয়া। যেভাবেই হোক শেষ চেষ্টা করে দেখবে। অন্তত একটাকে শেষ না কবে আত্মহত্যা করবে না।

বর্বর দু'টো এগিয়ে চলে কৌশলে। জুজুৎসুর প্যাচ কবে ছিনিয়ে নেবে ছোরাটা। জয়া হাত উঁচিয়ে আছে। কাছে গেলেই সজোরে বসিয়ে দিবে বুক। কিন্তু অপটু হাত, সুযোগ পায় না। পিশাচ দুটো অনেকটা নিকটবর্তী হয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খেলাতে থাকে। সহসা কোন্ ফাঁকে যেন একজন লাথি মারে ওর ডান হাতে। ছোরাটা হাত থেকে

খসে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। লুফে নেয় আর একজন ঝাঁপিয়ে। চেপে ধরে সজোরে দু-হাত দুদিক থেকে জয়ার। মাতাল গদীর ওপর এলিয়ে পড়ে বিকট উল্লাসে হুঙ্কার ছাড়ে, লি-য়ে আও, আভি লি য়ে আ-ও শা-লী-কো…

হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে গদীর ওপর নিয়ে তুলে দেয় অর্ধ উলঙ্গ অসহায় নারী দেহ। শুধু সায়া ব্লাউজে কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করে জয়া। হিংস্র মাতাল বল প্রয়োগে বসিয়ে দেয় দুটো ধারালো দাঁত রক্তিম কপোলে। অবাধে চলতে থাকে নিষ্ঠুর নিপীড়ন। যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অনাশক্ত নারী।

একুশ

দুর্যোগ রাত্রির শেষ প্রহর। জয়া চেতনা ফিরে পেয়েছে। মাতাল কিষেনলাল বেহুঁসে ঘুমুচ্ছে পাশেই লেপ মুড়ি দিয়ে। দুর্বল মস্তিষ্কে ভাবতে পারে না, একি সত্য না স্বপ্ন! কেমন করে পর-পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছে ও! ছিঃ…সর্বাঙ্গে কে যেন বিষ ঢেলে দেয়। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। অসহ্য যন্ত্রণা। তবু মনের আবেগে উঠে বসে। পরিধেয় কাপড়টা মেঝের এক প্রান্তে পড়ে আছে। টলতে টলতে গিয়ে পরে নেয়। কিষেনলালের গায়ের মাতাল গন্ধ সারা দেহে যেন লেপটে আছে। গা পাক দিয়ে ওঠে। প্রথম প্রহরের দুর্ঘটনা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। লজ্জায় ক্ষোভে অধীর হয়ে ওঠে জয়া। একবার ভাবে, শাড়ীটার সাহায্যে বাগানের কোন এক আম্রশাখে ঝুলে পড়ে জীবনের জ্বালা জুড়োয়। কি প্রয়োজন, জ্বালা

এ-জীবনে? মান সম্ভ্রম সবই যখন চুরমার হয়ে গেল, তখন আর বৃথা বোঝা বয়ে লাভ কি? ঢাকার দুর্ঘটনা বিধর্মীর অত্যাচার মনে করেই এখানে ছুটে এসেছিল সসম্মানে জীবনধারণের আশায়। কিন্তু এখানেও যখন সেই একই চক্রান্ত কালো ছায়ার মত ঘিরে আছে তখন আর আশা কোথায়? ক্ষণিক উত্তেজনায় ওখানে যে অত্যাচার হয়েছিল তার চেয়ে এখানকার কদর্যতা আরও ভয়াবহ। সবল সুস্থভাবে খুন করতে পারে এরা।...দেহ স্থির রাখতে পারে না। সম্মুখের সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে। পরিষ্কার করে ভাবতেও পারে না কিছু। সব যেন গোল হয়ে গিয়েছে। কিষেনলাল আলস্য ত্যাগ করতে পাশ ফিরে। গলা টিপে মেরে ফেলা যায় না কি ওটাকে? নির্ভাবনায় ঘুমুচ্ছে শয়তান। কি করতে পারে এখন? বজ্র মুষ্টিতে শক্তি পরীক্ষা করে দেখে। এগিয়ে যায় দু'পা গভীর উত্তেজনায়। আবার নিমেষে কে যেন অন্তর থেকে বাধা দেয়। না—না—হত্যা করে নয়। এক কিষেনলালকে হত্যা করলে সহস্র কিষেনলাল রুখে দাঁড়াবে। ফাঁসীতে লটকাবে দানবকুল। রাশি রাশি দানবের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। জাগাতে হবে গণমানবকে। হত্যার প্রতিশোধ—একক হত্যা করে নয়। হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে সদলে পঙ্গু করতে হবে ওদের।...পিছিয়ে এসে আবার সোফার ওপর বসে ভাবতে থাকে জয়া। অকারণেই কেন যেন সতীনাথের কথা মনে পড়ে যায়। যদি আজ সে পাশে থাকত, নিশ্চয় যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সহায়তা করতে পারত। সাংবাদিক জীবনে পথের নির্দেশ নিশ্চয় তার জানা আছে। দুনিয়ার কত খবর রাখে সে। জাগ্রত জীবনে মিছিল করে চলেছে যারা। হ্যাঁ সতীনাথ, পথের বন্ধু—জাতির সেবক।... নিশ্চয় সাহায্য করত ওকে। কিন্তু কোথায় সে আজ? ঠিকানা একটা দিয়েছিল বটে। তবু যাবে কেমন করে? কিষেনলাল যে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।...

বৃক্ষশাখে ডানা ঝটপট করে উড়ে যায় একটা নৈশ পাখী অন্ধকারের বুক চিরে। ওকি পথের নির্দেশ দিয়ে গেল? জয়া স্থির হয়ে বসে। হ্যাঁ, বাঁচতে ওকে হবেই। চুপিচুপি আত্মহত্যা করে দুষ্কৃতকারীকে নির্ভাবনায় দিন কাটাতে দিতে পারে না। মহাভারতের মাতুল শকুনিকে একশত ভাইয়ের মৃত্যু-যাতনা বুকে বহন করে বাঁচতে হয়েছিল। অত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? ও না শান্তিকে কথা দিয়েছে, যত ভয়াবহই হোক সংগ্রাম করে যাবে, তবে?···উত্তাপে দম বন্ধ হয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে পশ্চিমের জানালাটা খুলে দেয়। কনকনে হিমেল হাওয়ায় কিছুটা আরাম বোধ হয়। বেশ কিছুটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে স্নান করতে পারলে নিশ্চয় আরও সুস্থ বোধ করা যেত। দেহ মনের কালিমাও হয়ত অপসারিত হত কিছুটা। মাতালটার গায়ের বিশ্রী গন্ধে যেন দম আটকে আসছে। কিন্তু শীতের এই শেষ রাত্রে কে দেবে ওকে সাজসরঞ্জাম! নিজের শিরা-উপশিরায় তীব্র জ্বালা থাকলেও, অন্যপর সকলেই লেপের নীচে আমেজরত। কলঘর কোথায়—তা'ও জানা নেই। উপরন্তু একখানা শুকনো শাড়ী না হলেই বা স্নান করে কি করে? অনন্যোপায় হয়ে বাইরের দিকে মুখ করে প্রহর গুণে চলে। প্রভাতের পাখী কলরব করে ওঠে কুঞ্জে কুঞ্জে। কুয়াশা ভেদ করে সূর্যরশ্মি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পূর্ব গগনে। জয়া ধীরে ধীরে দোর খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মনোরম পরিবেশ। চাকর, মালী, দরোয়ান কারও সাড়াশব্দ নেই। ফুলেরা বৃন্তে বৃন্তে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দুলছে। চোখ মেলে ভাল করে তাকাতে পারে না। নগ্ন স্ট্যাচুগুলো যেন বিদ্রূপ করছে ওর দিকে চেয়ে। খুব না ঘৃণা প্রকাশ করেছিল কাল এসে, এখন? আঁৎকে ওঠে মানসিক নিপীড়নে। কিষেন-লাল যদি উঠে এসে আবার জুলুম শুরু করে? সাঙাত দু'টো নিশ্চয় চলে যায়নি?···কি করতে পারে ও এই অশান্ত পরিবেশে?···

কুঞ্জের ফাঁক দিয়ে সোনালী কিরণ গায়ে এসে পড়ে। মালিনী মাসী ঘুম থেকে উঠে এসে সোহাগ জানায়, চা দেব ?

জয়া অন্যমনস্কভাবে স্নানের ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করে।

স্মিতহাস্যে চলে যায় মালিনী মাসী। পাশের ঘর খুলে এক পরস্ত শাড়ী ব্লাউজ নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়। জয়ার প্রতিরোধে চুলে তেল মাখান বন্ধ রাখে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কলঘব। সাবান, তোয়ালে, আয়না, চিরুণী ও প্রসাধন দ্রব্যে সুসজ্জিত। কাপড় জামা ব্রাকেটের ওপর রেখে ধারাযন্ত্র খুলে বসে পড়ে। সমস্ত মুখে কে যেন এক দোয়াত কালী ঢেলে দিয়েছে। বার বার সাবান ঘষে অপসৃত করতে চেষ্টা করে কলঙ্ক কালিমা। দেহের স্থানে স্থানে বিষ-বেদনা জমাট বেঁধে আছে। মোটা জলের ধারা দিয়ে চলে। বুকে রক্ত জমে চাকা চাকা কাল শিরা ফুটে উঠেছে। হাত ছোঁয়ান যায় না। নরম তোয়ালে দিয়ে কোন রকমে গা পুছে নিয়ে জামা কাপড় পরে নেয়। পরিষ্কার ধোপ ধোয়া। ঘৃণা হয় না। মনে গভীর ক্ষত থাকলেও বাহ্যিক অনেকটা হাল্কা হতে পেরেছে। কোঁকড়ান কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কলঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নারীর অপূর্ব সাম্য মূর্তি।

মালী ভৃত্য স্ব স্ব কাজে লেগেছে। সমস্ত বারান্দাময় ছড়িয়ে পড়েছে সোনালী রদ্দুর। পিঠ দিয়ে খানিক বসে জয়া। চোখা-চোখি হয়ে যায় কা'র কা'র সঙ্গে। সকলেই কি বিদ্রূপ করছে ওরা ওকে দেখে? ঘরের ভেতরও যাবার উপায় নেই। শয়তানটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। যদি পায়ের শব্দে জেগে ওঠে?…যতটা সম্ভব একা একা থাকতে পারলেই যেন বাঁচা যায়। তারপর…মালিনী মাসী খানকয়েক বিস্কুট ও এক কাপ চা নিয়ে পুনরায় উপস্থিত হয়। কাল এসে অবধি জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। মর্মান্তিক ঘৃণা ছিল। কিন্তু আজ আর কোন আপত্তি নেই।

খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। শুধু বাঁচাই নয়, কিষেনলালকেও খুশি রাখতে হবে। জানতে হবে ওর আনাচে কানাচে। বাঁধ যখন ভেঙে গেছে তখন আর ভয় কি? ডেকে জাগাবে কি এক্ষুণি? অভিনয়ে অভিনয়ে গোলক ধাঁধাঁ।···চোখ-মুখের ভাব হয়ত কিছুটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। এক নিঃশ্বাসে চায়ের পাত্রটা নিঃশেষ করে দেয়। আরও কয়েকটা বিস্কুট হলে ভাল হ'ত। বড় খিদে পেয়েছে।···খোকন···খোকন কি কিছু খেয়েছে এখন? না—না—উমাদেবী রাক্ষুসী হলেও নারী। কচি ছেলেটাকে কি এত বেলা পর্যন্ত কিছু না খেতে দিয়ে পারে?···মালিনী মাসী খুশি হয়। গত রাত্রের দুর্ঘটনায় বড় ভয় পেয়েছিল বেচারা। কে জানে, ঐ-মেয়েটাকেও শেষ পর্যন্ত বকুল গাছতলায় শুতে হবে কি না। না, না, শেঠকর্তা এবার নিশ্চয় মাপ করবে। এমন সোনার পিরতিমা।···নিশ্চিন্ত মনেই নিজের কাজে উঠে যায়। আত্মস্থ হয়ে ভাবতে থাকে জয়া।

বাইশ

কিষেনলালের ঘুম ভাঙে ন'টায়। শীতের বেলা কম হয়নি। এগারটার মধ্যে আবার অফিসে না গেলেই নয়। মোটা একটা কনট্রাক্ট সই হবার কথা আছে। গাড়ী অনেকক্ষণ দোরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু শরীরের মাদকতা যেন কিছুতেই দূর হয় না। আরও খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারলে হয়ত' ক্লান্তি অপসারিত হত। কিন্তু উপায় কি? মনটাও কেমন যেন খিঁচিয়ে পড়েছে। মেয়েটা গেল কোথায়? পালিয়েছে কি? যদি দূর হয়ে থাকে ত' ভালই হয়েছে। জীবনে অনেক নারী এসেছে গিয়েছে কিন্তু এমন বিপদ কখনও ঘটেনি। উমা ছিনালটা

যদি অমনি ধারা নাছোড় বান্দা হয়ে না লাগত তাহলে কলঙ্ক কিছুতেই মাথায় চাপত না। নারী হয়ে নারীর এমন সর্বনাশ কেউ কখন করে? বেচারা, অনেক আশা নিয়ে এসেছিল···বিবেকের তীব্র দংশন বিচলিত করে তোলে কিষেনলালকে।···না, না, দরোয়ান নিশ্চয় পালাবার সুযোগ দেয়নি। মোটা রকমের অর্থ দিলে হয় না? অনাথা, শিশু ভাইটিকে মানুষ করবে বলেই চাকরি খুঁজছিল। যত অর্থ চায়। আপিসের যে কোন পদ। তবু কি ক্ষমা করতে পারবে না রিক্তা নারী? আমি না হয় জীবনে আর সম্মুখবর্তী হব না। তবু কি···না, না, একি মিছে ভাবনা? আমার কি দোষ? মাতাল হয়ে না পড়লে কিছুতেই একাজ সম্ভবপর হত না। আর ঐ মেয়েটাই ত' গ্লাসের পর গ্লাস ভর্তি করে মদ খাইয়েছে, তবে? নিশ্চয় ভালবাসে আমাকে। শিক্ষিতা, তাই হয়ত' একটু খেলিয়ে দেখতে চায়। সেবার সুষমা সুন্দরীও ত এমনি করে টাকা আদায় করেছিল।···বোঝা অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে। আবেগভরে হুঙ্কার ছাড়ে কিষেনলাল খোকার মার উদ্দেশ্যে।

কিষেনলালের ঘুম ভেঙেছে জয়া টের পায়। তবু কাছে যেতে পারে না। লজ্জা অপেক্ষা সাহসের অভাব। অভিনয় করব বল্লেই আর অভিনয় করা যায় না। রীতিমত মহড়া প্রয়োজন। সময় সাপেক্ষ। মনের সঙ্গে বার বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও এগুতে পারে না। ডাক শুনে মালিনীমাসী ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসে।

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কিষেন লাল, জয়াবিবি কোথায়?

বাইরের বারান্দায়···স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর করে পরিচারিকা।

কিষেনলাল আর যেন কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না। হৃদয়-তন্ত্রীর তার যেন ছিঁড়ে যায় সহসা। মুখে ফুটে ওঠে চিন্তার রেখা।

জয়া আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। পরিস্থিতি অনেকটা শান্তই মনে হয়। ডেকে পাঠাবার পূর্বে আপনা হতেই ধীর পদে এসে জয়া

ঘেঁসে দাঁড়ায়। সহসা কে যেন এক মুঠা লঙ্কার ঝাল ছিটিয়ে দেয় কিষেন-লালের চোখে। ভাল করে তাকাতে পারে না। নিজের উঁচু দাঁত দুটোর ক্ষতচিহ্ন কালশিরা হয়ে ফুটে উঠেছে বেচারার বাঁ গালে। ছিঃ ছিঃ, কি নিষ্ঠুর নিপীড়ন?…রাত্রের পিশাচটা ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে। মদের নেশাও আর বিন্দুমাত্র নেই। অবসন্ন দেহ মন। শুধু থেকে থেকে তীব্র হয়ে উঠছে বিবেকের দংশন। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যে হাল্কা হয় তারও উপায় নেই। আত্মাভিমানে ঘা লাগে। খোকার মা চা আনবার অছিলায় বার হয়ে যায়। জয়া নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল। করুণ বিষাদ-ঘন দৃষ্টি। সহ্য করতে পারে না দুরাচার। আবেগে ফেটে পড়ে, কিছু বলবে?

জয়া কোন উত্তর করতে পারে না। শ্রাবণের আকাশ ঘন হয়ে ওঠে।

পাপাত্মা পুনশ্চ উচ্ছ্বাস জানায়, আমাকে তুমি ক্ষমা কর বিবিসাহেবা। এক্ষুনি তোমাকে আমি কোলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মুখ দিয়ে তবু কোন কথা সড়ে না জয়ার। দু'গণ্ড বেয়ে জল ঝরতে থাকে। কিষেনলাল থামে না। দরদ বিজড়িত কণ্ঠেই পুনশ্চ অনুরোধ জানায়, বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

জয়া নির্বাক। মাটিতে পা রেখে বিছানার এক কোণে এসে গুটিসুটি হয়ে বসে। খোকার মা একক চায়ের সরঞ্জাম সহ পুনরায় উপস্থিত হয়। হাতের কাছে অন্য কোন অবলম্বন না পেয়ে গর্জে ওঠে কিষেনলাল, আর এক পরস্ত কোথায়?

আমি চা খেয়েছি…ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করে জয়া।

সাপের মুখে ধুলো পড়া পড়ে। কিছুটা আশ্বস্তও হয় জয়ার স্বাভাবিকতায়। হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালাটা খোকার মার হাত থেকে নিয়ে তাকেয়া ঠ্যাস দিয়ে বসে। খোকার মা জলের গ্লাস ও পিকদানিটা এগিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি। মুখ কুলকুচি করে চা পানে রত হয় অলস দেহ। ইচ্ছে জয়া আর এক পাত্র খেলে ভাল হত। কিন্তু জোর দেখাতে ভরসা

পায় না। তাছাড়া এত' শুধু "বেড্ টি।" জলযোগের সময় না হয় ভাল করে সাধা যাবে। চুক চুক করে পাত্র নিঃশেষ করে দেয়।

নীরবেই বসে ছিল জয়া। শান্ত সমাহিত রূপ। কিষেনলাল যে রূপ দেখে গত রাত্রে ক্ষীপ্ত হয়েছিল আজ আর সে মাদকতা নেই। অপরূপা সাম্যমূর্তি। রাতারাতি কিষেনলালের চোখটাই বদলে গেছে সম্ভবত। আজ আর দেহ কাম্য নয়। ক্ষমা—অনুকম্পা। যার দাপটে শত শয়তান একযোগে তাণ্ডব শুরু করে তার এ ভাবান্তর নিতান্তই অস্বাভাবিক। তবু এ মুহূর্ত কিষেনলালের পক্ষে বাস্তব। অনুশোচনায় দুর্বিসহ হৃদয়ভার। যে নারীকে একক কাছে পাবার জন্য দিবারাত্র ষড়যন্ত্র করে এসেছে সে স্বেচ্ছায় এত কাছে এসে বসেছে—তবু চোখ মেলে ভাল করে চেয়ে দেখতে পারছে না। কিষেনলালের কি অপমৃত্যু হ'ল?···হাত থেকে পেয়ালা নামিয়ে পুনশ্চ খেদ প্রকাশ করে, জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তবু অনুরোধ করছি, আর আমার সম্মুখে চোখের জল ফেল না। আমি এক্ষুনি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কোথায় যাব শেঠজী?···ক্ষীণ নারী কণ্ঠ মুসরে পড়ে।

প্রত্যুত্তর করে কিষেনলাল, কেন, উমাদেবীর ওখানে।···না না, ও রাক্ষুসী, আমি তোমাকে আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এ স্থান ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে পারব না। দয়া করে আমাকে এখানেই একটু আশ্রয় দিন।

এ যে বাগান-বাড়ী বিবিসাহেবা! ঘোরতর পাপপুরী!

তা হোক, পাপ পুণ্য আমার বিচার্য নয়।

তুমি জান না বিবিসাহেবা। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানকার জীবন তুমি সহ্য করতে পারবে না।

আপনার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, স্নানে যান।

তুমি আমায় বড্ড বিপদে ফেল্লে বিবিসাহেবা

কাপুরুষেরাই বিপদকে ভয় করে শেঠজী।...জয়ার চোখে সহসা হাসি খেলে যায়।

কিষেন আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না। নারীর মোহিনী রূপে দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নীরবেই কলঘরের দিকে উঠে যায়।

তেইশ

আপিসে পৌঁছুতে সাড়ে এগারটা বেজে যায় কিষেনলালের। সরকার পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিষ্টার গুপ্ত যথা সময়ে উপস্থিত হয়েছেন। শুধু শেঠজীর অভাবে কনট্রাক্ট ফরম সই হয়নি। মুহুর্মুহু ঘড়ির দিকে চেয়ে হাঁপিয়ে উঠছিলেন মিষ্টার গুপ্ত। কনট্রাক্টটা ডাকযোগে পেলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু নিজেদের প্রাপ্য গণ্ডা নগদ মিটিয়ে না নেওয়া নিরাপদ নয়। উপরন্তু বখরাদারও আছে। তারাইবা মনে করবে কি? আপিস ম্যানেজার রামলোচনবাবু চা, পান, সিগারেটে অতি মাত্রায় ভদ্রতাজ্ঞাপন করলেও অন্তরে সোয়াস্তি নেই মিষ্টার গুপ্তর। বাগান-বাড়ীর সঙ্গ লাভ তার ভাগ্যেও দু'চার দিন হয়েছে। কে জানে, আজও মাতাল হয়ে পড়ে আছেন কি না শেঠজী?...আবার আপন মনেই ভেবে আশ্বস্ত হন, না না, শেঠজী আর যা-ই হোন ব্যবসায় কথা নড়চড় করবেন না।...একটা সিগারেট ধরিয়ে আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলেন। মিনিট কয়েক কাটে যায়। বাইরে মোটরের হর্ন বেজে ওঠে। চেনা আওয়াজ। মিষ্টার গুপ্তর মুখে হাসি খেলতে থাকে। কিষেনলাল 'লিফটে' ভিড় দেখে তড়্তড়্ করে লাফিয়ে উঠে আসে সিঁড়ি বেয়ে। বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে

মিষ্টার গুপ্তকে কাজ মিটিয়ে নিতে অনুরোধ জানায়। রামলোচন বাবু এটর্নী বাড়ী থেকে কাগজ পত্র আনিয়ে এক প্রকার সব ঠিক করেই রেখেছিলেন। শুধু শেঠজীর সই বাকী।

কনট্রাক্ট ফরম ও দক্ষিণা নগদ পেলে মিষ্টার গুপ্ত আজই অফিসে পৌঁছে মঞ্জুর নামা পাঠিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু শেঠজীকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে। সই করে দিলেন, অথচ টাকার কথা মুখেও আনলেন না। পূর্ব ব্যবস্থা কি ভুলে গেলেন এরই মধ্যে! মুখ ফুটেই বা চাওয়া যায় কি করে? ব্যবসা করেন অথচ এই মোটা বুদ্ধিটা মাথার রাখেন না? কনট্রাক্ট যে এখন বাতিল করারও উপায় নেই। বোর্ড মিটিংএ পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যাটা কি সুযোগ নিচ্ছে আমাদের ওপর? অবশ্য ফ্যাকরা বাধিয়ে দিতে আটকাবে না। কিন্তু তাতে নিজেদের লাভ কি? নির্বিঘ্নে কাজ গুছিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।···মিষ্টার গুপ্ত স্বাভাবিক উৎকণ্ঠায় বিরক্তি বোধ করলেও ধৈর্য ধরেই রসিকতা করতে চেষ্টা করেন, ফুর্তিটুর্তি আজকাল কেমন হচ্ছে শেঠজী?

কিষেনলাল খুশি হতে পারে না। বাগান বাড়ীতে জয়া আছে। সেখানে আর এ আপদগুলোকে নেওয়া যাবে না! একবার উৎসাহ পেলে রোখা দায়।···ঔদাসীন্য নিয়েই জবাব দেয়, কি করে আর ফুর্তি করি বলুন! বিজিনেসের অবস্থা বড্ডো 'ডাল্'।

মিষ্টার গুপ্তর মুখ শুকিয়ে ওঠে। পাওনা গণ্ডা বোধ হয় ফাঁকি দেবার মৎলব করছে শয়তানটা। তবু কৃত্রিম হাসি রেখেই প্রত্যুত্তর করেন, আপনার আবার বিজিনেসের ভাবনা? আমাদের বাদ দিয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন বলুন?

কিষেনলাল চমকে ওঠে। শকুনটা কি ভাগাড়ের গন্ধ পেয়েছে নাকি? তবু শালিনতা রক্ষা করেই উত্তর দেয়, না না, আপনাদের বাদ দিয়ে করে কি করেছি বলুন? আজকাল আর ওসব ভাল লাগে না।

মিষ্টার গুপ্ত মিট মিট করে হাসতে থাকেন। প্রসঙ্গ চালিয়ে যাওয়ার মত আর কোন ভাষা খুঁজে পান না। আভাসে ইঙ্গিতে এর চেয়ে বেশী আর কি করে বলা যেতে পারে?···ব্যাটা দেখছি শেষ পর্যন্ত ডুবাবে।··· মনের দুঃখ মনেই চাপা দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। ভেবে পান না কি প্যাঁচ কষে কিষেনলালকে পথে আনা যায়। ব্যাটা স্বচ্ছন্দে বিদায় দিচ্ছে, অথচ টাকার কথা ভুলেও মুখে আনছে না।···গভীর উদ্বেগে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন মিষ্টার গুপ্ত। শুধু পথে একবার রামলোচনবাবুকে স্মরণ করিয়ে দেন, কই মশায়, আমাদের কি করলেন?

মনটা আজ তাদৃশ ভাল নেই রামলোচনবাবুর। মিষ্টার গুপ্তর কথা সহসা বুঝে উঠতে পারেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। লজ্জায় ক্ষোভে গজ গজ করতে করতে ছুটে যান 'লিফটের' ওপর। ক্ষণকাল পরেই স্মরণ হয় রামলোচনবাবুর, তাইত', মিষ্টার গুপ্তকে পাঁচ হাজার টাকা দেয়ার কথা ছিল। উনি বোধ হয় সেইটেই মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন। যে মানুষ, সব কিছু ভণ্ডুল করে দিতে কতক্ষণ?··· কিন্তু করাই বা যায় কি? শেঠজী যে একবারও টাকার কথা মুখে আনলেন না! মেজাজেরও যেন আজ কি হয়েছে? সব কথাতেই রেগে উঠছেন। যার টাকা তাকে না জিজ্ঞেস করে দেওয়াই বা যায় কি করে?···খানিক ইতস্তত করে চেম্বারে প্রবেশ করেন রামলোচনবাবু। রিভল্‌ভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে গভীর ভাবে কি যেন ভাবছিল কিষেনলাল। সহসা বিরক্তিতে চোখ তুলে তাকায়।

রামলোচন ঘাড় চুলকিয়ে বলতে থাকেন, আজ্ঞে, মিষ্টার গুপ্তকে টাকাটা দেওয়া হ'ল না···

কেন দেওয়া হ'ল না? কি করেন আপনি সারা দিন?···গর্জে ফেটে পড়ে কিষেনলাল।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে রামলোচনের। দীর্ঘদিন আছেন, কখনও

কিষেনলালের এরূপ কর্কশ উক্তি শোনেননি। আজ হ'ল কি ?···আমতা আমতা করেই পুনশ্চ বলতে যান, আজ্ঞে···

থামুন, যত সব অপদার্থের দল। যান, এই মুহূর্তে নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসুন। কাজ পণ্ড হলে আপনি দায়ি।

রামলোচন তবু খানিকটা ইতস্তত করতে থাকেন।

পুনশ্চ ঝাঁঝিয়ে ওঠে কিষেণলাল, যান, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? জানেন না, টাকা ছাড়া ওরা কোন কথাই কয় না ? ··

আজ্ঞে, আপনি আসার আগে উমাদেবী আপনাকে তিনবার ফোন করেছিলেন। পৌঁছেই আপনাকে ফোন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

কিষেনলাল সহসা কেমন যেন হকচকিয়ে ওঠে। পরে নিজেকে কিঞ্চিৎ সামলিয়ে নিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দেয়, আবার ফোন করলে বলে দেবেন, তার সঙ্গে কথা বলার মত সময় আমার নেই। ও-সব বাজে কথা থাক, আপনি তাড়াতাড়ি ঘুরে আসুন, আমাকে আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে।

রামলোচন বুঝে উঠতে পারেন না, যে উমাদেবীকে আপিস [illegible] প্রতিমাসে নিয়মিত 'ডোনেশন' দেওয়া হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যার সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে রসালাপ চলে, তার প্রতি এ বিতৃষ্ণা কেন ? বিমূঢ়ের মতই ভাবতে ভাবতে চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ কেটে গেলে পুনরায় কলিং বেল টিপে কিষেনলাল।

চাপরাসী সেলাম করে এসে দাঁড়ায়। তলব হয় শৈলেন, সুরেনের। গত রাত্রের স্যাঙাত দু'টোর। ফিরে এসে জানায় লছমন সিং, অভি তক্ আয়া নেই বাবুলোক।

বেলা প্রায় একটা বাজতে চলেছে এখনও আসেনি বদ্‌মাশরা ! আপন মনেই গজরাতে থাকে কিষেনলাল। রামলোচন এখনও টাকা দিয়ে ফিরে আসেননি। নিজেই ছুটে গিয়ে সমস্ত আপিস ভিজিট্ করতে,

শুরু করে। কেঁপে ওঠে কেরাণীকুল। কোণের টেবিলে দু'জনবাবু বসে একটু হাসি-গল্প করছিলেন। কিষেনলাল ছুটে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করে। জবাবে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সাস্‌পেণ্ড করে উভয়কে পনর দিনের জন্য। একি স্বেচ্ছাচার! সহজ সরলভাবে সকলেই কাজ করে আসছে। অতটুকু শৈথিল্য দেখায়নি কেউ কোনদিন। দুর্দিনে মাইনে কাটা গেলে খাবে কি? কি এমন অপরাধ করেছে ওরা। কাজের ফাঁকে একটু জিরিয়ে নেবে না মানুষ? চাপা অসন্তোষ ফুলে ফুলে ঠেলে ওঠে আপিসময়। কিষেনলাল ক্রোধে গজ গজ করতে করতে চেম্বারে ফিরে আসে। টেলিফোন বেজে ওঠে ক্রিং ক্রিং শব্দে। রিসিভারটা কানে দিয়েই বিরক্তিতে রেখে দেয় তৎক্ষণাৎ। উমাদেবী ফোন করছিলেন, ন্যাকামীতে ভরা।

টাকা দিয়ে ফিরে এসেছেন রামলোচন। থম থম করছে সারা আপিস ভয়ে। কিষেনলাল তলব করে জানিয়ে দেয়, শৈলেন, সুরেন এলে তার সঙ্গে দেখা করে যেন হাজিরা খাতায় সই করে। এত দেরীতে আসা চলবে না।···রামলোচনবাবু হতে আরম্ভ করে বেয়ারা, চাপরাসী, কেরাণী সকলেই হতবাক হয়ে যায় কিষেনলালের ধকলে। এতদিন কাজ করে আসছে এরূপ ভয়াল রূপ কেউ কোন দিন দেখেনি। আজ নিজে কোথাও অপদস্ত হয়ে এসেছে কি!···মৃদু কাণা-ঘুষা চলে এ-ও-তার মধ্যে। শৈলেন, সুরেন সর্ব কাজের দোসর, জানলে হয় ব্যাপারখানা কি? সাহসে নির্ভর করে টেবিল গরম করে নির্মল। পরেশ সম্মতি জানায়, চেষ্টা করবে।

বেলা প্রায় দেড়টা। পান চিবুতে চিবুতে হাজির হয় শৈলেন, সুরেন-মাণিকজোড়। আপিসের কোন গুরু কাজের ভার ন্যস্ত নয় ওদের ওপর। শেঠজীর প্রাইভেট সঙ্গী। ইচ্ছে হ'লে কিছু করে, নয় ত' এটেবিল ওটেবিলে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। নির্ভয়ে হাজিরা খাতা খুলে সই করতে উদ্যত হয় দু'জনে। রামলোচনবাবু বাধা দিয়ে শেঠজীর চেম্বারে পাঠিয়ে দেন।

টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে কি যেন ভাবছিল কিষেনলাল। সহসা সাঙাত দ্বয়ের উপস্থিতিতে গর্জে ওঠে, ক'টা বাজে ?

হেঁয়ালি করেই জবাব দিতে যায় সুবেন, আজ্ঞে, কালকের নেশাটা…

চুপ রাও উল্লুক।

হকচকিয়ে যায় উভয়ে। কি বলবে ভেবে পায় না। পাড়ার ·ামা শ্যামাকে জুলুমবাজীর ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখা সম্ভবপর হলেও কিষেনলালের সঙ্গে টু শব্দটি করার জো নেই। দারগা পুলিশ সব হাতে। কোন মুহূর্তে ঠেলে দিতে পাবে শ্রীঘব, নয়ত' হাজতে।…অসহায়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে মুখেব দিকে। বুঝে উঠতে পারে না কি এমন অন্যায় কবেছে। দেরী কবে ত' রোজই আপিসে আসে। এমন কি না এলেও কোনদিন মাইনে কাটা যায়নি কিংবা কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি, তবে ? কাল ত' দিল খুব খুশি দেখেই ফিরেছে !

কিষেনলাল তাড়াতাড়ি মণিব্যাগ খুলে উভয়কে একশ' টাকার একখানি করে নোট ছুড়ে দিয়ে পুনরায় গর্জে ওঠে, এই নে, এখান থেকে দূর হ'। কাল থেকে যেন তোদের মুখ না দেখি।

কি হবে সামান্য এই টাকায় ? এত ডাটের মাথায় চলেছে। ভাল খেয়েছে পরেছে…পা জড়িয়ে ধরতে যায় উভয়ে কিষেনলালের। টস্ টস্ করে দু'গাল বেয়ে জল গড়াতে থাকে। দোষ ত্রুটি বুঝে উঠতে না পারলেও ধরে নেয়—মহা অপরাধ করেছে।

ঝাঙটা দিয়ে পা সড়িয়ে নিয়ে পুনশ্চ কলিং বেল টিপে কিষেনলাল। বামলোচন ছুটে এলে নির্দেশ দেয়, ওদের এক মাস করে মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিন। এত দেরীতে আপিসে আসা চলবে না।

বেচারা রামলোচন অপরাধের গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেন না। বড় মায়াবী মানুষ। কেউ ভাতে মারা যায় সহ্য করা কঠিন তাঁর পক্ষে। কিন্তু উপায় নেই। প্রতিবাদ করা ত' দূরের কথা অনুনয় বিনয় করতেও সাহস

পানু না। নিরুন্তর চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। শৈলেন, সুরেনকেও আসতে বাধ্য করা হয়। সংবাদে সমস্ত আপিস বিচলিত হয়ে ওঠে। কেউ ভেবে পায় না কি এমন ব্যাপার ঘটেছে। নির্মল ক্ষীণ শ্লেষে পুনশ্চ টেবিল গরম করে, ওসব ব্যাপার ট্যাপাব কিছু নয়। আসল কথা ভাল যোগান দিতে পারেনি। দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বুঝলিনে, পিরিতের ঝগড়া।

বেলা তিনটে আন্দাজ কিষেনলাল মোটব নিয়ে বেরিয়ে যায়। আপিসময় ধূমায়িত হয়ে ওঠে অসন্তোষেব চাপা গুঞ্জরণ। না, এরূপ অন্যায় জুলুম চলবে না। রুখে দাঁড়াতে হবে সকলকে।···বৃদ্ধ রামলোচন মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। আশ্বাস দেন মিটিয়ে দেবেন।

ফোন আসে শেঠজীর বাসা থেকে। কিষেনলাল দুপুবের খানা খায়নি এখন পর্যন্ত। মাইজী অপেক্ষা করছেন।

রামলোচন সবিনয়ে জানিয়ে দেন তার অনুপস্থিতির কথা।

ঘড়িতে পাঁচটা বেজে চলে। কেরাণীকুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বেরিয়ে যায় আপিস ছেড়ে। অসন্তোষে মুখরিত।

চব্বিশ

সান্ধ্য প্রসাধন শেষ করে উমাদেবী তৈরী হচ্ছিল শেঠজীর সঙ্গে আপিসে দেখা করবার জন্য। তিন তিনবার ফোন করেও সাড়া মিলেনি। সর্বশেষ যদিও বা ধরল সময় হবে না বলেই ঝা করে ছেড়ে দিল। এতদিন কেটেছে, এরূপ তাচ্ছিল্য কখনও চোখে পড়েনি। কি এমন কাজ যে এক মিনিট কথা বলার সময় হ'ল না! জয়ার কাছে কি খুব জব্দ হয়েছে মেড়োটা? আর তাই যদি হয়ে থাকে তাতে আমার দোষ কি? যে পুরুষ, কাছে পেয়েও মেয়ে মানুষকে বশ করতে পারে না তার আবার পৌরুষত্ব কি? অপমানই তার প্রাপ্য। আমি আমার কথা রেখেছি, উপযুক্ত দক্ষিণা চাই···সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্রায় নীচে নামবে এমন সময় হুস্ করে এসে সদরে গাড়ী লাগে। চেনা আওয়াজে খুশি হয় রেলিংএ ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গে কোন উৎপাত নেই। একাকীই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। শেঠজী দেখছি ভুলে যায়নি।··· বকশিশের আশায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে উমা। জয়া তাহলে বশ মেনেছে। কিন্তু অত রুক্ষ দেখা যাচ্ছে কেন কিষেনলালজীকে? বকুল গাছ তলায় কি···না না, ফুটফুটে মেয়েটা, বেঁচে থাকলে যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবে।

অসম্ভব গুরুগম্ভীর আজ কিষেনলালের মেজাজ। উমাদেবীর স্বভাব সুলভ হাসি ঠাট্টায় বিশেষ কোন সাড়া শব্দ দেয় না। উঠেই ভারিক্কী গলায় প্রশ্ন করে, খোকা কোথায়?

এক ঝলক হাসি হেসে টেনে টেনে উত্তর করে উমা, তবু ভাগ্যি যে শেঠজীর মুখে কথা ফুটল! আমি ত' ভেবেছিলাম···

বাজে কথা শুনবার সময় নেই। খোকা কোথায় বল?

আপনি থেকে সহসা তুমি। উমাদেবীর বুকে শেলের মত বিঁধে। তবু হাল্কা ভাবেই উত্তর করে, সারা রাত জেগে দেখছি মেজাজের ঠিক নেই। একটু সরবৎ করে দেবো ?

না না, সরবতের প্রয়োজন নেই। জলদি খোকাকে এনে দাও··· ঝাঁঝাল কণ্ঠে পুনশ্চ বিরক্তি প্রকাশ করে কিষেনলাল।

উমা আহত হলেও অধিকতব হাল্কাভাবেই প্রত্যুত্তর করে, কেন, পুষ্যিপুত্তুর নেবেন নাকি ?

সে খোঁজে তোমাব কাজ নেই। যা বলছি শোন।

তা ত' থাকবেই না। পুরুষ মানুষগুলো এমনি বেইমান বটে। কাজের সময় কাজী কাজ ফুরুলে পাজি।

সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে কিষেনলালের। মনে হয় গলা টিপে মেরে ফেলে ছিনালটাকে। তবু ধৈর্যেব মাত্রা রেখেই পুনরায় শাসিয়ে ওঠে, ওসব বাজে কথা রেখে ভালয় ভালয় ছেলেটাকে দিয়ে দাও বলছি। নইলে···

নইলে কি ?···ফনা বিস্তার করে কর্কশভাবেই প্রশ্ন করে উমা।

নইলে যে কি তা তুমিও জান আমিও জানি।

জানি, আপনি পুলিশ ডাকবেন এই ত' ? কিন্তু আমিও ছেড়ে কথা কইব না। চীৎকার করেই সকলকে জানিয়ে দেব, একজন উদ্বাস্তু মেয়েকে···

আঃ চুপ কর···গর্জে ফেটে পড়ে কিষেনলাল।

কেন, কেন চুপ করব ? কি কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে ?···ধৈর্য হারিয়ে রুখে দাঁড়ায় পুনশ্চ উমা।

যে কথাই হয়ে থাক। খোকাকে এখন তুমি কিছুতেই পাবে না।

পাব না মানে ? আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।···পট পরিবর্তন করে মুচকী মুচকী হাসতে থাকে মনোমোহিনীর হাসি।

কিষেনলাল আঁৎকে ওঠে। এক রাত্রের মধ্যেই কি রাক্ষুসী বেচে খেল

সোনার চাঁদ ছেলেটাকে ! সহসা আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না। অবসন্ন দেহে বসে পড়ে সোফাটার ওপর।

উমাদেবী অধিকতর হাস্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, ওসব বাজে কথা নিয়ে মন খারাপ করছেন কেন বলুনত' ? কাল কেমন ফূর্তি হ'ল ?

দপ দপ করে জ্বলে ওঠে দুটি শ্বাপদের নয়নতারকা। ছেলেটাকে শেষ পর্যন্ত বেচে খেল রাক্ষুসী ? না না, এক রাত্রের মধ্যে কিছুতেই সম্ভবপর হয়নি। পুনরায় বিনীত ভাবেই অনুরোধ জানায় কিষেনলাল, মিস ব্যানার্জি, তুমি যত টাকা চাও দিচ্ছি। ফিরিয়ে আন ছেলেটাকে।

কি বার বার তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাবছেন ? ক'টা ছেলে চাই আপনার ?

ক'টা নয়, শুধু ঐ একটা। তোমার হাতে ধবছি ব্যানার্জি···

আপনি দেখছি পাগল হয়ে গেলেন শেঠজী। ছুঁড়ীটার ধকল আছে বলতে হবে।

আঃ ভাল কথায় কাজ হবে না দেখছি···আসন ছেড়ে উঠে আসে কিষেনলাল পুনরায়।

উমা কিঞ্চিৎ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। দূর থেকেই অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে, ভাল কথা বলছেন কই ? বললুম, দু'টো প্রেমের কথা বলুন, তা না যত সব বাজে কথা।

কি, বাজে কথা ? বল্ রাক্ষুসী ফিরিয়ে আনবি কি না ?···তেড়ে গিয়ে গলা টিপে ধরে কিষেনলাল উমার।

অপরিকল্পিত ঘটনা। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে ক্ষীণ নারী দেহ বলিষ্ঠ চাপে। চীৎকার করবারও উপায় নেই। কিষেনলালের কি সহসা খুন চেপেছে মাথায় ? অবশেষে আপন মনেই গলা ছেড়ে দিয়ে গজরাতে থাকে। ভাগ্যিস কাছে কেউ ছিল না ? কি লজ্জাতেই না পড়তে হ'ত তা'হলে ?···

মুক্তি পেয়ে হাঁইপাই করতে থাকে উমা। এমন সময় আছুরী

কোত্থেকে যেন খোকনকে কোলে করে এসে উপস্থিত হয়। সবলের সঙ্গে না পেরে—দুর্বলের ওপর গর্জে ওঠে সক্রোধে, হারামজাদী, ওকে তুই এখানে নিয়ে এলি কেন ?···বলতে বলতে ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরে খোকনকে। গালে দুই ঠোকনা দিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দেয় আন্নাকে।

কিষেনলালের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। রাক্ষুসী তা' হলে বেচে খায়নি ছেলেটাকে! কে জানে, আর একটু দেরী হয়ে গেলেই হয়ত সর্বনাশ হয়ে যেত। কাবুল, কান্দার কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলে সারা জীবন অসামাজিক জীবন যাপন করতে হ'ত বেচারাকে! এগিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই পুনরায় অনুরোধ করে, ওকে দিয়ে দাও ব্যানার্জি, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি।

উমাদেবীর মাথায় আজ যেন অপদেবতা ভর করেছে। কিছুতেই খোকনকে ছেড়ে দিতে রাজী হয় না। অসম্ভব জিদ বেড়ে যায়। খোকনকে বুকে চেপে পাশের ঘরে পালাতে চেষ্টা করে। কে জানে, কি চাপা আবেগ কেঁপে, কেঁপে উঠছে ঐ অশান্ত বুকে ? অতটুকু চীৎকার করে না খোকন। মায়ের বুকে মুখ গুঁজেই যেন চুপচাপ আছে।

কিষেনলালের আর ভাববার সময় নেই। তেড়ে গিয়ে ছিনিয়ে নেয় খোকনকে কোল থেকে। অসহায় নারী পেছন থেকে টেনে ধরে হাত পা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে অবিরত। দানবের থাবায় চীৎকার করে ওঠে দুধের শিশু। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কিষেনলালের। সজোরে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। শান্তি দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে হাসছিল। মুহূর্তে গাড়ী অদৃশ্য হয়ে যায় বরাহনগরের পথে।

পঁচিশ

জয়ার মনের অবস্থা ভাল নয়। প্রচণ্ড একটা ঝড়ে সমস্ত ওলট পালট হয়ে গেল। কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন খেতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি। হৃদয়ের গুরুভার বার বার উৎক্ষিপ্ত করে তুলছে। আঁচলে মুখ লুকিয়ে নীরবে কেঁদেছে অনেকক্ষণ। খোকনকে কি আর ফিরে পাওয়া যাবে? ঘৃণ্য শয়তানের সঙ্গে বাস। পেয়েই বা লাভ কি? মানুষ করবে কি করে? আজ মনে হয়, কেন নিরাপত্তার মোহে পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসেছিল? সেদিন যদি ভুল না করত তাহলে আজ আর পথ-কুকুরের তাড়া খেতে হত না। আপন ঘরেই সুখে দুঃখে কাল কাটাতে পারত। যে পশুর লাঞ্ছনায় স্থান ত্যাগ করে এসেছিল সে পশু এখানেও অভাব নেই।···অলক্ষ্যে ঝরে পড়ে বেদনাশ্রু। খোকার মা আবার এদিকেই আসছে। বন্দী জীবনে কাঁদবারও উপায় নেই। চোখ মুছে কৃত্রিম উৎফুল্ল হয়ে ওঠে জয়া। সন্ধ্যার পূর্বেই হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় পাল্টে নিতে হবে। কিষেনলালকে ভুলাতে হবে। নারীর মনোমোহিনীরূপ। দানব বধের হাতিয়ার।···

মালিনী মাসী আলো জ্বেলে দিয়ে যায়। সঙ্গে এক পেয়ালা চা ও জলখাবার। খেতে হবে বৈকি। বাঁধ যখন ভেঙে গেছে তখন আর মিছে আত্মাভিমানে লাভ কি? ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে খেতে উদ্যত হয় জয়া। খিল খিল করে হেসে ওঠে খোকন। হাত বাড়িয়ে দেয় বিস্কুট দুটোর দিকে। রাক্ষুসী উমা, সামান্য দু'টো বিস্কুটও দেয়নি সারাদিনে! বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে। বিস্কুট দু'টো নামিয়ে রেখে শুধু চা'টাই খেয়ে নেয়। হিমেল দেহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

কিষেনলাল, কিষেনলাল, কত শক্তি ধরে শয়তান? পারবে না কি সংগ্রামে জয়ী হতে?...

নিঝুম নিস্তব্ধ-পুরী। মালী, চাকর সকলেরই ছুটি হয়েছে। সদরে শুধুমাত্র দরোয়ান। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় জয়া। কুয়াশাচ্ছন্ন চতুর্দিক। নক্ষত্রে নক্ষত্রে ছেয়ে গেছে অনন্ত আকাশ। কিন্তু বাগান বাড়ীর কোথাও যেন এতটুকু আলো নেই। থম থম করছে ঘন অন্ধকার। বড় ভয় করে জয়ার এ ভৈরবী নিশাকে। কে জানে, মাতালটা আজ আবার কি মূর্তিতে দেখা দেবে? আজও যদি উৎপীড়ন শুরু করে? মদের কি উগ্র গন্ধ! গা পাক দিয়ে ওঠে।...নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা কি বাহ্যিক একটা খেয়াল, না মনঃপীড়া? দুর্জনের ছলের অভাব নেই। তাছাড়া মুক্তি নিয়ে কি করবে ও? অশুচি পুষ্পে দেব পূজা সম্ভব নয়। জীবনব্যাপী জ্বালা। না না, একি দুর্বলতা? কিষেনলালের দয়া দাক্ষিণ্য ত' কাম্য নয়। কঠোর প্রতিজ্ঞা রয়েছে। যে যন্ত্রণা জীবনে সহ্য করেছে পৃথিবীতে যেন কোন নারীকে আর সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না হয়। শক্ত হয়ে দাঁড়ায় রেলিংএ ভর করে। কন কনে হাওয়ায়ও চোখ কান গরম হয়ে ওঠে। মালিনী মাসী আবার এক বাটি গরম দুধ নিয়ে এসে রসিকতা করে, আসবে গো, আসবে। আর মুখ ভার করে থাকতে হবে না। এটুকুন খেয়ে নাও দিখি!

জয়া মৃদু হেসেই হজম করে যায়। অভিনেত্রীর জীবন। রাগ দেখাবার উপায় নেই। হাসিতে হাসিতে বশীভূত করতে হবে কিষেনলালকে। বাটিটা টেনে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে দেয়। সহজভাবেই বিদেয় হয় মালিনী মাসী। গভীর ভাবে ভাবতে থাকে জয়া।

সদরে মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। মাত্র দু'দিনেই চেনা হয়ে গেছে আওয়াজ। শয়তানটা আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরল! আশঙ্কায় কাঁপতে

থাকে বুকের ভেতর। আরও কোন ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ী মুহূর্তে এসে লাগে বাংলোর গায়ে। হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে আলো জেলে দেয় ড্রাইভার। জয়ার চোখ ধাঁধিয়ে ওঠে। কে—কে ও ওখানে? খোকন—খোকন···তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় নীচে। কিষেনলাল ওকে কোলে করে ওপরে আসছিল। লুফে নেয় জয়া নিজের বুকে। সংকোচ নেই—দ্বিধা নেই। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় কপোল অধর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হাসতে থাকে কিষেনলাল। একটু দম নিয়ে অনুরোধ করে, ঠাণ্ডা পড়েছে, ওকে নিয়ে ঘরে যাও।

সম্বিৎ ফিরে পায় যেন সহসা জয়া। আশ্চর্য হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কই বেসামাল মনে হচ্ছে না ত? কোন দুর্গন্ধও ভেসে আসছে না। সাঙাত দুটোও সঙ্গে নেই। রাতারাতি খোলস পালটাল কি শয়তান?

বেশী কিছু ভাববার অবসর না দিয়েই কিষেনলাল পুনশ্চ বলে, আজ তা'হলে আসি বিবি সাহেবা। বড্ডো রাত হ'য়ে গেল। কোন ভয় নেই তোমাদের। এ শেঠ কিষেনলালের বাগানবাড়ী। ভুলেও কেউ এ-মুখো হবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পার।

জয়া অধিকতর অবাক হয়ে যায়। কি যে উত্তর দেবে কিছুই ভেবে পায় না। খোকার মা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বিনীতভাবে অনুরোধ করে, কিছু খেয়ে যাবেন না? একটু চা করে দিই?···

না, আজ আর সময় নেই। সারাদিন বাসায় যেতে পারিনি।

সারাদিন তাহলে কিছু খাননি?···বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে জয়া।

কই আর সময় পেলাম? আর একটু দেরী হয়ে গেলেই হয়ত রাক্ষুসী তোমার ভাইটাকে চিবিয়ে খে'ত।

জয়া শিউরে ওঠে। খোকনকে বুকে চেপে পুনর্বার অনুরোধ জানায়, না, না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।···

কিষেনলাল হাসি মুখেই বাধা দেয়, ঘরে হয়ত না খেয়ে আছে বিবি সাহেবা। আর দেরী করা উচিত হবে না।···

জয়া আর জোর দেখাতে সাহস করে না। মনে মনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই কি গতরাত্রের কিষেনলাল, বেহুস মাতাল!···

খোকার মাকে আর একবাব সতর্ক করে দিয়ে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে কিষেনলাল। কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ নেই। জয়া অবাক হয়ে খানিক পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ছাব্বিশ

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরলে অবাক হয়ে যায় বিজয়া। সহসা আন্দাজ করে উঠতে পারে না এ কোথায় এসে পড়েছে। হাসি, দীপ্তিইবা গেল কোথায়? সকলে ত' এক সঙ্গেই বেড়াতে বার হয়েছিল, তবে? শঙ্কায় কাঁপতে থাকে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। উৎকণ্ঠায় চেয়ে থাকে শুশ্রূষারত পৌঢ় ভদ্রলোকটিব মুখের দিকে।

আনন্দমোহনবাবুর মুখ মণ্ডল খুশিতে ভরে উঠেছে। গত রাত্র—বড় দুর্ভাবনার মধ্যে কেটেছে। ভাগ্যিস করিম সাহেব সঙ্গে ছিলেন! নয়ত একা একা খুবই মুস্কিল হত। ভোর না হতেই ছুটতে হয়েছে বেচারাকে। সারা রাত এক মুহূর্ত্ত চোখ বুজতে পারেননি। সকাল আটটায় হাওড়া ময়দানে মিটিং। আশুেস মিলের কর্তৃপক্ষ যদি ঘরোয়া মীমাংসায় রাজী না হন তাহলে ধর্মঘট অনিবার্য। আজ ময়দানের মিটিংএর পরেই নোটিশ দিতে হবে। ইউনিয়ন প্রেসিডেণ্টের গুরু দায়িত্ব।

ধীরে ধীরে সব মনে পড়তে থাকে বিজয়ার। লজ্জায় ক্ষোভে উদ্বেগ বোধ করে। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না। কেঁপে কেঁপে ঠোঁট বন্ধ হয়ে আসে। ভৃত্য গদাই আনন্দমোহনবাবুর ইশারায় এক বাটি গরম দুধ এনে হাজির করে। মেসবাড়ী। সহায়তা করবার দ্বিতীয় কেউ নেই। সাংবাদিক সতীনাথ সঙ্গী হলেও উপস্থিত সে কোলকাতার বাইরে আছে। দ্বিতলে আরও কয়েক ঘর ভাড়াটে আছে। কিন্তু তাদের খাওয়া থাকার পৃথক ব্যবস্থা। এমন কি কল জলের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঁচ মিশেলি লোকের সঙ্গে বাস করে লেখা পড়ার চর্চা হয় না। সতীনাথ বয়সে নবীন হলেও সংস্কৃতিগত মিল আছে। কর্মস্থলও উভয়ের এক-ই পত্রিকা আপিস। সুতরাং সঙ্গী হিসেবে সে বাঞ্ছনীয়। রাজনীতি গত আদর্শও উভয়ের অভিন্ন। ঘর দু'খানি বড় হলেও তৃতীয় ব্যক্তির ঝামেলা নেই। রাশি রাশি বই আর পত্র পত্রিকায় স্তুপিকৃত। মাঝে মাঝে দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব অতিথি হয়ে থাকেন বটে। তবে তাদের নিয়ে কোনরূপ হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। সকলেই উদার চরিত্র, শিক্ষিত। করিম সাহেব আনন্দমোহনের সতীর্থ ও সহকর্মি। লাঞ্ছিত শোষিত মানুষের মুক্তিই তার জীবনের মূলমন্ত্র। আজীবন ব্রহ্মচারী। অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কারাগার আর অন্তরিণ অবস্থায়। কিছুদিন যাবৎ ছাড়া আছেন। কৃষক, শ্রমিক, মজুর নিয়ে চলেছে নবীন যাত্রা। সুতোর কল, পাটকল, কয়লার খনি ও চা বাগানে অষ্টপ্রহর ছুটোছুটি।

গদাইয়ের হাত থেকে বাটিটা টেনে নিযে সস্নেহে অনুরোধ করেন আনন্দমোহন বাবু, এ-টুকুন খেয়ে নাওত মা?

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে বিজয়ার। কাল কখন সেই দুপুরে একবার খেয়েছিল। সারা রাত্রের ধকল গিয়েছে। পেটের ভেতরকার নাড়ী-ভুড়ীগুলো যেন জট পাকাতে শুরু করেছে। তবু আনন্দমোহনবাবুর অনুরোধে তেমন সাড়া দিতে পারে না। গোটা অতীত ভয় দেখাতে থাকে।

যদি এখানেও কোন ষড়যন্ত্র থেকে থাকে? উৎকণ্ঠায় কোকিয়ে ওঠে, না না, আমি কিছু খাব না। ছেড়ে দিন আমাকে আপনারা···উত্তেজনায় উঠে বসতে যায়।

আনন্দমোহনবাবু ক্ষীণ হেসে পুনশ্চ অনুরোধ করেন, বেশ, তাত যাবেই। আগে এইটুকুন খেয়ে সুস্থ হয়ে নাও, তারপর। শরীর যে অত্যন্ত দুর্বল।···দরদ ঝরে পড়ে কণ্ঠস্বরে।

বিজয়া ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মুখের দিকে।

আনন্দমোহনবাবু বাঁ হাত দিয়ে মাথাটা ঈষৎ তুলে ধরে ধীরে ধীরে খাইয়ে দেন দুধটুকু। তোয়ালে দিয়ে মুখটা পুছিয়ে দিয়ে তেমনি উদাত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, কোথায় যাবে বলত?

বিজয়া কোনরূপ উত্তর দিতে পারে না। পূর্ববৎ চেয়ে-ই থাকে।

দরদ বিজড়িত কণ্ঠেই পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কাল তোমার কি হয়েছিল? কোত্থেকে আসছিলে?

বুকে যেন একটু বল পায় বিজয়া। ঠিক যেন ওর বাবার কণ্ঠস্বরেই ভদ্রলোক কথা বলছেন। বালিশে মাথা গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অবাক হয়ে যান আনন্দমোহনবাবু। এমন কি হ'ল মেয়েটির? কথা বলতে পারছে না? হতভাগিনী নয়ত'? দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে?···বেশী বিরক্ত করে কাজ নেই। একটু জিড়িয়ে নিক বেচারা।···ছেড়ে কিছুতেই দেওয়া যায় না।···মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পুনরায় আশ্বাস দেন, থাক মা বুঝেছি। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার সন্তান

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে মনটা হাল্কা হয়েছে বিজয়ার। এমন লোকের কাছে হৃদয়ভার খুলে না বললে জীবনে হয়ত' আর সুযোগ পাবে না। ধীরে ধীরে আদ্যোপান্ত বলে যায়। কে যেন বুকে হুল ফুটিয়ে

দেয় আনন্দমোহনবাবুর। নিদারুণ মর্ম যাতনা উপস্থিত হয়। যে পূর্ব-বাংলা একদিন সারা ভারতের গৌরবস্থল ছিল, যেখানকার মানুষ প্রাণদিয়ে একদিন স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, সেখানকার নরনারীর কি অসহনীয় মর্মবেদনা! বিভেদ আর বিচ্ছেদ দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে উভয় বঙ্গকে ধ্বংশের মুখে। সারা ভারতবর্ষই হয়ত' একদিন তলিয়ে যাবে পাপচক্রে। ভাগ করেই যখন স্বাধীনতা নিতে হয়েছে তখন বৃহৎ ভারত পারে না কি ক্ষুদ্র খণ্ডিত বাংলাকে আশ্রয় দিতে? ত্রিশ কোটি মানুষ কোন-ক্রমেই কি পারে না দেড় কোটি ভাইবোনকে আত্মীয় ভাবতে?…আনন্দ-মোহনবাবুর মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে। শিরা উপশিরায় বইতে থাকে উত্তপ্ত রক্তস্রোত। কিছুক্ষণ মৌন থেকে পুনরায় সান্ত্বনা দেন, কাঁদিসনে মা। আশ্রয় আমাদের খুঁজে নিতে হবে। কেউ সহজে ভাগ দেবে না। সারা দেশময় চলেছে নিষ্ঠুর শোষণ আর ধাপ্পাবাজী। মুক্তি আমাদের সংগ্রাম করেই নিতে হবে।…ঢং ঢং করে নয়টা বেজে যায় গীর্জার ঘড়িতে। আচম্বিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান, কলের জল চলে যাবার সময় হল মা, আমাকে স্নানে যেতে হয়। তোমার আর উঠে কাজ নেই। এখানেই মাথা ধুয়ে ভাত খেয়ে নাও।…বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। বিজয়া কতটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

সাতাশ

বেলা সাড়ে দশটা। আনন্দমোহনবাবু স্নানাহার সেড়ে আপিসে বেরিয়ে যান। বিজয়াকে নিজের কাছে বসিয়েই খাইয়েছেন। বৃথা দুশ্চিন্তা না করে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বই পড়া চলতে পারে। অনেক ভাল ভাল বই আলমারীতে সাজান আছে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়িই ফিরতে চেষ্টা করবেন। তবু ইতিমধ্যে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করে অসঙ্কোচে যেন গদাইকে বলে। তিনটার সময় পুনরায় চা জলখাবার দেওয়ার কথাও গদাইকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। সতীনাথের ঘরটিই নিরিবিলি। বিছানা যেন সেখানেই করে দেওয়া হয়।...সে ফিরে এলে না হয় উভয়ে কিছুদিন একসঙ্গেই বাস করবে। তবু দুর্বল শরীরে ভালরূপ বিশ্রাম প্রয়োজন।... এক পা'ও যেন বাড়ীর বাইবে না যায় গদাই ওকে একাকী রেখে। বড় ভয় পেয়েছে বেচারা।...

উভয়কে খাইয়ে দাইয়ে এটোবাসন মাজতে, রান্নাঘর ধুতে মুছতে, গদাইয়ের প্রায় বেলা একটা বেজে যায়। এক ফাঁকে বিজয়াকে বিছানাও করে দিতে হয়েছে। বড় অনুগত এই গদাই। আনন্দমোহনবাবুর আদেশ তার নিকট বেদবাক্য। বিজয়া অনেক করে পেড়াপীড়ি করেছিল, নিজের বিছানা নিজেই করে নিতে পারবে। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হয়নি। বড়বাবু শুনলে রাগ করবেন। তাছাড়া সামান্য এই কাজে আলস্যইবা আসবে কেন? অসুস্থ মানুষ, একটু সেবা যত্ন চাই বইকি?...বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তেল মেখে কলঘরের দিকে রওনা হয়। দু'টো খেয়ে নিয়ে আবার সময় মত চা জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। অসুখ শরীরে ঘন ঘন খিদে পায়। কি সুন্দর ফুট ফুটে মেয়েটি! কাল কি হয়েছিল কে জানে? গদাইয়ের দরদী মন বেদনায় ভরে ওঠে। ১৯৩১

সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে জেলে পরিচয়। লেখাপড়া ভাল জানত না। তবু স্বদেশ সেবার ডাক উপেক্ষা করতে পারেনি। নেতারা সকলকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন। গাঁজার দোকানে 'পিকেট' করার অপরাধে ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। আনন্দমোহন বাবুর উৎসাহে কারাগারেই লেখাপড়ার চর্চা আরম্ভ করে। ছ'মাসে বাংলা লিখতে পড়তে সক্ষম হয়। তাঁর সুপারিশে পত্রিকা আপিসেই পিয়নের কাজ পেয়েছে রাতের বিভাগে। এখানে রান্না বান্না করে, খাওয়া থাকা চলে, বাবুদের ও যত্নাদি হয়।...

বিজয়া এখন বেশ সুস্থ বোধ করছে। পড়ে পড়ে ঘুমোতে মন ওঠে না। গদাই স্নান করে আহারের যোগাড় করছিল। চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে রান্নাঘরের একপাশে এসে দাঁড়ায়। গদাইকে তার নিজের অপেক্ষা আরও একটি উৎকৃষ্ট ধরণের পারস সাজিয়ে ঢাকা দিতে দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, ওটা আবার কে খাবে গদাইদা ?

গদাই পেছন ফিরে অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে, তুমি আবার উঠে এলে কেন দিদিভাই ? বড়বাবু না চুপচাপ তোমাকে ঘুমোতে বলে গেলেন ?

বিজয়া স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর করে, শরীর এখন ভালই আছে। তুমি খেতে বস, আমি তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।...হাঁ, বললে না ত' ওটা কে খাবে ?

গদাই সহজ করেই প্রত্যুত্তর করে, করিম সাহেব।

করিম সাহেব ?...দু'চোখ বিস্ফারিত করে পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে বিজয়া। ঐশ্লমিক নামে বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে।

গদাই হাসি মুখেই উত্তর করে, হ্যাঁ দিদিভাই, কাল যদি তিনি উপস্থিত না থাকতেন, তাহলে বড়বাবু একাএকা তোমাকে নিয়ে মুস্কিলে পড়তেন। আমি ত' এখানে ছিলেম না। অমন ভাল মানুষ আর হয় না। সারা জীবন পরের জন্যই প্রাণপাত করলেন।

বিজয়ার তবু শঙ্কা দূর হয় না। বিমূঢ়ের মত' মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

গদাই বলেই চলে, দিদিভাই পারস সাজিয়ে রাখছি, কিন্তু খাওয়া হবে কি না ভগবান জানেন।

কেন?···

কেন কি? তাঁর কি সময়ের কোন ঠিক আছে? এক জায়গায় মিটিং করতে গিয়েছেন, সেখানে শেষ হতে না হতেই হয়ত অন্য জায়গায় ডাক পড়বে। অষ্ট প্রহর দৌড় ঝাপ্টা লেগেই আছে।

বিজয়া অধিকতর বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের মিটিং গদাইদা?

শ্রমিক মজুরের। অমন লেখাপড়া জানা মানুষ, ইচ্ছে করলে কত বড় চাকরী করতে পারতেন। অথচ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে—সারাটা জীবন মুটে আর মজুর নিয়ে কাটাচ্ছেন।

বিজয়া কেমন যেন থিতিয়ে পড়ে। কোনরূপ উত্তর দিতে পারে না।

গদাই আপন মনেই বলে চলে, আমি কত বলি, সাহেব, ওসব ছোট লোকের সঙ্গ ছেড়ে বিয়ে থা করে ঘর সংসার করুন। কিন্তু তিনি কি বলেন জান দিদিভাই?

কি গদাইদা?

বলেন গদাই, দুনিয়ায় কেউ ছোট নয়। আমরা ছোট করে রেখেছি, তাই ওরা ছোট। সুযোগ পেলে সকলেই বড় হতে পারে। উঁত মানুষ নন দিদিভাই, সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের বড়বাবুই কি কম?

বিজয়া কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। স্বীয় জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে গড়ে উঠেছে প্রবল এক বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। অথচ গদাইয়ের মুখ থেকে শুনছে সেই রকমই একজনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা। জীবনও নাকি বেঁচেছে তাঁরই অকৃপণ সেবা যত্নে।···সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে বিজয়া। গদাইয়ের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে। নিজের ঘরে ফিরে এসে আলমারী

খুলে ছোট্ট একটা পুস্তিকা বার করে। নূতন চীনের গণজাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কি অসম্ভব সম্ভব হয়েছে সেখানকার মাটিতে! মাত্র তিনটি বছর। গঠনমূলক কাজের কি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। প্রাণ চঞ্চল প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ গোটা জাতি।...পাঠ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে এ-আলমারী ও-আলমারী। সতীনাথের ঘরটি সত্যি মনোরম। ভদ্রলোক অসম্ভব পড়াশুনো করেন। রাশি রাশি বই। তাক, আলমারী, ডেস্কে ধরে না। একক ব্যক্তির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া বাজে একটি জিনিষও নেই। পাশাপাশি দুটি তক্তপোসের ওপর বিছানা ওল্টান। একটি বোধ হয় অতিথি অভ্যাগতের জন্য। গদাই ঝেড়ে পুছে সেইটেই পেতে দিয়েছে। আনন্দ-মোহনবাবুর ঘরটিও অনুরূপ ভাবেই সাজান। কেবল মাঝখানে একটা বৃহৎ গোল টেবিল অতিরিক্ত। চারদিক জুড়ে পাঁচ সাতখানা কাঠের চেয়ার। বন্ধু বান্ধব মিলে ঘরোয়া আলোচনা চলে। গত রাত্র বিজয়ার ওঘরেই কেটেছে। আজ পৃথক ব্যবস্থা হয়েছে। হয়ত' খুবই অসুবিধায় পড়েছে বেচারারা। কিন্তু উপায় কি? জোর করে না হয় চলে যেতে পারত' কিন্তু কোন পথের সন্ধান পেত কি? এখানে আর যা হোক, ভদ্র পরিবেশের মধ্যে এসে ঠাঁই পেয়েছে। হয়ত' পথের নির্দেশও পাবে।... মনে মনে অনেকটা খুশি হয় বিজয়া। পাঠ শেষ করে—ঘরদোর গুছাতে থাকে। কিছু কিছু কাজ করতে হবে বৈকি। ধূলোও জমে রয়েছে এখানে সেখানে। গদাইদা হয়ত' সময় পায় না। পুরুষ মানুষ সব কাজ কি গুছিয়ে করতে পারে? নিপুণ হাতের স্পর্শে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মা'কে ওরা দু'বোনেই ত' এদিক দিয়ে সাহায্য করে এসেছে।...খানিক বাদে গদাই এসে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, দিদিভাই, আমি না হয় তোমার মত কাজ জানিনে, তাই বলে অসুখ শরীরে এসব কি ভাল হচ্ছে?

বিজয়া মিষ্টি হেসেই উত্তর করে, অসুখ তুমি কোথায় দেখলে গদাইদা ? আর কাজ জান না তাই বা হবে কেন ?

না, অসুখ নয় ? কাল তোমার কি হাল গিয়েছে তা তুমি জান ? দেখো, বড়বাবু এসে কি রকম রাগ করেন ;

বিজয়া পুনশ্চ হেসে হেসেই রসিকতা করে, বেশ ত', তুমি বলো না তাহলেই হবে।

না বলবে না ! আর আমি না বললেই হবে কি না ? তিনি যেন দেখে বুঝতে পারবেন না ?

আচ্ছা নাও—এই আমি শুয়ে পড়ছি, হল ত' ?···বলতে বলতে বিজয়া বিছানার কাছে যায়।

গদাই প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যুত্তর করে, তা' যেন হ'ল, কিন্তু দিদিভাই, তুমি দু'চার মিনিট একা থাকতে পারবে না ?

খুব পারব। কিন্তু কেন বল ত' ?

তোমার জন্য কিছু খাবার আনতে যেতে হবে। সকালে ত' বাজার হাট তেমন হয়নি, সকলেই তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

না না, আমার মোটেই খিদে পায়নি। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

না, খিদে পায়নি ? তুমি দোরটা দিয়ে একটু বস। আমি যাব আর আসব।···উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে গদাই দোর খুলে বেরিয়ে যায়। বিজয়া ধীরে ধীরে উঠে এসে ছিটকানীটা দিয়ে দেয়।

আটাশ

খট্—খট্—খট্। খানিক বাদেই দুপুরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে জোরে কড়া নাড়া পড়ে। বিজয়া চেয়ারে বসে কি যেন পড়ছিল, ছুটে এসে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে। না না, গদাইদা ত' নয়। সুপুরুষ এক যুবক শ্রান্ত হয়ে কড়া নাড়ছেন। মনে হয় কোন দূর বিদেশ থেকে ফিরছেন ভদ্রলোক। সঙ্গে মুটের মাথায় হোল্ডল্, সুটকেস। পরনে ছাই রংয়ের বুসকোট। চামড়ার বেল্টের সঙ্গে কোমড় পর্যন্ত ঝুলছে বিলেতি একটা ক্যামেরা পৈতের মত। সপ্রতিভভাবে খানিক তাকিয়ে দেখে বিজয়া। কোন প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। যুবকও হতবাক হয়ে গেছে। আমতা আমতা করেই জিজ্ঞেস করে, গদাইদা নেই?

আজ্ঞে না, একটু বাইরে গেছে।

বড় মুস্কিল হল ত'?

বিজয়া বুঝে উঠতে পারে না কি করবে? নিশ্চয় গদাইদার ছোটবাবু হবেন। ভদ্রতার খাতিরে খুলে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু…বেশীক্ষণ হাবুডুবু খেতে হয় না বিজয়াকে। ছুটতে ছুটতে গদাই এসে উপস্থিত হয়! দূর থেকে সতীনাথকে দেখে গদ গদ কণ্ঠেই উল্লাস জানায়, ছোটবাবু যে। কতক্ষণ এসেছেন?

খুব আক্কেল যাহোক। বাড়ী ঘর দোর ফেলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

ঈষৎ হাস্যেই উত্তর করে গদাই, আমি ত' এই মাত্র বেরিয়েছি দিদি-ভাইয়ের জন্য কিছু খাবার আনতে।

তা ত' বুঝতেই পারছি। এখন বাড়ীর ভেতর যাবে, না রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোক জমাবে?

গদাই উচ্চস্বরে চীৎকার করে ডাকে, দিদিভাই দোর খোল। ছোট দাদাবাবু এসেছেন।

সতীনাথ হতবাক হয়ে প্রশ্ন করে, দিদিভাইটি কে গদাইদা ?

সে অনেক কথা, বড়বাবুর মুখে শুনো।

বিজয়া ছুটে এসে দোর খুলে দাঁড়ায়। গদাই মুটের মাথা থেকে মোট ঘাট নামিয়ে সম্মুখের ঘরেই রাখতে যায়।

সতীনাথ বিরক্তির স্বরে বাধা দেয়, এ ঘরে আবার কেন ? ওঘরেই নিয়ে যাও না ?

ও-ঘরে দিদিভাই আছে। তোমাকে দিন কতক এ-ঘরেই থাকতে হবে।

তাতে কি হয়েছে গদাইদা ? তুমি ও-ঘরেই নিয়ে যাও না ? আমিই না হয় এখানে থাকব খন।...হেসে হেসেই ভদ্রতা জ্ঞাপন করে বিজয়া।

ঘর-টরের ব্যবস্থা যা হয় পড়ে হলেও চলবে। .খুব ত পান খেয়ে ঠোঁট লাল করেছ। হাঁড়িতে কিছু আছে, না সব শূন্য ? বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু ?...গদাইকে উদ্দেশ্য করে বাধা দেয় সতীনাথ।

আমি ত' আর গণৎকার নই যে পারস সাজিয়ে রাখব ? সময় মত একটা খবর দিলেই পারতে ?

কি করে জানব যে স্বাধীন ভারতের গাড়ী সকাল আটটার জায়গায় বেলা একটায় এসে পৌঁছুবে ?

বিজয়া কি যেন বলতে যাবে, গদাই তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মনেই উত্তর করে, আচ্ছা যাও। চট করে স্নান করে এস, দেখি আমি কি করতে পারি !

তাহলে কিছু আছে বল ?

কিছু কেন, পুরোই আছে। করিম সাহেব যখন এখনও এলেন না, তখন আর তাঁর জন্য ভাত রেখে লাভ নেই। তুমি খেয়ে নাও।

যা বলেছ, আজ তিনদিন ভাত খাইনি। সাহেব এলে না হয় তাঁর প্রিয় খাবার চিড়ে দই-ই খাবেন খন। তুমি তাড়াতাড়ি জায়গা করগে। কলঘরে যাব আর আসব।

সতীনাথ ক্ষণমাত্র দেরী না করে উঠে যায়। গদাই রান্না ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

উনত্রিশ

আনন্দমোহনবাবুর মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত শুনেই সতীনাথ বুঝে নেয়, এই সেই বিজয়া, যাকে খুঁজে বার করবে বলে জয়াকে সে কথা দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে আজ স্বেচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে। শিশু ভাইটি হয়ত' আর বেঁচে নেই। জহ্লাদের অপঘাতে প্রাণ বলি দিয়েছে। অবোধ অপগণ্ড, তারও নিস্তার নেই প্রতিহিংসার কবল থেকে।···কিন্তু বিজয়াকে কাছে পেয়ে লাভ কি? যার হয়ে খুঁজেছিল সেই যখন নিখোঁজ হয়েছে তখন বৃথা আশা। জীবনে হয়ত' আর দেখা হবে না। স্বেচ্ছায় যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। নয়ত প্রশস্ত হাত বাড়িয়েই সাহায্য করতে চেয়েছিল। ধরে তুলতে চেষ্টা করেছিল আপন জনের সান্নিধ্য দিয়েই। কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে বেচারা। আঘাতে আঘাতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। বিজয়াও যে আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করতে পারবে তাই বা কে বলবে? সহানুভূতি থাকলেও সাহস করে তেমন এগুতে পারে না সতীনাথ। কে জানে, কখন আত্মমর্যাদায় ঘা দিয়ে বসবে?

বিজয়া অনেকটা হাল্কা হয়েছে। সহজ সরল ভাবেই মিশতে চেষ্টা

করে সকলের সঙ্গে। আনন্দমোহনবাবুকে দেবতার মতই সম্মান করে আসছে। তিনি কাকাবাবু। সতীনাথও শ্রদ্ধার পাত্র। বড় ভাল তার আচার নিষ্ঠা। সারাদিন শুধু কাজ আর রাশি রাশি বই পড়া। বোনের মত সেও স্নেহ করে। আপন জনের দরদ দিয়েই ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করছে সকল দুঃখ দৈন্য। জয়ার কথা বলি বলি করেও এ পর্যন্ত বলতে পারেনি সতীনাথ। বলার এতে আছেই বা কি? শুধু নিভে যাওয়া চিতেয় পুনরায় আগুন জ্বালা। না না, বেচারা ভুলে আছে ভুলেই থাক। আনন্দমোহনবাবু পুনরায় লেখা পড়া শুরু করতে বলে আসছেন। সেই ভাল। নিজের পথ নিজে বেছে নিতে পারবে। তবে এখানে থেকে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে না। কোন হোষ্টেলে পাঠাতে পারলে ভাল হয়। কতই বা আর খরচা? মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকার বেশী নয়। একাই সে চালাতে পারবে। উপরন্তু আনন্দমোহনবাবুও রয়েছেন। মেয়েটা স্বাভাবিক মেলামেশায় একটু প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক। এখানকার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মন টিকবে কেন?···ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যায় সতীনাথ। জয়াও কি এমনি চলতে পারত না? কি দরকার ছিল মিছে আত্মাভিমানের। ঠিকানা রয়েছে, একটা চিঠিও লিখতে পারত ত'। এমনও ত' কখন কখন হয় একদিনের পরিচয় থেকে অনন্ত জীবনের পরিচয়? একটা মুহূর্তের কি কোনই দাম নেই?

কথাটা খুলেই বলে সতীনাথ। কিন্তু বিজয়া কিছুতেই হোস্টেলে যেতে রাজী হয় না। লেখাপড়া করবে, আপত্তি নেই। তবে এ গৃহ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পরবে না। বয়সে নবীনা হলেও মানুষ চিনতে ভুল করেনি ও। হোস্টেলে না গেলে যদি পড়াশুনা না হয়, না হোক, তবু এ বাড়ী থেকে আর বেরুবে না। কে জানে, সেখানেও হাসি দীপ্তি থাকতে পারে? না না, কিছুতেই না।

আনন্দমোহনবাবু হেসে হেসেই সান্ত্বনা দেন, সতীনাথ তোমার ভালর

জন্যই বলছে, তা' যদি অপছন্দ হয়, কাজ নেই কোথাও গিয়ে। এখানে থেকেই লেখাপড়া কর। বোঝাটা হাল্কা হয়ে যায় বিজয়ার মাথা থেকে। প্রাইভেট আই, এ দেওয়াই স্থির হয়। সতীনাথ সাহায্য করবে। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে চলে রাশি রাশি বিশ্বভাণ্ডারের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ। জ্ঞানের প্রসারতা ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে স্বল্পকাল মধ্যে। আনন্দমোহনবাবু খুশি হন দীশক্তিতে। নিজেদের কাজের মধ্যেও টেনে নেন খানিকটা। সভা সমিতিতে পৌরহিত্যের ডাক এলেই বিজয়াকে সঙ্গে করে নিয়ে যান তিনি। বক্তৃতা মঞ্চে ঠেলে দিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু বিজয়া প্রথম প্রথম পেরে ওঠে না। সুমধুর কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীত আর সমাপ্তি সঙ্গীতেই ভুলিয়ে দেয় জনচিত্ত। বাসায় এসে মনে মনেই আওড়াতে থাকে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চলে মহড়া। বিশ্বের শেষ সংবাদের সঙ্গে রেখে চলে আত্মপরিচয়। বলতে পাবে এখন কিছু কিছু বিজয়া। করিম সাহেবের সঙ্গে প্রায়ই ওকে যেতে হয় খনি অঞ্চলে, চায়ের বাগানে, পাট কলে। নিয়মতান্ত্রিক পড়াশুনো ভাল লাগে না। পরীক্ষা দেওয়াও আর হয়ে ওঠে না। শিক্ষক সতীনাথের কোন ক্ষোভ নেই। বিজয়া যা শিখেছে তা অনেক কলেজে পড়া মেয়ে অপেক্ষা বেশী। শিক্ষা এবং কাজ কোনটাতেই তার অবহেলা নেই। স্বদেশ সেবায় মেতে উঠেছে রিক্তা নারী। আহার নিদ্রার সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

ত্রিশ

আজ দশদিন জয়া বাগান বাড়ীতে আছে। খাওয়া থাকার কোনরূপ ত্রুটি নেই। শিশু ভাইটিও যার পর নাই যত্নে আছে এখানে। জেগে থাকা কালীন খোকার মা এক মুহূর্ত কোল থেকে নামায় না। রাশি রাশি খেলনা, বিলেতী 'ফুড' পাঠিয়ে দিয়েছে কিষেনলাল। দামী দোলনা বিছানাও এসেছে। জয়া তবু যেন খুশি হতে পারে না। কেমন যেন পাশ কাটিয়ে চলতে চেষ্টা করছে কিষেনলাল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র আর একদিন এখানে এসেছিল। তাও ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। কল-ঘরে ছিল। যা বলার খোকার মাকে বলেই চলে গিয়েছে। অবশ্য হাট বাজারের কোন অসুবিধা নেই। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সবই কোলকাতা থেকে আসছে। কিন্তু সেইটেই কি সব? নিশ্চিন্তে ঘর সংসার করবার জন্যই কি এখানে আছে ও?…সংগ্রাম…কিষেনলালের সঙ্গে শুরু হবে ঘোরতর সংগ্রাম। শয়তান ভেবেছে খেয়াল খুশি মত নিজের কাজ করে যাবে! মানুষের জীবন মৃত্যু নিয়ে খেলবে গেণ্ডুয়া! না—না, তা' হতে পারে না। সম্মুখবর্তী হতে হবে তাকে। হিসেব-নিকেশ দিতে হবে প্রতিটি কৃতকার্যের।…জয়া স্থির থাকতে পারে না।…যা হবার হয়ে গেছে। তা নিয়ে মিছে ভেবে মরা চলবে না। কিষেনলালকে চাই। আজই—এই মুহূর্তে। কে জানে, কি মতলব আঁটছে শয়তান। ভেবেছে, ভাইটিকে কোলে দিয়ে ভুলিয়ে রাখবে। কিন্তু সে হবে না, কিছুতেই না।…উঠে গিয়ে খস্ খস্ করে জরুরী পত্র লিখতে বসে। কালই প্রত্যুষে চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। ফোন থাকলে এক্ষুনি ফোন করত। এক্ষুনি এই রাত্রেই উপস্থিত হতে। আর কতটুকু ক্ষতি করতে পারে সে? [redacted] হয়ত' মানুষ হবে না। না হোক, তাতেও ভাববার কিছু নেই।

পোড়া দেশে ক'জন শিশু মানুষ হবার সুযোগ পাচ্ছে। গাড়লগুলো সব ধন-দৌলত লুটে নিয়ে ভুঁড়ী বড় করছে। অন্যের সুযোগ কোথায়?...

দেয়াল ঘড়িতে আটটা বেজে যায়। খোকনকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পারিয়ে দিয়েছে মালিনী মাসী। শীতের রাত বড় একটা কম হ'ল না। জয়া এই বেলা খেয়ে নিলে ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। কিন্তু কে গিয়ে বলবে? যেভাবে চিঠি লেখায় ব্যস্ত! তা'ছাড়া মেজাজও যেন ক'দিন খিচিয়ে রয়েছে। মালিনীমাসী রান্নাঘরের এক কোনে বসেই হাই তুলতে থাকে। সদরে সহসা মোটরের হর্ণ শোনা যায়। চেনা আওয়াজ। উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে। জয়া চিঠিখানা ভাঁজ করে তাড়াতাড়ি ব্লাউজের নীচে রেখে দেয়। অপ্রত্যাশিতভাবে কিষেনলালের আগমন। প্রতিহিংসায় দু'টি চোখ দপ দপ করে জ্বলে উঠে মুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে যায়। বারটা শনিবার। যদি মাতাল হয়ে এসে থাকে পাজীটা?...আলমারীর মধ্যে মদের বোতলটা হাসতে থাকে। অসুর বধের মহাস্ত্র। ঈষৎ হাসিতেই দরজার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় জয়া। অভ্যর্থনা জানাতে হবে কিষেনলালকে। ঘুম পারিয়ে দিতে হবে গেলাসে গেলাসে।

হুস করে সিঁড়ির গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় মোটরটা। ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে দ্বিতীয় কেউ নেই। একাকীই উঠে আসছে কিষেন লাল। না, অপ্রকৃতিস্থ নয়। ধীরভাবেই উঠে আসছে। হৈ-চৈও নেই কোনরূপ। জয়া ঔৎসুক্য সহকারেই অভ্যর্থনা জানায়। কোচের উপর এসে বসে দু'জনে। কিষেনলাল হেসে হেসেই জিজ্ঞেস করে, তোমার কোনরূপ অসুবিধে নেই ত' বিবিসাহেবা?

সহজভাবেই উত্তর করে জয়া, না, অসুবিধে আর কি? তবে একা একা ভাল লাগে না।

একা কেন বিবিসাহেবা? তোমার ভাই রয়েছে। সঙ্গে ঝি, চাকর, মালী, দরোয়ান।

ওরা আবার সঙ্গী নাকি? ··জয়ার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে যায়।

তা'হলে?···

তা'হলে কি, তা' কি জানেন না?

সত্যি?

'সত্যি নয়ত' তবে কি মিছে পড়ে আছি এখানে?·· অপাঙ্গে কটাক্ষ করে জয়া।

কিষেনলাল সন্ত্রস্তভাবে আপত্তি জানায়, না না বিবিসাহেবা, আমাব মন বলছে মহা ভুল কবেছি আমি তোমাকে এখানে এনে।

মনের কথা কি সব সময় সত্যি হয় শেঠজী?···আবার এক ঝলক হাসে জয়া।

সত্যি নয় বলেই ত' দূরে থাকতে চাই বিবিসাহেবা। না না, ওভাবে তাকিও না তুমি। কিষেনলাল যে কোন মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।

শেঠজী কি কোথাও আঘাত পেয়েছেন?···কোচ থেকে উঠে গিয়ে আলমারী খুলে মদেব বোতল বাব করতে উদ্যত হয় জয়া।

কিষেনলাল ব্যস্তভাবে বাধা দেয়, না না বিবিসাহেবা, তুমি মদ স্পর্শ কর না। আমার মাথার কসম।

জয়া পাত্র পূর্ণ করে হাসতে হাসতেই কাছে আসে।

কিষেনলাল আবেগে ফেটে পড়ে, বিবিসাহেবা, আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তাই এ'কদিন বড় একটা কাছেও আসিনি। মনটা আজ ভাল নেই। ভাবলাম একবার ঘুরে যাই।

এ সুধা মৃতসঞ্জীবনী শেঠজী। ভাঙ্গা মন জোড়া লাগার মহৌষধ। আপনি পান করুন।···আরও মুখের কাছে এনে ধরে পাত্রটা। কিষেনলাল পূর্ববৎ বাধা দেয়, বিবিসাহেবা, তুমি হয়ত' ঠিকই বলেছ। মদ ছাড়া আমার আর বাঁচার উপায় নেই। তবু আমার অনুরোধ, তুমি হাতে করে আমাকে মদ দিও না।

অঃ বুঝেছি !···কৃত্রিম খেদে মুখ ম্লান করে জয়া।

তুমি রাগ করলে ? বেশ দাও।

উল্লসিতভাবে পাত্র এগিয়ে দেয় জয়া। এক নিঃশ্বাসে শেষ করে পুনবায় আরম্ভ করে কিষেনলাল, জানি বিবিসাহেবা এ গরল। তবু এ আমার কাছে অমৃত। দাও আরও দাও। যত ইচ্ছে তোমার।···সতৃষ্ণ নয়নে হাত বাড়ায় অভিশপ্ত।

জয়ার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ও কি ভুল করছে ?···না না, শেঠজী, আজ আর নয়।

কেন বিবিসাহেবা ? একি অনুকম্পা ?

না শেঠজী, আমি বুঝতে পারছি, আপনার শরীর আজ সুস্থ নেই।

কিষেনলাল বিকটহাস্যে ফেটে পড়ে, আমার শরীর বিবিসাহেবা ! দুনিয়ায় কেউ ত' আমার শরীর দেখে না। শুধু টাকা। বুঝেছি, তুমি ভয় পেয়েছ।

জয়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না। কিষেনলাল কি ওকে বুঝতে পেরেছে ?···এভাবে শয়তানকে জাগান উচিত হয়নি।

কিষেনলাল বলেই চলে, ভয় নেই বিবিসাহেবা, আমি উঠছি।

জয়া গোলকধাঁধায় পড়ে। শিকার পালিয়ে যাচ্ছে। কই, দুঠোর মধ্যে পেয়েও ত' কিছু করতে পারছে না ? কিষেনলালের আনাচে কানাচে জানতে হবে যে। মিশে যেতে হবে ওর অনুতে অনুতে।··· ইতস্তত করে বাধা দেয়, আজ না গেলে চলে না ?

উঠতে গিয়ে হেসেই জবাব দেয় কিষেনলাল, চলে, কিন্তু তুমি কি সত্যি তাই চাও ?

ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে জয়ার মুখ। তবু কৃত্রিম সাহসে প্রত্যুত্তর করে, কেন নয় ?

বিবিসাহেবা, তুমি লেখাপড়া শিখতে পার কিন্তু শয়তানিতে কিষেন-

লালকে ঠকাতে পাববে না। আমি এখানে থাকলে তোমার ঘুম হবে না।

জয়ার মুখে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দেয়। আর কোন উত্তর দিতে পারে না। কিষেনলাল পুনরায় কোচের উপব বসে আবম্ভ করে, আমায় সহজ কবে বলত' বিবিসাহেবা তোমার কি চাই?

সহসা যেন শ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পায় জয়া। সহজ কবেই উত্তব কবে, আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন?

তোমার আবার কাজের কি প্রয়োজন হল? দিব্যি চাহিদামত বই আনিয়ে পড়ছ, ছোট ভাইটিকে মানুষ কবছ, ইচ্ছে করলে দু'চাবটে গাছ গাছরারও যত্ন করতে পারছ, আবাব কি কাজ চাই তোমার?

আমার যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন শেঠজী। আপনাব অফিসে একটা জায়গা হয় না?

কিষেনলাল হতবাক হয়ে যায়। মনে মনেই ভাবতে থাকে, এই কাজের প্রলোভন দেখিয়েই তোমার সর্বনাশ কবেছি। সে আগুনে এখন নিজেও জ্বলছ, আমিও জ্বলছি। তবু কাজের নেশা!···

জয়া প্রশ্নের কোন জবাব না পেয়ে পুনশ্চ অনুরোধ জানায়, আমি ছাড়া খোকনের যে আর কেউ নেই শেঠজী। কাজ আমাকে নিতেই হবে।···

বাধা দিয়ে উত্তর করে কিষেনলাল, আমি যদ্দিন আছি তোমার কোন অভাব হবে না বিবিসাহেবা।

তা জানি। তবু—

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছ না, কেমন?

জয়া মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিষেনলাল বলেই চলে, বিবিসাহেবা, বেশী পয়সার নেশা ভাল নয়। তোমার কি চাই বল?

জয়া বিদ্রূপভরেই নিজের মনে প্রশ্ন করে, কি চাই? যদি বলি হাজার লাখ, কোটি, তোমার সর্বস্ব। দিতে পারবে শয়তান?

নিরুত্তর দেখে পুনশ্চ প্রশ্ন করে কিষেনলাল, চুপ করে রইলে কেন? বল তোমার কত টাকা প্রয়োজন?

না শেঠজী, আমি এভাবে এক পয়সাও নিতে পারব না। আপনি দয়া করে শুধু একটা কাজ দিন আমাকে।

বুঝেছি বিবিসাহেবা, আমার কাছ থেকে হাত পেতে নিতে তোমার ঘৃণা হচ্ছে। তা হবারই কথা।

না শেঠজী—

দোহাই তোমার। আমাকে তুমি ধোকা দিতে চেষ্টা কর না। বিবি-সাহেবা, তুমি শুধু বর্তমানের পিশাচটাকেই দেখলে। তার আগেকার রূপ কল্পনাও করতে পারবে না। সে জানত পরের কাছ থেকে হাত পেতে জিনিষ নেওয়ায় কি লজ্জা।...

না শেঠজী, আমার কোন মান অপমান নেই। আপনি মিছে ভাববেন না।

মান অপমান বোধ নেই পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ আছে বিবি-সাহেবা? আজ থেকে প্রায় বার বছর আগে দেশ থেকে কোলকাতা এসেছি। হাতে একটি পয়সা নেই। কলের জল খাই আর রাস্তায় রাস্তায় পয়সার ফিকিরে ঘুরে বেড়াই। তিন দিন না খেয়ে আছি জেনে এক মহাজন কিছু খেতে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু হাত পেতে নিতে পারলেম না। মহাজনকে বলেছিলাম, কোছ কাপড়া দিজিয়ে, ম্যায় ফেরি করেঙ্গে।

জয়া হতবাক হয়ে যায়। কার সঙ্গে বসে ও কথা বলছে?

কিষেনলাল মুচকী হেসে পুনরায় বলতে থাকে, কি বিবিসাহেবা, অবাক হয়ে যাচ্ছ?

জয়া মন্ত্রবৎ উত্তর করে, না শেঠজী, আমি অবাক হয়নি। বলুন, আপনি কি বলছিলেন।

কি বলব বিবিসাহেবা ? এখনও জামা খুললে কাঁধের ওপর দাগ দেখতে পাবে। সারাদিন বাড়ী বাড়ী ফিরি করেছি—ছিট কাপড়, গামছা, বিছানার চাদর। দিনান্তে সামান্য যা উপায় হয়েছে—তা' দিয়েই স্ত্রী-কন্যা নিয়ে মনের আনন্দে ঘর সংসার করেছি। সকাল সন্ধ্যায় চরণ বন্দনার সময় পেয়েছি প্রভু রামচন্দ্রজীর।···কিষেনলালের কেমন যেন কণ্ঠ জড়িয়ে আসে। একটু ঢোক গিলে নিয়ে পুনরায় বলতে থাকে, দিন চলেছে। সুখে দুঃখে ভালই। বৌয়ের মুখেও অষ্টপ্রহর হাসিই দেখে এসেছি। সহসা শুরু হল হিটলারী অভিযান। প্রথম প্রথম মাথা ঘামাবার আবশ্যক হয়নি। ইউরোপের যুদ্ধ ইউরোপের মানুষই ভাবুক। আমরা খেয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত। হঠাৎ দেখি এখানকার মাটিও কেঁপে উঠল। হাজার হাজার বিদেশী সৈনিক আর সেনাপতিতে কোলকাতা শহর প্রকম্পিত। বিরাট প্রস্তুতি কলকারখানায়। মোটা মোটা কন্‌ট্রাক্ট। আগুন লাগল পণ্যের বাজারে। তেল, তামাক, পাট, কাঠ, লোহা, কয়লা, কাপড়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছেয়ে গেল বাংলার আকাশ বাতাস। মানুষ মরে ভূত হতে লাগল। ভাগ্যবানদের ভাণ্ডারে এসে জমতে লাগল তাদেরই বুকের রক্ত—হাড়ের রস। হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা। রাতারাতি কিষেন-লাল লাড্ডা বনে গেলাম শেঠ কিষেনলালজী। তসর গরদে ফুলবাবু। গাড়ী, বাড়ী, হীরা, জহরৎ, দাস, দাসীতে সংসার জম-জমাট। চতুর্দিক জুড়ে জয়-জয়কার কিষেনলালের।···দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সহসা থেমে যায় কিষেনলাল।

জয়া বিহ্বল নেত্রে তাকিয়ে সব শুনছিল। ভূতের গল্প বলছে কি শেঠজী ? ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করে, তারপর ?

তারপর কি যেন বলছিলেম ? হ্যাঁ, বন্ধু এল, বান্ধব এল, আত্মীয়, স্বজন, সাহেব, মোসাহেব, সুবেদার, উমেদার সব। সঙ্গে সঙ্গে যে বয়সে বানপ্রস্থ নেওয়া উচিত সেই বয়সে এসে জুটতে লাগল প্রচুর পরিমাণে মদ

আর মেয়ে মানুষ। মেয়েটা তিনদিনের জ্বরে মারা যায় বিবিসাহেবা, কিন্তু আমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বোতল বোতল মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ডুবে আছি আমি এই বাগান বাড়ীতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ সোফাটার ওপর বসেই রাক্ষুসী মায়াজাল বুনেছিল, যাকে ঠেলে গিয়ে শেষ দেখা দেখতেও পাবলুম না মেয়েটাকে। বাড়ীতে বৌয়ের বুক ভাসছে চোখের জলে আর আমি মসগুল ইয়ার বন্ধু নিয়ে। প্রচুর ঐশ্বর্য পেল্যম বিবিসাহেবা, আনন্দ হারালাম চিরদিনের জন্যে। উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছি। বুভুক্ষার শেষ নেই। আজ যাকে চাই, কাল তাকে ভাল লাগে না। সর্বশেষে ষড়যন্ত্র করে আনলাম তোমাকে। গোলাপী নেশায় রঙিন করে দেখলাম। হিংস্র নখর দন্তে ক্ষত-বিক্ষত করে দিলাম তোমার দেহ। নেতিয়ে পড়লাম যদৃচ্ছা ব্যবহারে। অশক্ত মাতালের ঘুম। কিন্তু ঘুমিয়েও আমার শান্তি নেই বিবিসাহেবা। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। কে যেন টুটি টিপে ধরেছে আমার। চেয়ে দেখি তুমি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছ। বেদনার ধারা বইছে দু'টি কপোল বেয়ে।...বিবিসাহেবা, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব। বন্যার স্রোতের মতই অর্থ পেয়েছিলাম, বন্যার স্রোতের মতই বিবেকের দংশন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটা বেঁচে থাকলে হয়ত তোমার মতই হত...জামার হাতায় চোখ মোছে কিষেনলাল।

জয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় চীৎকার করে ওঠে, শেঠজী—

শুনবে বিবিসাহেবা, শুনবে শয়তানের ইতিবৃত্ত ?

দেয়াল ঘড়িতে সহসা ঢং ঢং করে এগারটা বেজে যায়। কিষেনলাল হকচকিয়ে ওঠে। আজ উঠি বিবিসাহেবা, রাত অনেক হ'ল। জয়া কোন উত্তর দিতে পারে না। কিষেনলাল কোচ ছেড়ে উঠতে উঠতে পুনরায় বলতে থাকে, তুমি কাজ চেয়েছিলে না বিবিসাহেবা? সত্যি আজ আমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার। দু'টো পিশাচকে ছাঁটাই নিয়ে সারা আপিসময় ঝড় উঠেছে। কৌশলে দমন করতে হবে

ওদের। কিন্তু নিজের ওপর আমার আর তেমন আস্থা নেই। তুমি পারবে?

জয়া হর্ষোৎফুল্লভাবে উত্তর করে, কেন পারব না? আপনি যদি দয়া করেন।

দয়া নয় বিবিসাহেবা, তুমি ভার নিলে আমি বেঁচে যাব।

আপনার যেরূপ অনুমতি···

তা'হলে আর দেরী নয়। কাল থেকেই যোগদান কর। গাড়ী দশটার মধ্যেই আসবে, তুমি তৈরী থেকো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় জয়া। কিষেনলাল নীরবেই গিয়ে গাড়ীতে ওঠে। সত্যি কি কাজ দেবে শয়তান? না আবার কোন ফন্দী এঁটেছে? গম্ভীরভাবে ভাবতে থাকে জয়া।

একত্রিশ

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী এসে উপস্থিত হয়। যথারীতি তৈরীই ছিল জয়া, বেরিয়ে পড়ে। মনটা আজ খুবই প্রসন্ন। কিষেনলাল যে এত সহজে রাজী হবে এ-ভরসা ছিল না। এখন কাজ গুছিয়ে নিতে পারলেই হয়।...কি আর এমন কঠিন কাজ? ইংরেজী ত' ভালই জানা আছে। উপযুক্ত টিকা-টিপ্পনী পেলে চিঠিপত্র লেখায় আটকাবে না।... কিষেনলালের একক মালিকানা স্বত্ব। অন্য কোন অংশীদারের ঝামেলা নেই। যে-ভাবেই হোক খাপ খাইয়ে নেওয়া যাবেই।...ভাবতে-ভাবতে চেয়ে দেখে গাড়ী মিশন রো'র একটা ত্রিতল বাড়ীর ফটকে এসে লেগেছে। ড্রাইভার দোর খুলে সেলাম জানায়। কিষেনলাল আপিসেই ছিল। হর্ণ শুনে ছুটে আসে অভ্যর্থনা জানাতে। জয়া এতটা ভাবতে পারেনি। লজ্জা পেয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে 'লিফ্‌টে' ওঠে।

ত্রিতলের বিরাট হলের সম্পূর্ণটাই আপিস ঘর। একপাশে বড় বড় তিনটে চেম্বার। সম্মুখেরটি ভিজিটার্সদের জন্য। মাঝেরটিতে রামলোচনবাবু গোপনীয় দলিলপত্র নিয়ে বসেন। তৃতীয়টি স্বয়ং কিষেনলালের। পরিপাটি করে সাজান। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ হলটাই চেয়ার-টেবিলে গিজ গিজ করছে। পিয়ন, চাপরাশি, কেরাণীতে অন্যূন শ'খানেক লোক কাজ করে। লেডী টাইপিস্টও আছেন দু'জন। জয়াকে শেঠজীর সঙ্গে প্রবেশ করতে দেখেই সমস্ত আপিস হকচকিয়ে ওঠে। কারও মুখে টু শব্দটি নেই। নতুন ইউনিয়নের গোড়াপত্তন করে যে কয়জন অতি উৎসাহী সভ্য মুখর হয়ে উঠেছিল তারাও নিজ নিজ 'সিটে' বসে শান্ত থাকে। কি যেন একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। বুঝতে পারে

না কেউ—কি ব্যাপার। কেবলমাত্র রামলোচনবাবু কিছুক্ষণ আগে খানিকটা অবগত হয়েছেন। তাড়িতাড়ি ছুটে গিয়ে তিনিও অভ্যর্থনা জানান।

স্বীয় আসন গ্রহণ কবে কিষেনলাল জয়াকে পাশের চেয়ারটিতে বসতে ইঙ্গিত কবে। অন্যদিন হলে জয়া সঙ্কোচ বোধ করত। কিন্তু আজ আর কোন প্রকার দ্বিধা করে না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে আসতে হয়েছে। বেশ সোজা হয়েই চেয়ারটিতে বসে। রামলোচনবাবু বসেন সম্মুখেরটিতে গুটিসুটি হয়ে। ক্রিং ক্রিং শব্দে 'কলিং বেল' বেজে ওঠে কিবেনলালেব হাতে। চাপরাশি ছুটে আসে! তলব হয় সমস্ত বিভাগের অধিকর্ত্তাদের। একে একে সকলেই উপস্থিত হলে কিষেনলাল পবিচয় কবিয়ে দেয়, ইনি মিস্ জয়া দাসগুপ্তা। আজ থেকে সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত হলেন। আপনারা সকলেই এর নির্দেশ মেনে চলবেন।···কেরাণীকুলেব বিস্ময় ধরে না। ইউনিয়ন সেক্রেটারী অমিয়নাথ হতবাক হয়ে যান। রামলোচনবাবুর গৌরবর্ণ মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে। মনে মনেই ভাবতে থাকেন, শেঠজী ইউনিয়ন গঠন সহ্য করতে পারেননি। বিশেষ করে তার প্রেসিডেন্টের পদ। নয়ত সৃষ্টি থেকে তিনিই আপিস চালিয়ে আসছেন। সহযোগীরূপে অমিয়নাথের কর্মকুশলতারও তুলনা হয় না। আজ তাদের বর্তমানেই নূতন সেক্রেটারীর প্রয়োজন হ'ল! তাও কিনা একরত্তি একটি মেয়েকে!··· মাথা হেট করেই নীরব থাকেন রামলোচন। সকলেই আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা রক্ষা করে একে একে বেরিয়ে আসেন। অমিয়নাথবাবুর চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তিনিও কোন রকমে ভদ্রতা জ্ঞাপন করে চলে আসেন। কিষেনলাল রামলোচনবাবুকে উদ্দেশ্য করে আদেশ করে, আপনি মিস্ গুপ্তাকে সঙ্গে করে সমস্ত আপিসটা একবার দেখিয়ে নিয়ে আসুন। স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার ওর।

নীরবেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান রামলোচন। জয়া লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপত্তি জানাবার উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে নেওয়া যায়। রামলোচনের সঙ্গে আপিস পরিদর্শনে বার হতে উদ্যত হয়। কিষেনলাল মনের খুশিতে রিভল্‌ভিং চেয়ারে কিঞ্চিৎ দুলে পুনরায় বাধা দেয়, হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে অমিয়নাথবাবুকে বলে দিন, তিনি যেন এক্ষুনি ছুটির নোটিশ লিখে নিয়ে আসেন। নূতন সেক্রেটারীর সম্মানার্থে আজ বেলা একটায় আপিস ছুটি হবে।

জয়া অন্তরে-অন্তরে হেসেই দুর্দমনীয় অবস্থাকে চেপে যায়। রামলোচন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জয়াকে সঙ্গে করে বেরিয়ে আসেন।

সিগারেটের ধূম উদ্‌গীরণ করতে করতে পা'দুটো টেবিলের ওপর তুলে দেয় কিষেনলাল। মুখে ফুটে উঠেছে খুশির হাসি।···

কেরাণীকুল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুহূর্তে থেমে যায় মৃদু গুঞ্জন। এমন কি নির্মল, শৈলেন—যারা ইউনিয়ন নিয়ে টেবিল গরম করছিল—তারাও সিটে গিয়ে মুখ বুজেই কলম চালাতে থাকে। নিশাচর বাজ তাড়া করেছে শ্রেণীবদ্ধ কপোতককে।···গম্ভীর হয়ে আপিস দেখে চলে জয়া। প্রয়োজন বোধে দু'একজনকে প্রশ্ন করেও কিছু কিছু জেনে নেয়। চেম্বারে ফিরে এলে কিষেনলাল রামলোচনকে নির্দেশ দেয়, কাল থেকে মিস্ গুপ্তা মাঝের চেম্বারে বসবেন। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সব ঠিক থাকে যেন। প্রত্যক্ষ আক্রমণে নিদারুণ অপমান বোধ করেন রামলোচন। মাঝের চেম্বারটিতে সৃষ্টি থেকে তিনিই বসে আসছেন। রাশি রাশি গোপনীয় দলিলপত্রে বোঝাই। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতই কি রাতারাতি বদলে গেলেন কিষেনলালজী! এতটা অভদ্র আচরণ কি মানুষ কখনও করতে পারে!···কত বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে করে আপিস চালিয়ে আসছেন···সামান্য আঁচড়েও ভেঙে পড়েননি। কি এমন অন্যায় করেছেন ইউনিয়ন-প্রেসিডেণ্ট হয়ে!

ছোকরারা সকলেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। জোর করে চেপে ধরল, অস্বীকার করেন কেমন করে? তাছাড়া অমিয়নাথবাবু ত' নিয়মকানুন রক্ষা করেই ইউনিয়ন পরিচালনা করছেন, তবে?···শেঠজীর নুন খেয়েছি, অধর্ম করতে পারব না। তাই বলে সকলের সঙ্গে প্রতারণাই বা করি কেমন করে? না, চাকুরী ছাড়তে হয় ক্ষতি নেই, প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তাফা দেওয়া চলবে না···লজ্জায় ক্ষোভে ইতস্তত ভাবতে ভাবতে ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানান কিষেনলালের প্রশ্নে। মুখে কোন বাক্যস্ফূর্তি হয় না। নিজের চেম্বারে এসে আরও গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।···সাদা মনে এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দিয়েছে কিষেনলাল। না—না, কিছুতেই হতে পারে না। জীবনে কোন অন্যায় করেননি তিনি···

জয়া কিষেনলালকে একা পেয়ে প্রতিবাদ করে, কাজটা ভাল হ'ল না। বুড়ো মানুষ আঘাত পেলেন। বরং আমিই কাল থেকে ভিজিটার্স চেম্বারে বসব।

কিষেনলাল দুলতে দুলতেই জবাব দেয়, ওতে কোন লাভ হবে না। তোমাকে কাজ দেখতে হলে সমস্ত কাগজপত্রই দরকার হবে। তাছাড়া কিছু শিক্ষা হওয়াও বাঞ্ছনীয়।···

জয়া আর বিশেষ কোন প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। কিষেনলালকে বেশী ঘাটাতে গেলে গোলমাল হয়ে যেতে পারে।···ঘড়িতে সাড়ে বারটার ঘণ্টা বেজে যায়। ছুটির সময় হয়ে এল। প্রসঙ্গান্তরে পুনর্বার অনুরোধ করে, যে বাবু তিনটিকে অধিক মাত্রায় আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখা গেল তাদের একটু ডাকাতে পারেন?

কিষেনলাল হাসির মাত্রা চড়িয়ে জবাব দেয়, তুমি দেখছি পাকা জহুরী বিবিসাহেবা। হ্যাঁ, মালিকদের ডেকে ভাল করে পরিচয় করে নাও, কাজে লাগবে।

জয়া হেসে হেসেই রেশ টেনে যায়, আপনি শুধু ওদের বলে দিন, কাল সকালে যেন বাংলোতে আমার সঙ্গে দেখা করে।

কিষেনলাল পুনরায় কলিং বেল টেপে। লক্ষ্মী দাস, অবনী ভট্চায ও বলাই শীলেব তলব হয়।

জয়া পুনবায় আব্দার কবে, দলিলপত্রগুলিও একটু দেখে নিলে হ'ত।

তা' বেশ, রামলোচনকে বলে দিচ্ছি, গাড়ীতে তুলে দেবেন। তুমি বাংলোতে বসেই দেখে নিও।

আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে ?

না, আজ আমি কতকটা নিশ্চিন্ত। আমাকেও আজকের দিনটা ছুটি দাও। বড় দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল বদমাশগুলো।

ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়। অধিকাংশ কেরাণীই কিছুটা আগে ঘরে যাবার সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হযে উঠেছে। জনকয়েক যারা ইউনিয়নের পাণ্ডা, বাস্তায বেরিয়ে জটলা কবতে থাকে।

কিষেনলাল জয়া একই গাড়ীতে কবে বেরিতে যায়। রাস্তায় নেমে যাবে শেঠজী।

বত্রিশ

রবিবারের সকাল। শীতের মিঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলোর বারান্দায়। জয়া ডেক চেয়ারে বসে আপিসের কাগজপত্র দেখছিল। না বুঝার মত এমন কিছু নেই। পরিষ্কার—বুঝতে পারছে। কাজ চালিয়ে যেতে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। সমুহ যে ঝড় দেখা দিয়েছে তাকে কৌশলে ঠেলে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত। তিনটি বিশ্বাসঘাতক আসছে। ওদের মারফৎ জানা যাবে সকলের পরিচয়। তারপর কাজের ব্যবস্থা। অমিয়নাথ, রামলোচন···হু'জনের ওপরেই ভরসা করা যেতে পারে···জয়া ডুবে যায় কাগজপত্রের মধ্যে।···

ছাড়া পেয়ে খোকনের তুরন্তপনাও বেড়ে গিয়েছে। মালিনী-মাসীর অতটুকু বিশ্রাম নেই। সদা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। তুষ্টু ছেলে, কোলে উঠেই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় পুকুরের ধার। ফোয়ারার জল তির্ তির্ করে পড়ছে। ভাবী খুশি হয় দেখে। দুব থেকে জয়াকে দেখে কুট কুট করে হাসে। হাত বাড়ালে আঁচলে মুখ গুজে চেপে ধরে মাসীকে। না, যাবে না। বেশ আছে মাসীর কোলে। জয়ারও সময় নেই। রাশি রাশি কাজের তাড়া। কই, ওরা তিনজন ত' এখনও এলো না! অনেকক্ষণ হয় আটটা বেজে গিয়েছে! এখানকার কাজ সেরে আবার আপিসে বেরুতে হবে!···খানিক বিরক্তিতে হিসেবের খাতা দেখতে শুরু করে। হু' পরস্ত খাতা। এক নম্বরে ট্যাক্স ফাঁকির বক্র আঁটুনী। হু' নম্বরে আসল লাভ লোকসানের হিসেব। আর কোন অংশীদার নেই বলেই হয়ত তৃতীয় নম্বরের আবশ্যক হয়নি।···

ভৃত্য টিপয়ের ওপর চা জলখাবার দিয়ে যায়। আজকাল "[redacted] মালিনী-মাসীর সময় হয় না। খোকাকে নিয়েই সে ব্যস্ত। খাবারটা খেয়ে

চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবে জয়া, সত্যি কি কিষেনলাল বিশ্বাস করেছে ওকে? দুর্জনের ছলের অভাব নেই। কে জানে, যে দলটি আসছে, তারা গুপ্তচর কিনা। যদি ওকে উদ্দেশ্য করেই লেলিয়ে দিয়ে থাকে! না—না, আগে থেকে কিছু বলে কাজ নেই। প্রথমত দেখা যাক কি বলতে চায় ওরা। তবে কিষেনলাল যতই ধূর্ত হোক, একেবারে ফাঁকি দিতে পারবে না। অনেকগুলো গোপনীয় দলিল মুঠার মধ্যে এসে পড়েছে। সময় মত সুযোগ নেওয়া যাবেই।…ভাবতে ভাবতে পেয়ালাটা নিঃশেষ করে দেয়।…দরোয়ান রামসুন্দব ছুটে এসে খবর দেয়, তিনটিবাবু দেখা করতে চান। তাড়াতাড়ি তাদের এখানে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করে জয়া। কাগজপত্র গুছিয়ে ঠিক হয়ে বসে চেয়ারে। নিশ্চয় সুযোগ-সন্ধানী তিনটি আসছে।

শেঠজীর বাগানবাড়ীর কাহিনী লক্ষ্মী, অবনী, বলাই রূপকথার মতই শুনে এসেছে। কিন্তু চর্মচক্ষে এ-পর্যন্ত কেউ কোনদিন দেখবার সুযোগ পায়নি। বিলাসের রঙিন দৃশ্যে বিস্ময় বোধ করে সল্প পরিসর দৃষ্টি। কেরাণীকুলের সামান্য দু'পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি যিনি নানারূপ ভ্রান্ত ওজর আপত্তিতে চাপা দিয়ে যান, সেই শেঠজী কেমন মুক্ত হস্তে খরচ করেছেন অগণিত অর্থ! কি অনিন্দ্য সুন্দর পুষ্পোদ্যান, পুকুর, বাংলো আর রাস্তাঘাট! শিল্পীর আঁকা ছবিই যেন পাখা বিস্তার করে আছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে এগিয়ে চলে তিন বন্ধু বাংলোর দিকে। রামসুন্দর এগিয়ে দিয়ে যায় সিঁড়ি পর্যন্ত। উপরে উঠেই নমস্কার দিয়ে দাঁড়ায় সকলে জয়ার সম্মুখে। কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করে জয়া। একে অভ্যাস নেই, তাতে সকলেই বয়সে বড়। তবু কোন রকমে সামলিয়ে নিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে সকলকে স্মিত হাস্যে। আপিস-নেত্রীর সঙ্গে সমানে চেয়ারে বসা [illegible] কেরাণীর পক্ষেই সহসা সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে যারা অধিক [illegible] পা চেটে বেড়ায় তাদের পক্ষে ত' নয়ই। কেমন যেন ইতস্তত করতে

থাকে তিনবন্ধু। জয়া মনের ভাব বুঝতে পেরেই পুনরায় অনুরোধ জানায়, বসুন আপনারা, অনেকগুলো কাজের কথা আছে আজ আপনাদের সঙ্গে।

তিনবন্ধু কোনরকমে আড়ষ্ট হয়ে বসে চেয়ারের উপর। ভৃত্যকে ডেকে চায়ের অর্ডার দেয় জয়া।...না না, লজ্জার কিছু নেই। কোন ভোরে উঠে ছুটতে হয়েছে। সামান্য একটু চা পান করে জিরিয়ে নিন।...

অধিকতর আদর আপ্যায়নে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেও মনে মনে খুশিই হয় সকলে। লক্ষ্মীদাস গদ গদ চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করে, এসব ঝামেলার দরকার ছিল না। সামান্য পথ, কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি আমাদের... পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ভৃত্য তিন পেয়ালা চা ও থান কয়েক বিস্কুট এনে হাজির করে। জয়া পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে একটা ফাইলের উপব মনোযোগ দেয়। থাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলে সহাস্যে প্রশ্ন কবে, আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে লক্ষ্মীবাবু কে, বলুন ত' ?

লক্ষ্মী দাস হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ায়।

না না, বসুন আপনি। আপনারা ?...বলাই শীল ও অবনী ভট্টচার্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

উভয়েই উঠে দাঁড়িয়ে স্ব স্ব নামের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়।

কিছু মনে করবেন না যেন, সেদিন অত তাড়াতাড়িতে সকলকে মনে রাখতে পারিনি।' পুনর্বার সকলে আসন গ্রহণ করলে মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করে, আপনারা সকলেই ত' ইউনিয়নের সভ্য ?

সকলের মুখই ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। সন্ত্রস্তভাবে লজ্জা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে লক্ষ্মী দাস, আজ্ঞে...

না না, ইউনিয়ন করে আপনারা কিছু অন্যায় করেছেন তা' বলছিনে

আজকালকার দিনে সঙ্ঘবদ্ধ থাকাই বরং যুক্তিযুক্ত। মালিক পক্ষেরও তাতে কাজ করাবার সুবিধে হয়।...অনিচ্ছা সত্বেও যেন শ্লেষ ঝরে পড়ে জয়ার কণ্ঠে।

আজ্ঞে না, আমরা ওসব ইউনিয়ন-টিউনিয়নের মধ্যে নেই। শেঠজীর সঙ্গে বরাবর আমাদের প্রীতির সম্পর্ক। চিত্ত দে আর নির্মল ঘটক একপ্রকার জোর করেই আমাদের সই নিয়েছে...উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারে না বলাই শীল।

অবনী ভট্‌চায আরও জোর দিয়ে কথাটা শেষ করে, আজ্ঞে হ্যাঁ, অমিয়নাথবাবু ও রামলোচনবাবুর উস্কানি না থাকলে ওরা কিছুতেই এতটা জুলুমবাজী করতে সাহসী হত না। আমরা অনন্যোপায় হয়েই সই দিয়েছি। এতে আমাদের আন্তরিক কোন সমর্থন নেই।...

জয়া কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করেই সাহস দেয়, না না, কারও কোন জুলুমবাজীতে ভয় পাবার সঙ্গত কোন কারণ নেই আপনাদের। আইন কোন প্রকার জবরদস্তি সমর্থন করে না। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার নিশ্চয় আছে আপনাদের। ইচ্ছে করলে পাল্টা ইউনিয়নও গড়তে পারেন আপনারা...

লক্ষ্মীদাস হাত জোড় করে অনুরোধ জানায়, আজ্ঞে, আপনি যদি ভরসা দেন, তাহলে আমরা সেই চেষ্টাই করব। শেঠজী আমাদের নিমকহারাম ভাববেন একথা মনে হলেও লজ্জা বোধ হয়।

জয়া হেসে হেসেই জবাব দেয়, শেঠজী আপনাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত মনে করেই এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, কোন প্রকার অন্যায় হুজুগে আপনারা মাতবেন না।...

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছুতেই এ-অন্যায় জুলুমবাজী আমরা বরদাস্ত করব না। তাঁকে খুশি করাই আমাদের কর্তব্য।...সমস্বরে ফেটে পড়ে তিনজন।

জয়া আরও একটু উস্কিয়ে দেয়, অবশ্য আপনাদের বর্তমানের ইউনিয়ন

কর্তৃপক্ষ যদি শৃঙ্খলা মেনে চলতেন, তাহলে আমাদের বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের অন্যায় জেদ কোনক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না। ধরুন, যে বাবু দু'টিকে বরখাস্ত করা হয়েছে তারা মোটেই কেউ আপিসের কাজের উপযুক্ত নন।

নিশ্চয় নয়। এপর্যন্ত তারা বিঘ্নই সৃষ্টি করে এসেছে আপিসের কাজে ...অবনী ভট্টচায গর্জন করে ওঠে।

তবেই দেখুন, আপনাদের ইউনিয়ন কেমন অন্যায় জেদ ধরেছেন তাদের পুনর্বহাল নিয়ে।...

না, এ-অন্যায় জেদ মেনে নেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। আমরা বরং খুশিই হয়েছি অনাচার থেকে রক্ষা পেয়ে।...বলাই শীল জোরের সঙ্গে মন্তব্য করে।

জয়া সুযোগ বুঝে পুনরায় জের টেনে যায়, তারপর ধরুন, যে বাবু দু'টিকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে—তারাও কেউ নিরপরাধ নন। সিট ছেড়ে তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গই করেছিলেন...

নিতাইবাবুর ওরকম বদ অভ্যাস বরাবরই আছে। ভদ্রলোককে বহুদিন হুসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। শাস্তি পাওয়া তারও উচিত...লক্ষ্মীদাস সমর্থন করে।

'বোনাস' নিয়ে যে কথা উঠেছে তাও ভেবে দেখা দরকার। কোম্পানীর কাজকর্ম মন্দার দিকে। এখন থেকে খরচ না কমালে আপিস রাখা দায় হবে।

নিশ্চয় নিশ্চয়...সকলেই এক সঙ্গে সমর্থন জানায়।

লক্ষ্মীদাস অবস্থা আরও জোরদার করবার জন্য অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করে, অম্বিকানাথবাবু বলেন, খরচাই যদি কমান দরকার তাহলে শেঠজী অত মোটা টাকা নিচ্ছেন কেন? আহাম্মক না হলে কেউ কখনও মালিকের দিকে দৃষ্টি দেয়! যাঁর ধন তিনি নেবেন না

তবে কি অমিয়নাথকে বিলিয়ে দেবেন?···সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে।

জয়ার পরীক্ষা নেওয়া শেষ হয়ে যায়। ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে পুনর্বার আশ্বাস দেয়, বেশত', এ-অন্যায় জেদ প্রতিরোধের ভার আমি আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। শেঠজী যথাসাধ্য সাহায্য করবেন আপনাদের।

বলাই শীল মাথা চুলকিয়ে আবদার করে, আজ্ঞে, চিত্ত দে আর নির্মল ঘটককে জব্দ করতে না পারলে ইউনিয়নের জোর কমবে না। ওদের জবরদস্তিতেই অনেকে মুখ ফুটে কথা বলতে পারছে না।

বেশ কালই আমি ওদের ফ্যাক্টরী আপিসে বদলি করে বিষ দাঁত ভেঙে দিচ্ছি। আপনারা অন্যান্য বাবুদের বুঝাতে থাকুন, আত্মসমর্পণ করলে শেঠজী সকল বিষয়েই বিবেচনা করে দেখবেন। এমন কি 'বোনাসও' পুজোর আগেই দিয়ে দেওয়া হবে।···

অবনী ভট্চায কিঞ্চিৎ হেসে উল্লাস জানায়, তা'হলে ত' কথাই নেই। কাল থেকেই ভাঙন শুরু হবে। টাকার লোভ সামলিয়ে কোন বাবুই ওপক্ষে টিকে থাকবে না।···

লক্ষ্মীদাস খানিকটা ধমকের সুরেই বাধা দেয়, ওপক্ষের কথা আপনি কি বলছেন! টাকা পেলে এক অমিয়নাথবাবু আর রামলোচনবাবু ভিন্ন কেউ ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে না।

বলাই শীল মনের মত কথা পেয়ে পাকান গোঁফের ফাঁক দিয়ে মিট মিট করে হাসতে থাকে।

জয়া অধিকতর সহৃদয়তা দেখিয়ে উৎসাহ দেয়, আপনারা সকলে মিলে তা'হলে সেই চেষ্টাই করুন। শেঠজী চিরকাল আপনাদের মনে রাখবেন।···দেয়াল, ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বেজে যায়। জয়া ড্রয়ার টেনে একশ' টাকার তিনখানা নোট বার করে লক্ষ্মীদাসের হাতে

দেয়, নিন, এই টাকা ক'টা সঙ্গে রাখুন। কাজের সময় দরকার হবে।...

থানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ইতস্তত করতে থাকে লক্ষ্মী। অবনী, বলাইও হতবাক হয়ে গেছে। জয়া পুনর্বার বল সঞ্চার করে, এতে দ্বিধার কি আছে বলুন ত? টাকা ছাড়া কখনও ইউনিয়ন হয়? নিন, তাড়াতাড়ি গিয়ে কাজে লাগুনগে।...

হাত বাড়িয়ে টাকাটা গ্রহণ করে লক্ষ্মী। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন ঢেউ খেলে যায় মনের ওপর। গদ গদ চিত্তে নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ে তিনবন্ধু। সিঁড়ির ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় কোলকাতার পথে সকলে। জয়া অবসাদ বোধ করে। রহস্যাবৃত ভবিষ্যৎ।

তেত্রিশ

দু'দিনের পরের ঘটনা। চিত্ত দে নির্মল ঘটককে ফ্যাক্টরী আপিসে বদলি করা হয়েছে। প্রবল আপত্তি জানিয়েও ইউনিয়ন সেক্রেটারী প্রতিরোধ করতে পারলেন না। পদত্যাগ করালেও সংগ্রামী শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই কাজে যোগদান করে ওরা। কিষেনলালের পোষা কুকুরগুলো দলে টানবার জন্য প্রলুব্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। ফাঁকা মাঠের ওপর ফ্যাক্টরী। গুণ্ডারাও ভয় দেখাতে কসুর করছে না। হাসি, বিদ্রূপ, টিপ্পনী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কাজের চাপও অস্বাভাবিক। আপিস ডিউটি ছিল দশটা পাঁচটা। ফ্যাক্টরীর নিয়মানুযায়ী এখানে দুবেলা কাজের তালিকা। ভোর ছ'টা থেকে এগারটা। আবার তিনটা থেকে সাতটা। কোথায় খায়, কোথায় স্নান করে, কিছুই ব্যবস্থা নেই।

কোলকাতা থেকে দুবার যাতায়াত করেও পোষায় না। সময় নেই, আর্থিকও অকুলান। লেবার আপিসের সাহায্য লাভও ঘটে ওঠে না।... অত্যাচারের ধকল সহ্য করা অসম্ভব। বশ্যতা স্বীকার করে নেয় দু'জন। হেড আপিস ইউনিয়নের সভ্যপদে ইস্তাফা দিয়ে কিষেনলালের পেটোয়া লোকের পরিচালিত ফ্যাক্টারী ইউনিয়নের সভ্যপদ গ্রহণ করতেও বাধ্য হয়। গুণ্ডার জুলুমবাজী। না হলে টিকে থাকা অসম্ভব। প্রতিবাদ করা ত' দূরের কথা, ব্যক্তিগত অভাব অসুবিধার কথা পর্যন্ত জানাবার উপায় নেই। অমিয়নাথবাবুর উভয় বাহু ভেঙে গেল। সহযোগী আরও দু'চার জন যারা আত্মনিষ্ঠ ছিল তাদেরও বদলি করে দেয় জয়া। স্বার্থান্বেষী চক্রান্তে খান খান হয়ে ভেঙে যায় ইউনিয়ন। অবনী, বলাই, লক্ষ্মীদাসের চক্রান্তে ছা'পোষা কেরাণীকুল রাতারাতি নাকে খৎ দিয়ে ফ্যাক্টরীতে এসে যোগদান করেছে। শহরের বুক থেকে সমস্ত আপিস তুলে আনা হয়েছে এখানে। ভীতির রাজত্ব, টু শব্দটি পর্যন্ত করার উপায় নেই কাহারও।

রামলোচনবাবুর পক্ষে কাজ করে যাওয়া অসম্ভব। অমিয়নাথের মাথা কাটা যায় লজ্জায়। কিষেনলালের উৎপীড়ন বেড়েই চলেছে। মানী ব্যক্তিকে মানহানিকর উক্তি করতে বিন্দুমাত্র বিবেচনা করে না। জয়া থ' বনে গেছে। জয়যুক্ত হয়েও যেন খুশি হতে পারে না। ও কি সত্যি চেয়েছিল এ পরিণতি?...কিষেনলাল বাহবা দিয়ে যায়। চাটুকারেরা অনবরত এসে তোষামোদ শুরু করেছে। জীবনের বোঝা জটিল হয়ে ওঠে জয়ার। রামলোচনবাবু ওর বাবার বয়সী, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। অমিয়নাথের কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা হয় না। কিন্তু উভয়েই আজ তাঁরা পরাজিত। প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়ে গেল ওঁদের। কে দায়ী এর জন্য? যাদের শক্তি এত দুর্বল তাদের নিয়ে আশা কোথায়? কতটুকু এগুতে পারবে তারা? ষেনলালের মত শয়তানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে দুর্জয় শক্তি অর্জন

করতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জনও দিতে হবে। তবু পেছিয়ে আসা চলবে না।···ভেড়ার দল এক এক করে সব দলে ভিড়ে পড়ল।··· তিলে তিলে যারা মরছে তারা কি একটিও একবারে মরে অমর হতে পারল না?···শিরা উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে জয়ার। শ্মশানের ওপরেই শিব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কিছুতেই রেহাই দেওয়া চলবে না রামলোচন অমিয়-নাথকে। মাত্র দু'টি। অনেক চেষ্টা করে মাত্র দু'টি মানুষকে খুঁজে পেয়েছে। জীবনের ব্রত—ভবিষ্যতের আশা আকাজ্ক্ষা।

পদত্যাগ পত্র পেশ করে অপেক্ষা করছিলেন রামলোচন অমিয়নাথ। হেড আপিসে মাত্র দু'জন অবশিষ্ট। কিষেনলাল জয়ার ওপর ভার দিয়েই চলে গিয়েছে।

ছুটির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবু কাকেও জানান হয় না ফলাফল। বিনা অনুমোদনে অনুপস্থিত থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। শয়তানের সঙ্গে বাস। যে কোন অপবাদ কিংবা দায়ে ফেলে দিতে পারে। গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে।···ভেবে ভেবে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন অমিয়নাথ। না, আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করা যায়? বোঝাপড়ার চেষ্টায় বিনা আহ্বানেই উপস্থিত হন সেক্রেটারীর চেম্বারে। জয়া দেখেও যেন দেখে না। অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠে খাতাপত্রে। এমন কি ভদ্রতা রক্ষার্থে বসতে পর্যন্ত বলে না অমিয়নাথকে। লজ্জায় অপমানে মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে বেচারার। শিক্ষিতা একজন ভদ্রমহিলা যে এরূপ সৌজন্যবোধহীন হতে পারে একথা ভাবতেও বিস্ময় বোধ করেন। তবু ধৈর্যের পরীক্ষায় আরও কিছুকাল অপেক্ষা করেই চলেন। না, জেগে ঘুমানো মানুষকে কিছুতেই জাগান যাবে না। অমিয়নাথ গম্ভীর কণ্ঠেই নিজের ব্যক্তব্য পেশ করেন, আমার একটা দরখাস্ত ছিল।

কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই উত্তর দেয় জয়া, সময় মত উত্তর পাবেন।

না, বিলম্ব হ'লে চলবে না। জবাব আমার আজই প্রয়োজন।

চোখ কপালে তুলে শ্লেষে ফেটে পড়ে জয়া, তাত হবেই। বিশ্বাসঘাতকদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অমিয়নাথ স্তম্ভিত হয়ে যান। ভাবতে পারেন না কোন অশরীরি আত্মা তাঁর সঙ্গে বিদ্রূপ করছে কিনা। কিষেনলালের আপিস। যে আপিস নিজের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে তুলেছেন, সেই আপিসে বসে সামান্য একজন···না না, সংযত কণ্ঠেই উত্তর করেন, ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন নাকি আপনি?

মনে মনে হাসি পেলেও বাহ্যিক রূঢ়তা রক্ষা করেই প্রত্যুত্তর করে জয়া, যার যা পাওয়া-দরকার তাকে তা দিয়েই অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

অমিয়নাথের সাদা মুখ লাল হয়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত জোরের সঙ্গেই প্রতিবাদ করেন, বলুন, কি বিশ্বাসঘাতকতার নজির আপনি পেয়েছেন?

জয়া সক্রোধেই গর্জে ওঠে, বান্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি আপনি? যে কাজ পারবেন না, কেন সে-কাজে উস্কানি দিয়ে এই দুর্দিনের বাজারে সাত আটটি ভদ্র সন্তানকে বেকার করলেন?

অমিয়নাথ আর ধৈর্য অবলম্বন করতে পারেন না। সমস্বরেই উত্তর করেন, বিশ্বাসঘাতকতা আমি করিনি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে আপনিই তার অপব্যবহার করেছেন। সময় মত উপযুক্ত কৈফিয়ৎও দিতে হবে আপনাকে এর জন্যে।···

তাই নাকি? বেশ, দেখা যাবে!···ভ্রূ কুঁচকিয়ে প্রত্যুত্তর করে জয়া।

অমিয়নাথ মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেন, দেখা যাবে নয়, এ-ই আপনার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ যদি তা-ই হয়, তবু কাপুরুষের মুখে আস্ফালন শোভা পায় না।···বাঁকা হাসি হাসে জয়া।···

ক্ষমতার গর্বে আপনি যা খুশি বলতে পারেন, আমি আপনার কোন কথারই জবাব দেবো না।

জবাব দেবার মত যে আপনার কিছু নেই তা আমি জানি।

তার মানে ?

মানে, তাই যদি থাকবে তাহলে বন্ধুবান্ধবকে বিপদের মধ্যে ফেলে পালাবার চেষ্টা করতেন না। শক্তি থাকে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করুন।...

অমিয়নাথের মুখ চোখ সহসা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যিই ত', পালিয়ে না গিয়ে তীব্রভাবে সংগ্রাম করাই ত' আজকের দিনের যথাযোগ্য কাজ। আবদার জানিয়ে ত' কারও কাছ থেকে কিছু আদায় হবার নয়...

জয়া নিরুত্তর দেখে পুনরায় কশাঘাত করে, চুপ করে রইলেন যে ? উত্তর দিন ! জেনে রাখুন, চোরের মত পালিয়ে যাওয়া আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। কাল থেকে আপনাকেও ফ্যাক্টরী আপিসে গিয়ে সকলের সঙ্গে সমানে কাজ করতে হবে। নিজের হাতের বোনা বিষবৃক্ষের ফল নিজে একবার খেয়ে দেখুন ?...

যদি না যাই ?...

পাঁঠার ইচ্ছে ঘাড়ে কোপ নয় ?

বেশ, আপনি তা'হলে সেই চেষ্টাই করুন, আমি চললুম।

দাঁড়ান...

অমিয়নাথ পেছন ফিরেন।

জয়া জের টেনে চলে, ভুলে যাবেন না, আপিসের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেবপত্র আপনার ওপর ন্যস্ত। সে-সব বুঝিয়ে দিয়ে না যাওয়া আপনার পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ...

বেশ, আমি এক্ষুনি প্রস্তুত আছি।

হিসেব বুঝে নেওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। অগণিত টাকা। বছরের

পর বছরের গোলক ধাঁধাঁ।…কেন যে আপনি পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত তা আমি জানি।

চমকে ওঠেন অমিয়নাথ। তাঁর আজন্মের নিষ্ঠার ওপর কটাক্ষ করছে সামান্য একটি নারী?…তবু দৃঢ় কণ্ঠেই প্রতিবাদ করেন, কি জানেন আপনি?

জয়া হেসে হেসেই জবাব দেয়, বেনামীতে কত টাকা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স দাঁড়িয়েছে?…

চুপ করুন?…আপনি…

কি আমি, বলুন?

না না, আপনি মায়ের জাতি। আপনাকে অপমান করতে পারব না। আপনার যা খুশি বলুন। যত খুশি অপবাদ দিন…

জয়া হাসতে হাসতেই পুনরায় উল্লাস জানায়, চুরি না আপনি করেননি, তবে এত ভয় কিসের?…

থামুন। কৈফিয়ৎ যদি দিতে হয় আদালতেই দেব। আপনার সঙ্গে আমি আর কোন কথাই বলতে চাইনে।…

কুটিল হেসেই পুনশ্চ বাধা দেয় জয়া, কিন্তু কথা যে আপনাকে দয়া করে আমার সঙ্গেই বলতে হবে। আমার আদেশ, ভালয় ভালয় কাল গিয়ে ফ্যাক্টরীতে যোগদান করুন। অন্যথায়…

আপনার আদেশ শোনবার জন্য অবনী, বলাই, লক্ষ্মী রয়েছে। আমার প্রতি আপনার কোন আদেশই থাকতে পারে না। আমি চললুম।…

সদম্ভে দোর টেনে বেরিয়ে যান অমিয়নাথ। জয়া মনে মনে হাসতে থাকে।

পাশের চেম্বারে বসে রামলোচন সব শুনছিলেন। এক একবার মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে প্রতিবাদ করেন সেক্রেটারীর কথায়। অমিয়নাথ বার হয়ে এলে উভয়ে চলে যেতে উদ্যত হন। কি হবে প্রগলভা মেয়েটার

সঙ্গে ঝগড়া করে। তেমন যদি কিছু হয়, আদালতেই লড়বেন। অত ভয় কিসের? চুরি ত' আর করেননি···পুনরায় কলিং বেল বেজে ওঠে। চাপরাশি ডেকে নিয়ে যায় জয়ার চেম্বারে। একি অনর্থ! পালাতে চেষ্টা করেও পালাতে পারলেন না! শেষটায় অপমানিত হতে হবে কচি মেয়েটার কাছে!···ভাবতে ভাবতে চেম্বারে প্রবেশ করেন রামলোচন।

জয়া সসম্ভ্রমে বসতে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করে, পদত্যাগপত্র দিয়েছেন কেন আপনি? কি অসুবিধা আপনার হয়েছে?···

এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না রামলোচন। কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেই জবাব দেন, না···মানে···বয়েস হয়েছে। তেমন আর খাটতে পারিনে···

আমাদের ভুল বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। যেমন আছেন তেমনই থাকুন। প্রয়োজন বোধ করলে আমরাই ছুটি দেবার ব্যবস্থা করব।

রামলোচনবাবু তবু যেন কি প্রতিবাদ করতে যান। জয়া গম্ভীরভাবে বাধা দেয়, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ রয়েছে।···

নিতান্ত বাধ্য হয়ে দোরের দিকে দু'পা এগিয়ে যান রামলোচন।

জয়া পুনরায় পেছন ডাকে, দেখুন, কাল সকাল আটটার মধ্যে আমার সঙ্গে একবার বাংলোয় দেখা করবেন। ভুল হয় না যেন। এখন আসুন।··· গম্ভীরভাবেই কাজের মধ্যে ডুবে যায় পুনঃ।

নিরুপায় রামলোচন নীরবেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। আশ্চর্য দেমাক মেয়েটার।···জয়া পুনরায় হাসতে থাকে। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। কাজ রেখে নিজেও উঠে পড়ে বাংলোর দিকে।

চৌত্রিশ

সারা রাত ঘুমোতে পারেন না রামলোচন। ভোরে উঠেই ছুটতে হবে বরাহনগরে। কে জানে, কি অঘটন ঘটবে সেখানে! যা একটা হেস্ত নেস্ত আপিসে হয়ে গেলেই বাঁচা যেত। মেয়েটি ক্ষণ ক্রোধী। কোন কথাই শুনলে না। চাল চলন হাব ভাবে ভদ্রই মনে হয়। নিঃসন্দেহে উচ্চ শিক্ষিতা। তবু অমিয়নাথ বাবুর সঙ্গে কেন যে ও রকম অভদ্র ব্যবহার করল বুঝা যায় না। শেঠজীর কি নির্দেশ আছে ভগবানই জানেন। হয়ত চাকুরীর খাতিরেই এতটা রূঢ় হয়ে উঠেছে বেচারা। বাগান বাড়ীতে বাস করাও এক রহস্যময় ব্যাপার। অনেক অনাচারের কলুষ জড়িত পাপপুরী। যা'হোক, আপত্তি জানাতে গিয়েও যখন কৃতকার্য হননি তখন যেতেই হবে।···ভোরে উঠে দুর্গা নাম শরণ করে বেরিয়ে পড়েন রামলোচন। নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটা আগে এসেই উপস্থিত হন বরাহনগরে। জয়া প্রাতরাশ শেষ করে খবরের কাগজ দেখছিল। দৈনিক "নয়া দুনিয়া" কড়া মন্তব্য করেছে গতকালের ঘটনার ওপর। নিশ্চয় অমিয়নাথের উস্কানি। ইতিপূর্বেও শেঠজীকে নিয়ে বার কয়েক কাদা ছুড়েছে উদ্ধত সম্পাদক। আশ্চর্য মনোবল! বিজ্ঞাপন দিয়েও মুখবন্ধ করা সম্ভবপর হয়নি। মনে মনে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে জয়া। বুঝি বা আলো দেখা যায় দিগন্তের ওপারে।···কই রামলোচন বাবু ত' এখনও এলেন না! বুড়ো মানুষের এতটা পথ আসতে হয়ত কষ্টই হচ্ছে। কিংবা অমিয়নাথই বিগড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা যে কিছুতেই হবার নয়। যেভাবেই হোক আনাতেই হবে ওঁকে। একমাত্র ভরসা।···ভাবতে ভাবতে 'নয়া দুনিয়ার' ওপর আর একবার দৃষ্টি প্রতিফলিত করে। চিন্তার অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে মুখে। দরোয়ান রাম সুন্দর এসে রামলোচনের

আগমন বার্তা জানায়। চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে জয়া। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসতে আদেশ করে। স্বাভাবিক সংযত-ভাবেই পুনরায় এসে বসে চেয়ারে।

লাল শুড়কী বিছান বাগান বাড়ীর পথ। দ্বিধাগ্রস্ত রামলোচন দরোয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে উপস্থিত হন বাংলোর প্রাঙ্গনে। চতুর্দিকের দৃশ্যপট কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কে যেন জোর করে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে বলির পাঁঠার মত। হয়ত চরম তিরস্কারই আজ ভাগ্যে আছে। কে জানে কি মতলব করেছে আত্মাভিমানী মেয়েটা ?···চেয়ার থেকে উঠে অভ্যর্থনা জানায় জয়া। ধীর শান্ত কমনীয় বাঙ্গালী মেয়ে। অনন্ত জিজ্ঞাসার ছোপ চোখে মুখে। হতবাক হয়ে যান রামলোচন। এই কি গতকালের রণরঙ্গিনী নারী! ভীষণা ভৈরবী! ···সবিনয়ে অনুরোধ করে জয়া, বসুন! ঠাণ্ডার মধ্যে এতটা পথ আসতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে আপনার ?

রামলোচন অভিভূত হয়েই উত্তর দেন, না-না, সামান্য এইটুকুন পথ। আমার কিছু মাত্র কষ্ট হয়নি। আপনি—

আপনি নয়, তুমি। আমি আপনার মেয়ের মত।

রামলোচন অধিকতর বিস্ময় বোধ করেন। পরিহাস করছে কি মেয়েটা ? অথবা ছলনা ?···শিশুর মতই সারল্যের হাসি মুখে। শোভনা বেঁচে থাকলে আজ হয়ত ওর মতই হ'ত। সহজভাবেই উত্তর করেন, হ্যাঁ মা, সত্যি তুমি আমার মেয়ের বয়সী। তবু···

তবু মেয়ের মত করে ভাবতে পারছেন না, কেমন ?

রামলোচন সহসা কোন উত্তর খুঁজে পান না। মনের কোনে ঝড় ওঠে। শোভনা, একমাত্র মেয়ে শোভনা। তাও আজ বেঁচে নেই।

নিশ্চুপ দেখে জয়া পুনরায় জের টেনে যায়, জানি এর জন্য আমার রূঢ়তাই দায়ী। হ্যাঁ, আমার রূঢ়তা। মানুষের ওপর কোন আস্থাই ছিল না,

আমার, আজও নেই। তবু প্রথম যেদিন আপনাকে দেখলাম কেন যেন বাবার কথাই মনে হ'ল। আঘাত দিতে চেয়েও পারলাম না অমিয়নাথবাবুর মত আপনাকে আঘাত করতে। হয়ত' দুর্বলতা। কিংবা…

বুঝেছি মা, তুমি পরম দুঃখী। গভীর মর্মবেদনা লুকান আছে তোমার বুকের মধ্যে।

কাকাবাবু—

হ্যাঁ মা, জানিনা কি তোমার মর্ম যাতনা? তবু আমার মন বলছে চরম আঘাত পেয়েছ তুমি মানুষের কাছ থেকে।

আঘাত? হ্যাঁ আঘাতই বটে। এমন নিষ্ঠুর আঘাত যা কোন সভ্য মানুষ কোন সভ্য মানুষের কাছে আশা করতে পারে না।…কিন্তু থাক সে কথা। আপনি…

থাক কেন মা? বাধা না থাকলে তোমার এ বুড়ো ছেলেকে সচ্ছন্দে বলতে পার। মা, আমিও পরম দুঃখী। তোমার মতই আমার আর একটি মা ছিল কিন্তু আজ আর বেঁচে নেই…জামার হাতায় চোখ মোছেন রামলোচন।

জয়া বিহ্বলের মত বলে চলে আত্মকাহিনী। বৃদ্ধের চোখের জল শুকিয়ে যায়। হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে ওঠে নয়ন তারকা। কিষেনলাল, শয়তান কিষেনলাল এতটা নীচ! এমনই জঘন্য তার প্রবৃত্তি!

জয়ার চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে। বলতে বলতে কখন যেন থেমে গেছে। আঁচলে চোখ মুছে পুনরায় সম্বোধন করে, কাকাবাবু—

হ্যাঁ মা, সত্যি তুমি শক্তিময়ী। ভারত যদি আপনার পথ খুঁজে পায়, তবে তোমার মত বীরাঙ্গনার চেষ্টাতেই পাবে।

আর পুরুষ? সে কি নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবে কাকাবাবু?

তারাও নিশ্চেষ্ট বসে নেই মা। হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ

আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বার্থান্বেষীর চক্রান্তে শতধা বিচ্ছিন্ন তারা, দুর্বল। ভারতের মুক্তিকামী নারী পুরুষকে এবার একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে অটুট সংগ্রামী শক্তি।

ইউনিয়ন তাহলে আপনারা ভেঙে দিলেন কেন কাকাবাবু ?

ভেঙে দিইনি মা। তোমার প্রচণ্ড শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারলুম না।

আমার প্রচণ্ড শক্তি !...জয়া বিস্মিতভাবে হাসতে থাকে।

রামলোচন গম্ভীরভাবেই বাধা দেন, বুঝেছি মা, তুমি কি বলতে চাও। রূঢ়ভাবে আঘাত দিয়ে তুমি আমাদের শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলে।

ঠিক তাই কাকাবাবু।

দেখলে ত' মা, স্বার্থান্বেষীর চক্র কেমনভাবে আমাদের টুকরো টুকরো করে ফেলল ? অবনী, বলাই, লক্ষ্মীর সংখ্যা কম নেই মা।

কিন্তু এগিয়ে আমাদের যেতেই হবে কাকাবাবু।

নিশ্চয়।

তাহলে আবার চেষ্টা করুন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ আজ শক্তিহীন, দুর্বল। মুখস্ত করা কেতাবী বিদ্যায় তারা শুধু জটপাকাতেই জানেন। সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেন না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আরও তলা থেকে।

বল মা, তুমি কি ভেবেছ ?

আচ্ছা কাকাবাবু, অমিয়নাথবাবু কি ফ্যাক্টরীতে যোগদান করবেন না ?

না মা। গতকাল রাত্রে তিনি আমার বাসায় এসেছিলেন। নিজকে বড়ই অপমানিত বোধ করেছেন তিনি।

দেখলেন, কেমন আত্মপ্রবঞ্চনা ? মামাবাড়ীর আব্দার যেন চাওয়ামাত্র মালিক সমস্ত দাবী মেনে নেবেন !

তিনি কিছুই চাননি মা। শুধু বিদায় চেয়েছিলেন তোমার কাছে।

জয়া হেসে হেসেই উত্তর করে, আচ্ছা আপনিই বলুন ত', তাঁকে কি আমি বিদায় দিতে পারি ?

কেন মা ?

কোন সৈনিক যদি ভুল করে, তবে কি অপর একটি সৈনিকের উচিত নয় তাকে শোধরে দেওয়া ?

মা—

হ্যাঁ কাকাবাবু, আমি চাই আপনারা উভয়েই ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পুনরায় কাজ শুরু করুন। আপিসে ছিল কৃত্রিম মর্যাদাসম্পন্ন নির্জীব কেরাণীর দল। তারা নানা কারণেই আজ দুর্বল। ফ্যাক্টরীতে হাজার হাজার মানুষ। কেউ তারা ভাল করে খেতে পরতে না পারলেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অনন্ত শক্তির উৎস।

রামলোচন যেন সহসা সম্বিৎ ফিরে পান। উল্লাসে লাফিয়ে ওঠেন, বুঝেছি মা তোমার ইঙ্গিত। জীবনের পরপারে দাঁড়িয়েও আমার সাহস আছে সেই মহাতীর্থে যাবার। তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

সাহসী সৈনিকের পথ চির মুক্ত। বেশ, কালই আমি আপনাকে বদলি করে পাঠাচ্ছি।

আমার মনে হয় মা, তোমার কথা বলে অমিয়নাথবাবুকেও রাজী করাতে পারব।

না কাকাবাবু, তাঁকে যেতে হবে আমার ওপর গভীর অশ্রদ্ধা নিয়েই। প্রকৃত যোদ্ধা হলে তিনি আপনার কথাতেই রাজী হবেন। চকমকির পাথর ঠুকবার দরকার হবে না।

ঈষৎ হাসিতে রামলোচন প্রত্যুত্তর করেন, বুঝেছি মা, শত্রুভাবেই তুমি তাঁকে জাগাতে চাও।

ঠিক তাই কাকাবাবু।

বয়োকনিষ্ঠা হলেও তুমি কৌশলী নায়িকা মা। বৃদ্ধের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

অভিনন্দন জানাবার দিন আজও আসেনি কাকাবাবু। শুধু পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে চাই। অনেকটা বেলা হ'ল। আপনাকে এখনও চা দেওয়া হয়নি।

চা পান ত' আমি করি না মা। যদি আমাদেব আলোচনা আপাতত শেষ হয়ে থাকে, তা'হলে উঠতে চাই। আমাকে আবার এক্ষুনি অমিয়নাথ-বাবুব বাসায় যেতে হবে।

তাতাতে বোধ হয়?…ঈষৎ হাসতে থাকে জয়া।

হ্যাঁ মা, বুড়ো হলে কেরাণীব আব কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। দেখি জোয়ানের রক্ত কতটা গরম।

একটু ভুল হ'ল কিন্তু কাকাবাবু। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মন্ত্রীরাই বুড়ো। কেবাণীরা নিঃসন্দেহে বুদ্ধিজীবী।

হাসতে হাসতেই রামলোচন উঠে দাঁড়ান, তাহলে আসি মা?

আজকের নয়া দুনিয়া দেখেছেন কি?…জয়া গতি রোধ করে।

না মা, খুব ভোবে উঠে ছুটতে হযেছে। এখনও দেখতে পারিনি।

এই দেখুন।…ফাইলের নীচে থেকে পত্রিকাখানা টেনে নিয়ে রামলোচনের হাতে দেয় জয়া।

আঁৎকে ওঠেন রামলোচন,…শেঠ কিষেনলালের আপিসে রহস্যাবৃত ভাবে নারী সেক্রেটারী নিয়োগ…নিষ্ঠাবান বয়োবৃদ্ধ কর্মচারীদের অযথা হেনস্তা—ইউনিয়ন কর্মিদের দলে দলে ছাঁটাই…শহর হতে হেড আপিস সুদূর পল্লী ফ্যাক্টরীতে স্থানান্তরিত…ইউনিয়ন ভাঙার অভিনব পন্থা।…চোখ ঝাপসা হয়ে আসে রাম লোচনের।

জয়া হাসতেই প্রশ্ন করে, কেমন লিখেছে কাকাবাবু?

না মা, নয়া দুনিয়া মেহনতী মানুষের [illegible] মুখপত্র হলেও এক্ষেত্রে শালিনতা [illegible] রয়েছে। একজন মহিলার···

ভুল করছেন না কাকাবাবু, ওরা আপনার মত করে আমাকে জানেন না। আর তা জানা উচিতও নয়। আপনার সম্মুখে যে নারী দাঁড়িয়ে আছে সে বেশ খুশিই হয়েছে ওদের বীরত্বে। তবে সেক্রেটারী জয়ার পরিচয় কাল আপিসে পাবেন। আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই আমি আমাদের এটর্ণিকে জানিয়ে দিয়েছি এবিষয়ে 'মুভ্' করতে।···

রামলোচনের মুখাবয়ব সহসা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। নয়া দুনিয়ার ভীষণ অর্থ সংকট। টাকার বিচারে পরাজয় সুনিশ্চিত তার।···

জয়া কতকটা অনুমান করেই পুনরায় আরম্ভ করে, মেঘ দেখে ভয় হচ্ছে কি কাকাবাবু?

না মা, আমি ভাবছি···

ভাবুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন। দেশশুদ্ধ লোককে ভাবাবার জন্যই আমাকে জোরের সঙ্গে চাবুক চালাতে হবে।···হ্যাঁ, আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

যাই মা। বৃদ্ধের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

জয়া হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। চৈত্রের কাঠ ফাটা রোদ্দুর মাথায় করে অদৃশ্য হয়ে যান রামলোচন।

পঁয়ত্রিশ

মনুমেণ্টের পাদদেশে বিরাট জন সমাবেশ। আণ্ডেস মিলে বাব দিন ধর্মঘট চলেছে। মালিক আর সরকার পক্ষ একজোট হয়ে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন ধর্মঘট। নতুন লোক নিয়োগের চেষ্টা চলেছে মিলে। ইউনিয়ন সেক্রেটারী সহিদুল্লা উস্কানীর দায়ে কারারুদ্ধ। মালিকের অনুরোধে সরকার পক্ষের সশস্ত্র বাহিনী সর্বক্ষণ প্রহরারত মিল গেটে। পঞ্চাশ গজের মধ্যে পিকেট করা নিষিদ্ধ। দালালরা ঘুরে ঘুরেও কোন নতুন লোকের হদিস পাচ্ছে না। ধর্মঘটী মজুরদলের প্রখর দৃষ্টি রয়েছে সর্বত্র। অবশেষে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে নিয়োগের কথা হয়েছে। অনাহারক্লিষ্ট হতভাগ্যের দল, নিরুপায়। নৈতিক বাঁধ ভেঙে গেছে। সরকার পক্ষের সকল প্রকার সাহায্যই প্রায় বন্ধ। শিবির জীবনে কিছু কিছু মিললেও উন্নত-মনা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় সেখানে আশ্রয় নেওয়া। দলে দলে ভর্তি হয় এসে মজুরের খাতায়। মন্দ কি? তবু দু'দিন কোন রকমে বাঁচতে পারবে। অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে না।...

দিন দুইয়ের মধ্যেই পুনরায় চালু হবে 'মিল'। দু'হাজার উদ্বাস্তু শ্রমিক ভর্তি হয়েছে। মোটা বেতনের কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগদান করেনি। মালিকের স্নেহ পুষ্ট হয়েই পুচ্ছ নাড়ছে তারা। ধর্মঘটীদের মহা সংকট উপস্থিত। একদল ক্ষুধার্তকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে আর একদল ক্ষুধার্তের বিরুদ্ধে। করিম সাহেব খনি অঞ্চল থেকে ফিরে এসেছেন। আনন্দমোহন বাবু ও সতীনাথকে সঙ্গে করে সাক্ষাৎ করেন তিনি উদ্বাস্তু মহামণ্ডলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। অভাব তাদের আছে। তাই বলে দু'দিন ধরে চলে ঘরোয়া বৈঠক, সলা পরামর্শ। অবশেষে

স্থির হয় কেউ তারা কাজে যোগদান করবে না। দুঃখীজনের পাশে এসে দাঁড়াক দুঃখীজন। তবে তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতেও একযোগে কাজ করে যেতে হবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে। প্রবল বেগে চাপ দিতে হবে সরকারের গাফিলতি আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে। দালালের মধ্যস্থতা ব্যতীত কোন প্রকার ঋণ পাওয়া সম্ভবপর নয়। ছ'মাস; একবছর এমনকি দু'বছরেও কোন কোন হতভাগ্যের আবেদন পত্র বিবেচনা করে দেখা হয় না।...জমি সংগৃহীত না হলে গৃহ নির্মান ঋণ দানের ব্যবস্থা নেই। অথচ মোটা সেলামী আর অতিরিক্ত মূল্য দিয়েই জমি সংগ্রহ করতে হয় অসহায় মানুষকে। হাজার অনুরোধ উপরোধেও রাজী করান যায়নি সরকারকে সরাসরি বিলি ব্যবস্থায়।...ঋণের টাকা হাতে পেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। নিঃস্ব মানুষ সাধারণ ধার দেনায় তলিয়ে যায় তদ্দিনে। তাই ঘুষ আর দালালী দিয়ে যে অর্থ হাতে আসে তা ধার শোধ করতেই ফতুর হয়ে যায়। গৃহ নির্ম্মাণ কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য আদৌ সম্ভবপর হয় না। সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। শুধু অসাধু প্রতিপন্ন হয়ে গালাগালি খেতে হয় অধিকাংশকে। সরকার ভেবে দেখেন না, নিঃস্ব মানুষ দীর্ঘ এই সময় খায় কি, থাকে কোথায়।... সর্বভারতীয় ব্যাখ্যায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় কতক কতককে যত্রতত্র। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কোথাও টিকতে পারে না বেশী দিন। ঘর বাঁধবার আশা নিয়ে যারা যায় ফিরে আসে তারা হতাশ হয়ে। 'আঞ্চলিক বিভেদ, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা এবং দরদহীন নৈতিক চাপ অসহনীয়।...সুতরাং বাংলা দেশেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন বোধে সাংস্কৃতিক যোগ রেখে সীমানা বাড়াতে হবে খণ্ডিত বাংলার। ভাষার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে বৃহত্তম সবল সুস্থ জাতি।...কোটি কোটি টাকার ফিরিস্তির বদলে সরকারকে জন সমক্ষে প্রমাণ করতে হবে, আত্মীয় স্বজনের পেট না ভরিয়ে, প্রকৃত ক'জন উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন সম্ভবপর হয়েছে।

…সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হয় সর্ব-সম্মতিক্রমে। নয়া দুনিয়ার পৃষ্ঠা জুড়ে ঘোষিত হয় ব্যাপক ধর্মঘটের বিজ্ঞপ্তি। সমুহ প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আন্দোলন। তারপর সুযোগমত সমস্ত ভারত জুড়ে। ব্যাঙ্ক, সদাগরি আপিস, যানবাহন, স্কুল, কলেজ, হাট, বাজার, কাছারী, সিনেমা, সব বন্ধ। প্রগতিশীল মানুষ এগিয়ে যাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা অতিক্রম করে। উদ্বাস্তু আর শ্রমিকের সমন্বয়ে সংগ্রামী শক্তি প্রবলতর হয়ে উঠবে শোষিত মানুষেব। জয়ের পথে এগিয়ে যাবে অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষ।…

ময়দানের সভা বিকেল পাঁচটায়। লক্ষ লক্ষ নরনারীর মিছিল চলেছে মহানগরীর প্রধান প্রধান রাস্তা অতিক্রম করে। করিম সাহেব সভাপতি। প্রধান বক্তা আনন্দমোহনবাবু। সতীনাথও কিছু বলবে। সাধ্যমত বিজয়াও চেষ্টা করবে।…

মিছিল করে আসছে গ্রাম গ্রামান্তর হতে চাষী, মজুব, নিঃস্ব নরনারী। দলে দলে আসছে শিবির কলোনী থেকে অসহায় উদ্বাস্তুবা। লাল ঝাণ্ডা হাতে করে শিল্পালয়ের বঞ্চিত শ্রমিক মজুররা। ছাত্র, কেরাণী, শিক্ষক, দোকান কর্মচারী হাজার হাজার লাখ লাখ। ক্ষুধিত গণদেবতার পদভরে প্রকম্পিত মহানগরী। প্রতিক্রিয়াশীল কুটচক্রীবা বিভ্রান্ত। সসস্ত্র সৈনিক, পুলিশ আর গোয়েন্দায় গিজ গিজ করছে পথ, ঘাট, ময়দান। ভাড়াটিয়া গুণ্ডা আর দাঙ্গাবাজরা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।…মিছিল আসছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম থেকে। লাল ঝাণ্ডা, নেতাদেব প্রতিচ্ছবি আর দাবীর ফলকে সুসজ্জিত হয়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে প্রকম্পিত দিগবলয়। অলিন্দে অলিন্দে শিশু, বৃদ্ধ, গৃহলক্ষ্মীরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, ধ্যানভরে দেখছে। স্বেচ্ছা সেবকরা ক্লান্ত দেহ এ্যাম্বুলান্সে তুলে নিয়ে শুশ্রূষা করছে। ফেটে পড়েছে জনস্রোত নবতর প্রেরনায়।…বন্ধন থেকে মুক্তি। শোষণ থেকে মুক্তি। অনাচার থেকে মুক্তি…

মনুমেন্টের পাদদেশে রচিত হয়েছে বিরাট বক্তৃতা মঞ্চ। সুশোভিত সুউচ্চ। সাংবাদিক, বক্তা, অতিথিতে ভরপুর। পৎ পৎ করে উড়ছে বিজয় পতাকা। লাউড স্পীকারে লাউড স্পীকারে ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ময়দান। কুচক্রীদের নাশকতা মুলক কাজ থেকে রেহাই পাবার জন্য সর্বত্র রয়েছে স্বেচ্ছা সেবকগণ। সম্মুখে যতদুর দৃষ্টি যায় কেবল মাথা আর মাথা। শ্যামল মাঠ কালো পরচুলা পরেছে।···

কিষেনলালের ফ্যাক্টরী জোর করে চালু রেখেছে জয়া। প্রতি বিভাগে বিভাগে নিযুক্ত করেছে গুপ্তচর। মাথা তুললে কারও নিস্তার নেই। ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা হাত উঁচিয়েই আছে। মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে।

রামলোচন, অমিয়নাথের চোখে ঘুম নেই। দেশ-জোড়া আন্দোলনে নিশ্চুপ বসে থাকা অসম্ভব। যত খুশি অত্যাচার হোক, এগিয়ে যেতেই হবে ওদের। নাইট সিফ্‌টে ইস্তাহার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিস্রাবী ভাষা। অতর্কিতে কোথায় কার হাত দিয়ে বিলি হয়ে গেল কেউ টের পেল না। গুণ্ডারা পাইকারী জুলুম শুরু করে। ধন্যবাদ, কেউ বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনা। মুখ বুজে সহ্য করে যায় সকলে। স্পিনিং সেডের ফটকে জগন্নাথ ধরা পড়েছে। ডাণ্ডার আঘাতে সামনের দুটো দাঁত ভেঙে দিয়েছে জোয়ান ছেলেটার। তবু মুখে টু শব্দটি নেই। পরদিন অর্দ্ধেকের ওপর শ্রমিক অনুপস্থিত থাকে ধর্ম্মঘট উপলক্ষ্যে। তিরস্কৃত হয় গুণ্ডারা জয়ার কাছে। ছাটাইয়ের ভয় দেখায় এসে কিষেনলাল। অমিয়নাথ, রামলোচন বাবুও আসেননি যানবাহনের অজুহাতে। জয়া খুশিই হয়েছে মনে মনে। যদি পুরো বন্ধ করাতে পারতেন তাহলে ধন্যবাদ দিত রামলোচনকে। অমিয়নাথের সাহসও কম নয়। ফ্যাক্টরীতে যোগদান করে বুক ফুলিয়েই ধকল সহ্য করে চলেছে। মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে জয়া রামলোচনকে নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে। ধারে কাছে কাউকে না দেখে আরও হাজার

টাকা দাবী করেন রামলোচন। গোপনে দু'হাজার টাকা দিয়েছিল জয়া হরজ্রালের কাছে। দূর দুরান্তের পথ হেঁটে উপস্থিত হয়েছিল নিঃস্ব মানুষেরা। পেট ভরে খাওয়াতে হয়েছে সকলকে। শহরের অতিথি, ক্ষুধার্ত্ত গণদেবতা। ডাল, ভাত, রুটি, তরকারী। মায়েরা বোনেরা নিজের হাতে রেঁধে খাইয়েছেন। জোয়ান ছেলেরা কোমড়ে গামছা বেঁধে পরিবেশন করেছে। ফিরতি পথে মাথাপিছু দু'খানা করে রুটি ও কিছুটা পরিমান গুড় দিতে হয়েছে দক্ষিণ গাঁয়ের সকলকে। অনেক দূরের পথ যেতে হবে বেচারীদের। কিনে খাবার সামর্থ্য নেই। জয়া খুশি মনেই পুনরায় হাজাব টাকা দান করে। এ দান সেক্রেটারী জয়াব দান নয়। গৃহহাবা সর্বহারা বিক্তা নাবীর যৎকিঞ্চিৎ কর্তব্যসাধন। উৎসর্গীকৃত জীবনের প্রথম সুযোগ।

কিষেনলালের গলা শোনা যায়। সম্ভবত এদিকেই আসছে। ক্রোধে ফেটে পড়ে জয়া রামলোচনের ওপব, কাল থেকে আপনি ফ্যাক্টরীর ভেতর গিয়ে কাজ করবেন। নাইট সিফটের সুপারিন্টেন্ডেণ্ট। না না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না আপনার। যেমন কুকুর তেমন ডাণ্ডা প্রয়োজন, যান।

জয়ার কড়াকড়িতে খুশি হয় কিষেনলাল। অমিয়নাথকেও আপিসের কাজ হতে ফ্যাক্টরীর মধ্যে ষ্টোরকিপারের পদে বদলি করে দেয়। গলদ-ঘর্ম ডিউটি। কিষেনলাল হাসতে হাসতেই উচ্ছ্বাস জানায়, এবার ঠিক শায়েস্তা হবে পাজীরদল। আমি তাহলে উঠি বিবিসাহেবা। কড়া নজর রেখো বদমাশগুলোর ওপর।…কিষেনলাল চেম্বার ছেড়ে মোটরে গিয়ে ওঠে। জয়া আপন মনেই হাসতে থাকে।

ছত্রিশ

প্রতীক ধর্মঘটের বিরাট সাফল্য 'নয়া দুনিয়ায়' ফলাওকরে প্রকাশিত হয়েছে? প্রামান্য ফোটোতে প্রদীপ্ত জয় যাত্রা। ব্যবসায়ী বুদ্ধি বজায় রাখতে অন্যান্য পত্র পত্রিকাগুলিও কিছু কিছু সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের পত্রিকা "যুগযাত্রা ভীষণ উষ্মা প্রকাশ করেছে। তার মতে সরকারের উচিত এক্ষুনি এই আন্দোলনকে গলা টিপে মেরে ফেলা। অন্যথায় দেশের ও ধর্মের সর্বনাশ সুনিশ্চিত।...

উন্মত্ত জনতা ক্ষেপে উঠেছে নয়া দুনিয়ার জন্য। সীমাবদ্ধ শক্তিতে রাশি রাশি লোকের চাহিদা মেটান সম্ভবপর নয়। হকাররা দ্বিগুণ চতুর্গুন মূল্য হেকেও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। একজন কিনেত দশজন ছেকে ধরে। টানাটানিতে ছিঁড়েও যায় দু'চারটে। শোষিত মানুষের আশা ভরসা ওর বুকে।

কিষেনলালের সমস্ত আপিস ফ্যাক্টরীতে উঠে এসেছে। অন্তরে গভীর অসন্তোষ থাকলেও বিনা বাক্য ব্যয়েই কাজ করে চলেছে কেরাণীর দল। এইত মাত্র দু'দিন হয় নাকে কানে খৎ দিয়ে চাকরী বজায় রেখেছে। সুতরাং অনর্থক গোলমালে কাজ কি? সুবোধ ছেলের মতই যে যায় কাজ করে যায়। দুনিয়ার সঙ্গে কোনরূপ যেন সংযোগ নেই হতভাগাদের। অবণী ভট্চায চিফ একাউণ্টট্যাণ্ট। জয়ার অনুপস্থিতে সেই আপিসের কাজ দেখে। য্যাম্নার কন্ডিসও চেম্বার না হওয়া পর্যন্ত কিষেনলাল, জয়া স্থায়ীভাবে বসবে না। উপরন্ত সিটি আপিসেও না বসলে নয়। অনেক-গুলো কনট্রাক্ট পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। বেলা প্রায় তিনটে আন্দাজ জয়া মিশন রোর দিকে রওনা হয়ে যায়। কিষেনলাল একাকী কতগুলো জরুরী হিসেব মিলিয়ে দেখছিল। জয়ার উপস্থিতিতে খুশিই হয়। ইদানীং একটু

চেম্বারে বসতে হচ্ছে উত্তরকে। কেননা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া অধিকাংশ আসবাব পত্রই ফ্যাক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। সিটি আপিসের আয়তনও এখন খুব ছোট। কর্ম্মচারীর মধ্যে একা বলাই শীল ও একজন চাপরাশি মাত্র। জয়া চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসতেই কিষেনলাল উচ্ছ্বাস জানায়, বিবিসাহেবা, তোমার হিম্মৎ আছে। গোটা বাংলা দেশেই কাল হরতাল গেছে। কিন্তু তোমার আপিস প্রায় পুরোপুরিই বজায় রেখেছিলে। এমন কি ফ্যাক্টরীও আংশিক চালু ছিল।

জয়া ক্ষীণ হেসে উত্তর করে, তা ছিল বটে। তবে এখনও গোটা কয়েক বদমাশকে সায়েস্তা করতে হবে।

বেশী ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। গোটা দেশটাই ক্ষেপে উঠেছে।

তাত উঠবেই। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় যে হতভাগাদের।

যা বলেছ। নচ্ছাড়গুলোর যেন কিছুতেই আশ মিটছে না। এই ত্যাখ না, ট্রাইব্যুন্যাল এওয়ার্ডের প্রায় সবগুলো শর্ত্তই আমরা মেনে নিয়েছি। তবু ব্যাটাদের সন্তুষ্টি নেই। গোটা রাজ্যটাই যেন ওদের বিলিয়ে দিতে হবে। তোমাকে বলে রাখছি বিবিসাহেবা, চাকর যদি চাকরের মত না থাকে; তাহলে কি করে সায়েস্তা করতে হয় তা কিষেনলালের জানা আছে।

সেত ঠিকই।...জয়া অধিকতর উস্কিয়ে দেয়।

না না, তুমি যখন দেখছ তখন বলার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এখানকার মাটিতে ওসব বিদেশী বুলি চলবে না। ব্যাটাদের ভগবানে পর্যন্ত বিশ্বাস নেই!

জয়ার মনে মনে হাসি পায়। তবু সমর্থন জানিয়েই উত্তর করে, কি করে থাকবে? মরণ যার বেড়েছে যে?

হো হো করে হাসতে হাসতে উত্তর করে কিষেনলাল, তুমি ঠিক বলেছ বিবি সাহেবা। মরণই আজ ওদের অদৃষ্টের লিখন। আরে বাপু, জ্বলে জ্বালা ভগবান। বিপদে পড়েছিস ভগবানকে ডাক। ওসব বিদেশী

ম্লেচ্ছের ধ্বজা উড়িয়ে লাভ কি ? ওরা কি তোদের খেতে দেবে, না পরতে দেবে ? সরকারের গাফিলতির জন্যই ব্যাটারা আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে। নইলে কবে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যেত !

সেত ঠিকই।···বাহ্যিক হেসেই প্রত্যুত্তর করে জয়া। মনে মনে গালা-গাল দেয়, ভণ্ড গাড়ল, এই তোমার বৈরাগ্য ? দুঃখীজনের প্রতি দরদ ? দু'দিন আগেও না তোমাকে রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বেড়াতে হয়েছে ? কাঁধের দাগ না এখনও মিলায়নি ? তোমার মুখেই দারিদ্র্যের নিন্দা ? চুরি করে অর্থ উপার্জন করে তুমিই করছ কৌলিন্যের বড়াই ?···

মৌন দেখে কিষেনলাল পুনশ্চ প্রশ্ন করে, তোমার কি হ'ল বিবি সাহেবা ?

না শেঠজী, আমি ভাবছিলাম, গোড়াতেই ওদের বিষ দাঁত উপড়ে ফেলা দরকার।

বেশ, তোমার যা খুশি কর। আপাততঃ ওসব বাজে চিন্তা রেখে দুটো কাজের কথা শোন।

জয়া উল্লসিত হয়েই আগ্রহ জানায়, কি কাজ শেঠজী ?

তুমি আসার মিনিট করেক আগে মুর্ সাহেব উঠে গেল। সমস্ত কারবার বেচে দিতে চায় ওরা।

কেন ?

এদেশে যেভাবে সব কুলি কামিনরা ক্ষেপে উঠেছে তাতে ভরসা পাচ্ছে না।

কিন্তু সে বিপদত আমাদেরও আছে।

তা আছে। তবে মালিক সঙ্ঘ থেকে এবার আমরা সরকারকে যে ভাবে চাপ দিয়েছি তাতে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বর্তমান সরকারের [illegible]তা নেই, আমাদের চটিয়ে কোন কাজ করতে পারে। তাছাড়া ঘুষ খাবার [illegible]ই।···

তা যেন হল। কিন্তু কত টাকা দিতে হবে বিলেতী কোম্পানীকে?
কিষেনলাল হেসে হেসেই উত্তর করে, আমি ষাট লাখ টাকা দর দিয়েছি। সম্ভবতঃ ওতেই হয়ে যাবে। বড়জোর এখানকার ম্যানেজার ব্যাটার পকেটে কিছু দিতে হতে পারে। বিলেত থেকে আর কে দেখতে আসছে?

ষাট লা—খ! অত টাকা······

তুমি কিচ্ছু ভেব না। ষাট লাখ কেন? দু'কোটি ষাট লাখ দিতেও কিষেনলালকে বেগ পেতে হবে না। তবে ঝামেলা হবে একটু ইন্‌কাম ট্যাক্স নিয়ে।···

জয়ার মস্তিষ্কে ঘোর পাক লাগে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কঙ্কালগুলো যেন নাচ শুরু করে দেয় চোখের ওপর।···ডাণ্ডা উঁচিয়ে কয়লার বায়না ধরে পাকিস্থানী ঘাতকরা। এখানকার শেঠরা যে কোন মূল্যে পাট কিনতে বাধ্য করার সরকারকে···জয়াকে হতবাক দেখে কিষেনলাল নিজের কথার জের টেনে যায়, আচ্ছা তোমাকে ওনিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা গান্ধী ফণ্ডে দিয়েছি। আরও না হয় লাখ খানেক খরচ হবে। কারবারটা বড় লাভের বিবিসাহেবা।···

জয়া বিহ্বলের মতই প্রশ্ন করে, কি কি কাজ ওদের?

হাড্‌সন হামিলটনের নাম শোননি? যাদের অনেকগুলো চা বাগান, কয়লার খনি ও একটা পেপাল মিল রয়েছে? চা বাগানগুলো প্রায় আমাদের বাগানের সংলগ্ন। নিতে পারলে চমৎকার হবে।

জয়া কৃত্রিম উল্লাসে অনুরোধ করে, তাহলে নিয়ে ফেলুন।

হে—হে, তুমি দেখছি আমাকে বোকা ঠাওরালে বিবিসাহেবা। তুমি ধরে নিতে পার ওগুলো আমাদের হয়ে গেছে। মুন্সী সাহেবকে আমি আমাদের এটর্নীর কাছে দলিল পত্র দাখিল করতে বলে দিলাম। টাইটেলে কোনরূপ গোলমাল না থাকলে ষাট লাখ আর এক কোটি, কিছুতেই আটকাবে না।···আচ্ছা বসে বসে [illegible]

তুমি এই হিসেবগুলো পরীক্ষা করে ছাখ। আমি একবার ওদের আপিসটা দেখে আসি।···মোটর নিয়ে বেরিয়ে যায় কিষেনলাল।

জয়া কাজে মন দিতে পারে না। দাঙ্গা, মহামারী, মন্বন্তর প্রপীড়িত প্রেতগুলো যেন ছায়া মূর্তিতে চোখের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। জহ্লাদরা পেছন তাড়া করেছে।···

সাঁইত্রিশ

গুড ফ্রাইডের ছুটি। অপিস বন্ধ একটানা চারদিন। দৈনন্দিন কাজের তেমন ঝামেলা না থাকায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পায় জয়া। সত্তর লক্ষ টাকায় হাড্‌সন হ্যামেলটনের আপিস সম্পূর্ণ কিনে নিয়েছে কিষেনলাল। গোপনে জেনারেল ম্যানেজারকে ঘুষও দিয়েছে এক লাখ। মোটা লাভের ব্যবসা। দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর অর্থ পিশাচ। দুদিন আগেও বৈরাগ্যের বুলি আওরিয়েছে শয়তানটা। আজ হিংসায় উন্মত্ত। দয়া মায়ার ধার ধারে না। অর্থ, আরও অর্থ চাই। গোটা দুনিয়া করতলগত হলেও যেন ক্ষান্তি নেই। আগের রূপ অপেক্ষা বর্ত্তমানের রূপ অধিকতর ভয়াবহ। সেদিনের কিষেনলাল ছিল অশক্ত মাতাল, মোহগ্রস্থ। প্রলুব্ধ করে কিছু কিছু কাজ হাসিল করা যেত। কিন্তু আজকের কিষেনলাল দৃঢ়চেতা—কঠোর পুরুষ। আর্থিক কৌলিন্যে আলাদা জাতের মানুষ সে। শ্রমিক মজুরের জয়যাত্রা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। সামন্ত শিল্প সমাজ করতলগত করে পদানত করে রাখবে নীচুতলার মানুষকে। ভাগ্যবানের তাঁবে হয়ে থাকবে গোটা দেশ সমস্ত পৃথিবী।···নূতনভাবে মালিক সঙ্ঘের চক্রব্যূহ রচনার পথ খুঁজে চলে। আঘাতে আঘাতে যুদ্ধ শান্তির দেবে আন্দোলন

-কারীকে। শ্রমিক, মজুর। কতটুকু শক্তি তাদের? রসদ শূন্য হয়ে কতক্ষণ লড়তে পারবে তারা?···দুর্বল ক্ষীণজীবী, শতধা বিচ্ছিন্ন। প্রয়োজন হ'লে শাসন রজ্জু দিয়ে আরও শক্ত করে বাঁধা যাবে। নূতন নূতন দল মত খাড়া করে টুকরো টুকরো করে দেওয়া যাবে সঙ্ঘ শক্তি! টাকা, টাকা, কি না করা যায় টাকা ছিটিয়ে?···অচল অটল কিষেনলাল। দৃঢ় তার প্রতিজ্ঞা। মিশনরোর আপিস তুলে দিয়ে নিজের চেম্বার স্থানান্তরিত করে নিয়েছে হাড্‌সন হ্যামেলটনের আপিসে। জয়া সেক্রেটারী ঠিকই আছে। কিন্তু কিষেন ওর প্রতি আর তেমন আস্থা রাখতে পারছে না। এক ফোঁটা মেয়ে। তা'ছাড়া প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। কে জানে, কখন কি করে বসে?···উপরন্তু বদমাশ-গুলোর সঙ্গে পেরেইবা উঠবে কেন! হাড্‌সনের পূর্বতন ম্যানেজার ম্যাক্সওয়েল মুর্‌কেও বহাল রাখে। কড়া মেজাজের সাহেব। যুদ্ধ ফেরৎ। দুদিনেই হাবাতের দলকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিতে পারবে।···

সুনীল গগনে নির্মল চাঁদ উঠেছে। ঝির ঝির করে বইছে বসন্তের মাতাল বাতাস। বাংলোর বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে এলোমেলো ভাবছে জয়া। কি মূল্য তুচ্ছ জীবনের? আত্মীয় স্বজন সকলেই আজ বিচ্ছিন্ন। বাবা, মা, ভাই বোন কেউ বেঁচে নেই। এক মাত্র খোকন। তা'ও সুদীর্ঘ পথ বয়ে নিয়ে চলতে হবে ওকে। ততদিন কি বাঁচাতে পারব?···শয়তান কিষেনলাল সমস্ত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষত বিক্ষত দেহ মন। দুর্বলতার সুযোগ, হাড়ে হাড়ে নিয়েছে পাজীটা।···কে [illegible], ভবিষ্যৎ সর্বনাশের আরও কি ভয়ংকর মতলব আঁটছে? আশু [illegible]কল্পা দেখিয়ে হয়ত ভুলিয়ে রাখতে চায়। লম্পট বলে কি না, ব্যবসায়ের অর্ধেক ভাগ দেবে! এর পূর্বে আরও কতজনকে দিয়েছে?··· সতীনাথ, সেদিন যদি সতীনাকে ত্যাগ না করত! নিষ্ঠাবান, উদারচেতা দেশ প্রেমিক। ইচ্ছে করলে সারা জীবন তাঁর সঙ্গে কাজ করা যেত। দেশের কাজ, জাতির শত্রুদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রাম। আজ একা

একা কতটুকু করতে পারছে? রামলোচন অমিয়নাথ কি সাহস করে এগিয়ে যেতে পারবেন? একমাত্র আশা ভরসা।...সেদিন বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে সতীনাথ। ইচ্ছে করলে কি একবারও খোঁজ নিতে পারতেন না? বড় আঘাত পেয়েছে বেচারা...

মদের নেশার চেয়েও কাজের নেশার আকর্ষণ অধিক। কিষেনলাল আজ সেই নেশাতেই মশগুল। চূড়মার করে দিতে চায় সমস্ত প্রতিরোধ কারি শক্তিকে। হয়ত দিন কয়েকের মধ্যেই শুরু হবে তার হিটলারী তাণ্ডব।...পথ কোথায়? ভাল কবে বুঝে উঠতে পারে না জয়া, কেন পশুটা আজও অবধি খাতির করে আসছে ওকে? যখন যা চেয়ে পাঠাচ্ছে ঠিক পেয়ে যাচ্ছে। কাঁটা দিয়েই কি কাঁটা তুলতে চায় পাজীটা?... শয়তানকে বিশ্বাস কি?...রামলোচনের দল কি সহ্য করতে পারবে ওর ধকল? অর্থের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল পিশাচটা। আজ আবার কেমন সর্ব শক্তিতে শোষন করতে ব্যস্ত! ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বাগানের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করতে থাকে মন্থর গতিতে। রাশি রাশি রক্ত রাঙা গোলাপ চেয়ে আছে চোখ মেলে। ভুর ভুর করছে সুরভী সৌবভ। বিলেতী মরসুমি ফুলের গুচ্ছ দল বেঁধে নাচছে মৃদুল বাতাসে। নেশা গ্রস্থের মত বসে এসে জয়া পুকুরের মর্বেল পাথর বাঁধান ঘাটে। পরীর মুখ দিয়ে জল ঠিকরে পড়ছে ফোয়ারা থেকে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে ছেয়ে আছে অনন্ত আকাশ। মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে। পুকুরের স্বচ্ছ জলে সাঁতার কাটছে মরাল মরালী। বসন্তের বিচিত্র সৌন্দর্য গগনে ভুবনে। কিন্তু জয়ার মনে আনন্দের লেশ মাত্র নেই। বিষাদ ঘন দৃষ্টি যেন আবছা হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের পানে। কিষেনলাল, ঘাতক কিষেনলাল তেড়ে আসছে ডাণ্ডা উঁচিয়ে। রক্তের ঢেউ বইছে সবুজ প্রান্তরে। হাহাকারে ছেয়ে গেল দিগ দিগন্ত।...না না, তবু এগিয়ে যেতে হবে। জাগাতে হবে অসংখ্য গণদেবতাকে। কৃষক, মজুর, শ্রমিককে। কেরাণী, ছাত্র, শিক্ষককে।

ভয় কি? তুচ্ছ এ জীবন। মরতে যদি হয় মানুষের মতই মরবে।…রাম-লোচন অমরনাথ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। ঘন ঘন ইস্তাহার বিলি হচ্ছে ফ্যাক্টরীতে। ধরা পড়ে দুটি শ্রমিক জখমও হয়েছে। তবু বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি।…ইষ্টের সাধনা—অথবা মৃত্যু। সৈনিকের নিকট এছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। কিষেনলাল যদি ফাঁদ পেতে থাকে তবে সে ফাঁদে তাকেই নিক্ষেপ করতে হবে। নর দানবকে আবার ভুলাতে হবে মোহিনী মায়ায়। ছিনিয়ে নিতে হবে তার হাত থেকে জনতার চাবি কাঠি—শিল্প সম্পদ। পাত্রে পাত্রে আবার মাতাল করে তুলতে হবে।… ভাবতে ভাবতে ঘাট থেকে উঠে আসে জয়া বাংলোর দিকে।

রাত দশটা। প্রাচীর প্রান্তরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। জয়া শক্ত হতে চেষ্টা করে। শয়তানটা কি টের পেয়েছে ওর অভিসন্ধি?…উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করে চলে। একাকী উঠে আসে কিষেনলাল গাড়ী থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই অভ্যর্থনা জানায় জয়া, আসুন আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

যা'হোক তবু তুমি ভাবছিলে! আপিসে আজ বেহুদ খাটুনি গিয়েছে। একবার মনে করেছিলাম তোমাকে ডেকে পাঠাই।

কি আশ্চর্য! গাড়ী পাঠিয়ে দিলেই পারতেন! আমিত জানতুম না আপনারা আজ আপিস করবেন!

না না, তোমারও ক'দিন খুব খাটুনী গিয়েছে। একটু জিরিয়ে নেওয়া ভাল। মুর, সাহেব সকালে ফোন করলেন, জরুরী পরামর্শ দরকার। তাই দু'জনেই…

জয়া আপন মনেই ধাক্কা খায়। ঠিক বুঝতে পারে, কিষেনলাল ওর ওপর নির্ভর করতে পারছে না। তাই কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য সহকারেই বাধা দেয়, সেত ঠিকই! মিষ্টার মুর, যখন রয়েছেন তখন আর আমার প্রয়োজন কি?

না না, বিবিসাহেবা, তুমি দুঃখ কর না। সত্যি, আমি ভেবে দেখলাম, তোমাকে ওসব হৈ হাঙ্গামায় না বাখাই ভাল। ও ব্যাটার লাল মুখ। বদমাশগুলো যমের মত ভয় করে ওকে। তাছাড়া কোথায় আসামের চা বাগান আর কোথায় ধানবাদের কয়লার খনি। এতটা পথ তুমি ছুটোছুটি কবতে পারবে কেন? বরং এস, ঘরে বসে লাভের অঙ্ক কষে দেখি আমরা —মৃদু মৃদু হাসতে থাকে কিষেনলাল।

—তা বেশ। আপনি যা ভাল বোঝেন।

না না, এতে ভাল মন্দের কিছু নেই। মোর্দা কথা.আমাদের চাই টাকা আর সেই সঙ্গে চাই শয়তানের বাসা ভেঙে ফেলতে। আজকের নয়া দুনিয়া দেখছ?—মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে কিষেনলালের।

দেখছি।—কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে উত্তর দেয় জয়া

দেখেছ নচ্ছাড়গুলোর কাণ্ড? মাত্র ক'দিন আমরা নতুন আপিস হাতে নিয়েছি। এব মধ্যেই বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে। গার্ডেন এবং কোলিয়ারি ম্যানেজার উভয়েই সংবাদ পাঠিয়েছেন সেখানেও নাকি অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে।···আশ্চর্য ব্যাটাদের গোয়েন্দাগিরি। ঘরের কথা সবই দেখছি ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।

জয়া চমকে ওঠে। তবু কৃত্রিম ভাবেই উষ্মা জানায়, আমাদের উচিত কাল বিলম্ব না করে এবিদ্রোহ দমন করা।

সেই পরামর্শইত আজ মুর্ সাহেবের সঙ্গে হ'ল। শয়তানের বাসায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। তবে সাবধানে কাজ করা চাই। সাধারণ মানুষ না যাতে ক্ষেপে ওঠে।

তাত ঠিকই। কিন্তু উপায় কিছু স্থির করেছেন?

সাহেবের মাথা আছে বিবিসাহেবা। স্থির করেছে, শীগগিরই একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে খুব জোরালো ভাষায় শ্রম নীতির ব্যাখ্যা করবে। অহিংসা মন্ত্রের গুন কীর্তনে ঘুম পাড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে জাগ্রত

শক্তিকে। বিভাগীয় মন্ত্রী এবং রাজ্য-পালকেও আমন্ত্রণ জানাবে বলে স্থির করেছে। দু'টো চারটে ছোট খাট দান খয়রাতেরও প্রয়োজন হতে পারে…

জয়া মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে কৃত্রিম উচ্ছাস জানায়, তাহলে ত কথাই নেই। হাবাতের দলকে জাতিকলে ফেলে কুচি কুচি করে ফেললেও কেউ টের পাবে না।

তুমি ঠিক বলেছ বিবিসাহেবা। নয়া ভূমিয়ার বিরুদ্ধে এক সময় নিজেই তুমি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলে। আমিই তখন নানাদিক ভেবে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু কাল দেখবে, হাই কোর্টে প্রথম মানহানির মামলা দায়ের হয়েছে এই কিষেনলালের তরফ থেকে।

হ্যাঁ, তাই করুন। আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

শুধু তাই নয়। ভিন্ন উপায়ের ব্যবস্থাও কিছু করেছি…মুখায়ব কেমন যেন বীভৎস হয়ে ওঠে কিষেনলালের।

জয়া সঙ্গতি রক্ষা করেই উত্তর দেয়, নিশ্চয় নিশ্চয়। সম্ভবমত সব কিছুই করতে হবে।…

ঘড়িতে এগারটা বেজে যায়। কিষেনলাল উঠে দাঁড়ায়। মুখে শয়তানের হাসি। জয়া পাপচক্রের পূর্বাভাস জানবার উদ্দেশে বাধা দেয়, কিছু খাবেন না?

না, আজ আর সময় নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। তোমার ভাইটি কেমন আছে?

বেশ ভালই আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

থাক থাক ওকে আর জাগাবার প্রয়োজন নেই। কাল একটু সকাল সকাল আপিসে যাবার চেষ্টা করো।…বলতে বলতে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে কিষেনলাল। জয়া নিশ্চুপ হয়ে খানিক চেয়ে থাকে পথের দিকে। কি মতলব এঁটেছে শয়তানটা কে জানে?

আটত্রিশ

সন্ধ্যা ছ'টায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন। সভাপতি স্বয়ং শ্রম মন্ত্রী। প্রধান অতিথি রাজ্যপাল। শহরের খ্যাতনামা সাংবাদিক-গণ সহ গন্যমান্য বহু সরকারী বেসরকারী প্রধানগণের নিমন্ত্রণ হয়েছে। বিরাট ডাইনিং টেবিল জুড়ে সুসজ্জিত খানা পিনা। ফুলদানীতে ফুলদানীতে মনোরম পরিবেশ। নামে মাত্র টি পার্টি হলেও উপাদেয় ভোজ্য বস্তুর বিপুল সমাবেশ। কোটিপতি কিষেনলাল স্বয়ং আহ্বায়ক। সুতরাং বিন্দুমাত্র খুঁৎ থাকার উপায় নেই। সর্বত্র ওয়েটারগণ প্রতীক্ষারত। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন দু'টি পরিপাটি করে সাজান হয়েছে। উচু একটা টিপয়ের ওপর প্রার্থনারত গান্ধীজীর ফোটোগ্রাফ মাল্য ভূষিত। দু'ধারে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে ধূপদানীতে। কিষেনলালের পরনে দামী গরদের পোষাক। কানের হীরের টাব দু'টো সম্ভবত নূতন গড়ান হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোয় ঠিকরে বেরুচ্ছে জ্যোতি। ম্যাক্ওয়েল মুর্ প্রধান বক্তা। জয়াও কিছু বলবে। সভাপতির মঞ্চেই আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে উভয়ের। সাদা রংয়ের জর্জেট শাড়ী আর ব্লাউজে অপূর্ব মানিয়েছে আজ ওকে। ঘন কালো চুল স্কন্ধ পর্যন্ত বিন্যস্ত করে আচড়ান। হয়ত বা কোন বিলেতী সেলুনের সহায্য নিতে হয়েছে। সুগোল বাহু দু'টিতে স্বপ্নায়িত হয়ে উঠেছে সরু দু'গাছা হীরের বালা। কানের টাব থেকে ঠিকরে পড়ছে বিদ্যুচ্ছটা। সাচ্চা মুক্তোর মালা দু'লছে কম্বু কণ্ঠে। চিকচিক করছে বাম মনিবন্ধে সোণার ঘড়িটা। সটান বাংলো থেকেই এসেছে জয়া। স্বয়ং কিষেনলাল পর্যন্ত হতবাক। এতরূপ কোথায় লুকিয়ে ছিল ঐ সিগ্রীহিতা নারীর! দর্শককুলের চপল দৃষ্টি বার বার ধাক্কা খায় এসে চটুল নয়নে।… সভাপতি—ও প্রধান অতিথি বরণের পর উদ্বোধন সংগীত গেয়ে যায় বেতার

কেন্দ্রের কোন এক সুগায়িকা। পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করতে সতীনাথের কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছে। সংগীত প্রায় শেষ হয়ে আসে আসে উপস্থিত হয় সে। আসন গ্রহণ করেই আঁৎকে ওঠে। কে ও ওখানে সভাপতির পাশে! স্বর্গের অপ্সরা কি মর্ত্যের নেমন্তন্নে নেমে এসেছে! বিগত জন্মের কোন স্মৃতি জড়িত কি ওর সঙ্গে! কিন্তু সেত ছিল সাধারণ মাটির মানবী! এযে ··মাথা নত করে গান শুনতে চেষ্টা করে সতীনাথ। এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত ওর। না না, এ কখনও বিশ্বাস্য নয়। অমিয়নাথের মুখে শুনেছিল বটে তাদের আপিসের নারী কর্ত্রীর কথা। অসহ্য তার নিপীড়ন কাহিনী। কিন্তু সে নারী যে স্বয়ং জয়া একথা কখনও ভাবতে পারেনি। সামান্য কদিনের ব্যবধানে কি কখনও সম্ভবপর এমনিতর বদলে যাওয়া! যার নিজের দুঃখের অবধি নেই তার পক্ষে কি করে সম্ভবপর অন্য কোন দুঃখী জনকে আঘাত করা!···গান শেষ হয়ে যায়। সুর বক্তৃতা দিতে ওঠে, "···ভারত স্বাধীন হয়েছে। বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তাকে। জাতির কঠোর পরিশ্রমেই গড়ে উঠবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সমগ্র দেশ বাসীকে।···লাভের বখরা নিয়ে আত্মকলহে মাতলে চূর্ণ হয়ে যাবে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা।··· হাত তালির মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় সুরের বক্তৃতা। জয়া উঠে দাঁড়ায়। সভাপতি ও সমবেত ভদ্র মণ্ডলীকে নিয়ম তান্ত্রিক আবেদন জানিয়ে আরম্ভ করে, যারা কৃষক শ্রমিককে উসকিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে উদ্যত, তারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। তাদের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করতে হবে এই সমস্ত দুর্বল মানুষকে। ফাঁকা কথায় যারা দেশময় হিংসা বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলছে সরকারের উচিত তাদের কঠোর হস্তে দমন করা।···পূর্ববৎ হাত তালিতেই জয়াকেও সম্বর্ধনা জানান হয়। সতীনাথ মুখ বুজে সব শুনে যায়। একি স্বপ্ন না সত্য!···ভোজ্য বস্তুর কণা মাত্রও মুখে দিতে পারে না। নয়া দুনিয়ার প্রতিনিধি হয়ে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন

তিনিও অনুরূপভাবেই সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু সতীনাথ আজ উঠবে না। শেষ দেখে যাবে। জয়া, এইত সেদিনের সেই ফুটফুটে মেয়েটি। দুস্থ অবস্থায় ক্যাম্পে এসেছিল। উচ্চ শিক্ষিতা, স্বচ্ছ পবিত্র আচার ব্যবহার। আর আজ?…না না, অপমৃত্যু হয়েছে তার। এ কায়ারূপী প্রেত কারও।…

সভার কাজ সমাপ্ত প্রায়। চাহিদামত ফোটোগ্রাফও নেওয়া হয়ে যায় সাংবাদিকগণের। প্রধান অতিথি ও সভাপতি নিঃশেষে বর্ষন করে গেলেন দলীয় মহিমা। পাশে বসে যে ভদ্রলোকটি মনেব আনন্দে খাচ্ছিলেন তিনি তাগিদ দেন সতীনাথকে, কই মশাই, আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না?

অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দেয় সতীনাথ, শরীরটা ভাল নেই। আপনি…

জয়া মঞ্চ থেকে সব লক্ষ করছিল। বার কয়েক চোখাচোখি হওয়ায় মৃদু হেসেছে। কিন্তু সতীনাথ গুরু গম্ভীর। কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে তার সমস্ত মুখায়বে।

রাত প্রায় আটটা। সভার কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। নিমন্ত্রিতেরদল এক এক করে বেরিয়ে যেতে থাকে ফুটন্ত এক একটি গোলাপ ফুল হাতে।

কিষেনলাল হাত জোড় করে এসে সদরের কাছে দাঁড়ায়। মুন্নু পাশে থেকেই সাহায্য করে। ভিড় দেখে একটু পিছিয়ে আসে সতীনাথ। জয়া সুযোগ বুঝে কাছে এসে অনুরোধ করে, যাবেন না, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

দীর্ঘকাল পর দেখা। কত উতলা হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে।, তবু সহসা কোন উত্তর দিতে পারে না সতীনাথ। এমন কি প্রতি নমস্কার জানাতেও হাত ওঠে না তার। শয়তানের আড্ডায় যে কর্ত্রী হয়েছে কি সম্বন্ধ তার সঙ্গে? কে জয়া? চেনে না সতীনাথ এনামে কাউকে। গলার স্বর গম্ভীর করেই উত্তর দেয়, আমার সময় নেই।…ভিড়ের মধ্যে দু'পা অগ্রসর হতে চেষ্টা করে।

মনে মনে অসম্ভব হাসি পায় জয়ার। তবু নিজকে সংযত রেখেই পুনশ্চ অনুরোধ করে, খুব সময় আছে। যেতেই হবে আজ আপনাকে আমার সঙ্গে।…

যেতেই হবে, কেন? কি এত জোর? হ্যাঁ, সে জোর করতে পারত ক্যাম্পের সেই শুভ্র মেয়েটি।…না না, তা' হতে পারে না।…[illegible]র স্বর রূঢ় করেই উত্তর দেয় সতীনাথ, আপনার সঙ্গে! ছিঃ…দ্রুত ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। মনে মনে হাসতে থাকে জয়া।

ডনচা

সারারাত ঘুমোতে পাবে না সতীনাথ। ছিঃ ছিঃ এরই জন্য করেছে প্রাণপাত পরিশ্রম? খুঁজে বার করবার জন্য কি চেষ্টাই না করেছে! বিজয়াকে কথা দিয়েছে, যেভাবেই হোক বেঁচে থাকলে খুঁজে বার করবেই। সন্ধান আজ পেয়েছে। তবু পারবে কি এ সংবাদ ওকে দিতে? ঘৃণায় লজ্জায় মর্মাহত হবে না কি বেচারা?…কি কঠোরভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। চিত্তের কি অবিচল দৃঢ়তা!…না না, মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্র। জয়ার মধ্যেও কি একদিন ভাবাবেগ দেখেনি? শেষটায় কিনা লম্পট মেড়োটার সঙ্গে…! পাশের তক্তপোষটিতে আনন্দমোহনবাবু অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। ভেতরের ঘরে বিজয়া। কিন্তু সতীনাথের চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই। বার বার জয়ার বীভৎস রূপ মনকে পীড়া দিতে থাকে। একি অনর্থক দুশ্চিন্তা! কে জয়া? কি সম্বন্ধ তার সঙ্গে? কত নারীই ত' বিপথগামী হয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে। ক'জনের কথা ভাবতে পারছে সে?…যা খুশি

কক্ষপথে। কি আসে যায় তার পতনে উত্থানে ?···বালিশে মাথা গুজে পাশ ফিরে শোয় সতীনাথ। না, মস্তিষ্কের শিরা উপশিরাগুলো যেন এক যোগে সব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। অবিরত কাণের কাছে ঢাক, ঢোল বাজিয়ে চলেছে। রাত প্রায় তিনটে। সতীনাথ বিছানা থেকে উঠে এসে বাইরের রেলিংএ দাঁড়ায়। ভাল করে হাত মাথা ধুয়ে ঢগ্ ঢগ্ করে কুঁজো থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়। এবার হয়ত ঘুম আসবে। শান্তভাবে এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়। 'ভুলের' আগুন আবার ধিক ধিক করে জ্বলে ওঠে। বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকে, হ'তেও ত' পারে এ ছলনা। অনেক করে অনুরোধ জানিয়েছিল বেচারা। নিশ্চয় কিছু বলার ছিল। বিপথ গামিনীই যদি হবে তাহলে কি প্রয়োজন ছিল ওকে আহ্বান জানাবার ?··· অন্তরে ক্ষীণ আশা জাগে সতীনাথের। ঠিকানার অভাব হবে না। কিষেনলালের আপিসে খোঁজ নিলেই হবে।···শয়তান মেড়োটাই এর জন্য দায়ী। আলেয়ার আলো জ্বেলে ওরাই ঘরের বার করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের লক্ষ্মীদের। ভেঙে ফেলতে হবে ওদের বুনিয়াদ। মুক্তি দিতে হবে সকল আবদ্ধ মানুষকে। দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, মানবতার শত্রু ঐ কিষেনলাল আর তার দলবল। সংগ্রামে সংগ্রামে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতে হবে ওদের।···বিছানা ছেড়ে আবার উঠে আসে সতীনাথ বাইরে। পূবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে।

চল্লিশ

পরদিন রবিবার। জয়া খুব ভোরে উঠে বাগানের চারদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। প্রতিনিয়তই সতীনাথের কথা মনে হ'য়েছে। বার বার নিজের মনেই হেসেছে। ...উষা লক্ষ্য করে। বেচারা, কত আশাই হয়ত করেছিল ওর ক... কি দিতে পেরেছে ও তাকে। জীবনের এ অস্বাভাবিক পরিণতি দেখলে কার না রাগ হয়? সত্যিই ত', ওর আহ্বান উপেক্ষা করে মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। কিষেনলাল বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে সর্বস্ব। পোষা কুকুর বেড়ালের মতই পুষে রেখেছে ভাত কাপড় দিয়ে। কোন কিছুতেই 'না' বলার উপায় নেই। সেক্রেটারীর পদও এক অহেতুক অনুকম্পা মাত্র। কতটুকু যোগ্যতা আছে ওর?...জীবনের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে জয়ার। সতীনাথকে যদি গতকাল ধরে আনা যেত তাহলে কিছুটা হাল্কা হতে পারত। কিন্তু সে ধরা দেয়নি। কেন দেবে? একবার প্রশস্ত হাত বাড়িয়ে বঞ্চিত হয়েছে, দ্বিতীয়বার বিশ্বাস করবে কেন? তাও এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে...যদি সেদিন ভুল না হত...যদি...ভাবতে ভাবতে বাংলোর ডেক চেয়ারে এসে বসে জয়া। পরিচারিকা প্রাতরাশ দিয়ে যায়। খাবারটা খেয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে অস্থির হয়ে ওঠে— "নয়া দুনিয়ার জন্য।" জীবন যুদ্ধের একমাত্র হাতিয়ার। নিশ্চয় আজ খুব কড়া মন্তব্য করেছে। করুক, যত পারে তীব্রভাবে আঘাত করুক। কিষেনলালের বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাক। ঘুমন্ত মানুষ আবার জেগে উঠুক।...

ক্ষণকাল পরেই দরোয়ান রামসুন্দর এসে একগাদা খবরের কাগজ পৌছে দেয়। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নয়া দুনিয়া বেছে নেয় জয়া। সর্বনাশ, এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! শিরোনামায় প্রকটভাবে জ্বল জ্বল করছে,

সম্পাদকের পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। অনাদায়ে সশ্রম কারাদণ্ড ছ'মাস।...ভোজবাজী, সব শয়তান কিষেনলালের ভোজবাজী। কোন আইনজ্ঞকে সময় মত পাওয়া যায়নি। রাতারাতি চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে ধুরন্দর। সন্তোষবাবু নিজের জবাবদিহি নিজেই করেছেন। মাত্র কয়েকদিনের সময়। নির্দিষ্ট তারিখে অর্থ জমা দিতে না পারলে অনিবার্য কারাবাস।...পিঞ্জরস্থ হৃদপিণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে জয়ার। প্রত্যর্পণে ... ব্যর উপায় নেই। একমাত্র ভরসা রামলোচনবাবু। কিন্তু তিনিই বা এতক্ষণ চুপ করে আছেন কি করে? না না, এ হতে পারে না। সন্তোষবাবু ভিন্ন 'নয়া দুনিয়া' চলতে পারে না। যেভাবেই হোক খালাস করতেই হবে সম্পাদককে। কালই আপিল করতে হবে। যদি অকৃতকার্য হয় অর্থ ই দেবে কারাবাস নয়।...ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ড্রয়ার খুলে নোটগুলো গুনতে থাকে জয়া। রামলোচনের বিলম্বে বিরক্তি বোধ হয়। এবেলা না এলে কে জানে বিকেলের দিকে কিষেন-লালও এসে পড়তে পারে।...উত্তেজনায় আবার এসে নয়া দুনিয়া হাতরাতে থাকে। কালকের সংবাদ কৈ? গ্র্যাণ্ড হোটেলের নির্লজ্জ অভিনয়?... হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। সাবাস 'নয়া দুনিয়া', সাবাস কৃষক মজুর। এ শুধু তোমরাই পার। মালিকের মুখোশ খুলে দিতে তোমাদের জুড়ি নেই। সংগ্রাম জয়যুক্ত হোক তোমাদের। অভিনন্দন গ্রহণ কর।... ফাকা কথায় যারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, দেশবাসীকে অভুক্ত রেখে যারা পরমানন্দে হোটেলে বসে পোষাকী খানা খায় তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কঠোর সংগ্রাম দেশের বুকে সাড়া জাগাবে...তোমরাই জাতির আশা আকাঙ্খা...এগিয়ে চল, এগিয়ে চল...উত্তেজনায় কাগজখানি বুকের মধ্যে চেপে চাঙ্গা হয়ে ওঠে জয়া। অন্যান্য পত্রিকাগুলো দূরে সরিয়ে রাখে জঞ্জালের মত। রামলোচনবাবু বিষণ্নমুখে কাছে এসে দাঁড়ান।

গভীর উদ্বেগে প্রশ্ন করে জয়া, আপনার এত দেরী কাকাবাবু?

সংবাদ গতকাল আমি আদালতেই পেয়েছিলাম মা। তোমাকে জানাইনি···

কারণ কাল আমি খুব ব্যস্ত ছিলেম না?···বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে মুখে। পুনশ্চ মাত্রা টেনে চলে, ওকথা থাক। টাকা আমি গুনেই রেখেছি, এই নিন। জরিমানার জন্য পাঁচ হাজার আর আপিলের জন্য এক হাজার।···ছ'হাজার টাকার একটি বাণ্ডেল রামলোচনের হাতে গুজে দেয় জয়া।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে আপত্তি জানান রামলোচন, টাকার আমাদের খুবই প্রয়োজন মা। তুমি দেবে ভরসা করেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু সন্তোষবাবুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কোন প্রকার আপিল তিনি করবেন না কিংবা জরিমানার টাকাও দেবেন না।

কেন?···গলার স্বর অধিকতর গম্ভীর হয়ে ওঠে জয়ার।

আমার প্রস্তাব শুনে তিনি হেসে হেসেই বল্লেন, টাকাই যদি পাই রামলোচনবাবু, তবে তা সামান্য একজন সম্পাদকের জেল বাঁচাতে খরচা করব না। নয়া দুনিয়ার জন্য রোটারী মেশিন চাই আগে।···

এ তাঁর নিছক অভিমানের কথা কাকাবাবু! তিনি ভেবে দেখছেন না, তাঁর অবর্তমানে নয়া দুনিয়ার কি ভীষণ ক্ষতি হবে!

আমিও তোমার মতই আপত্তি জানিয়েছিলেম মা। কিন্তু উত্তরে তিনি কি বল্লেন জান? বল্লেন, রামলোচনবাবু আমার অভাবেই যদি নয়া দুনিয়া ডুবে যায়, তাহলে বুঝব আমাদের এতদিনের পরিশ্রম নিষ্ফল হয়েছে। দেশের একটি লোককেও তৈরী করতে পারিনি আমরা।

এ তাঁর অমূলক ধারণা। দেশের প্রত্যেকটি শোষিত নর-নারী তাঁর কাছে ঋণী। আমার বিশ্বাস আপিলে তিনি মুক্ত হবেনই।

কালো কানুন বজায় থাকতে তিনি আর কোন বিচারকের দরবারেই হাত জোড় করে দাঁড়াতে রাজী নন।

প্রত্যুত্তরের আর কোন ভাষা খুঁজে পায় না জয়া। এক মুহূর্ত নীরব থেকে পুনর্বার প্রশ্ন করে, আচ্ছা কাকাবাবু, তাঁর অবর্তমানে কাকে তিনি সম্পাদক রূপে মনোনীত করেছেন জানেন ?

না মা, এখনও সেরূপ কিছু স্থির হয়নি। আজ সন্ধ্যায় সমস্ত ইউনিয়ন নায়কেরা মিলিত হচ্ছেন। সম্ভবত আজকেই একটা কিছু স্থির হবে।... এখন তাহলে উঠি মা ? আমার ওপর আবার অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব রয়েছে।

হ্যাঁ, আপনি আজ আসুন। বলা যায় না, কিষেনলালও এসে পরতে পারে।

রামলোচন উঠে দাঁড়ান। জয়া পুনরায় ঔৎসুক্য সহকারে প্রকাশ করে, রোটারী মেশিন কিনতে কত টাকা প্রয়োজন কাকাবাবু ?

নূতন মেসিনের দাম অনেক মা। তবে পুরানো একটা লাখ খানেকের মধ্যে পাওয়া যায়।

লা-খ খা-নে-ক ! অত টাকা ত' আমার নেই কাকাবাবু ?...

জানি মা, দেশের জন্য তুমি তোমার যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করেছ। শুধু তোমার উপর আমরা বোঝা চাপাতে চাইনে। আমরা মুটে মজুরের দল। দৈনিকের তেল নুনের পয়সা থেকেই দু'পয়সা বাঁচিয়ে লাখ টাকা জড়ো করব। পারব নাকি মা, লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ এক সঙ্গে জড় হয়ে ?

জয়ার মুখ চোখ স্বাভাবিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মিছিল করে চলে শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা। দলে দলে হাজারে হাজারে একই পতাকার নীচে। তবু সংশয়ের সুরেই আপত্তি জানায়, তা হয়ত পারবেন কাকাবাবু। কিন্তু অতদিন কি পুরানো রোটারীটা থাকবে ? টের পেলে সব বানচাল করে দেবে না শয়তানরা ?

রামলোচন জোর দিয়ে আর কিছু বলতে পারেন না। জয়া কিঞ্চিৎ

ইতস্তত করে পুনরায় অনুরোধ করে, আপনি আগামী বুধবার সন্ধ্যায় আর একবার আসবেন কাকাবাবু। দেখি আমি কি করতে পারি। মেসিনটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না।

অতবেশী ভেবে তুমি আবার বিপন্ন হয়ে প'ড় না যেন।

ঝড় বাদলের মধ্য দিয়েই যে আমাদের রাস্তা কেটে বেরিয়ে যেতে হবে কাকাবাবু।

রামলোচন সম্মতি জানিয়ে উঠে পড়েন। জয়া পূর্ববৎ ভাবতে থাকে।

একচল্লিশ

দু'দিন পরের ঘটনা। ডাহৌসী স্কোয়ারের আপিস ছুটি হয়ে গেছে। অধিকাংশ বাবুই চলে গেছেন। কেবলমাত্র দু'চার জন বিভাগীয় অধিকর্তা আপন আপন কাজে কিছুটা ব্যস্ত। ম্যানেজার মুর্ ফ্যাক্টরী পরিদর্শনে গিয়েছে। চেম্বারে বসে কিষেনলাল ও জয়া। উল্লাসে ফেটে পড়ে কিষেনলাল, নয়া দুনিয়ার সম্পাদক জরিমানার টাকা দিতে পারেনি বিবিসাহেবা। ছ'মাস ঘানি টানতে হবে এবার বাছাধনকে। বোধ হয় বন্ধই হয়ে যাবে নচ্ছাড়দের কাগজ। গোটা বাংলা দেশটাকে একাই জ্বালিয়ে খাচ্ছিল। এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে হাবাতের দল, কি বল, ?… হো হো করে হাসতে থাকে খুশির হাসি।

মনে তীব্র জ্বালা থাকলেও স্বাভাবিক ভাবেই সায় দিয়ে যায় জয়া।

নীচের রাস্তায় হকারের চীৎকার শোনা যায়, নয়া দুনিয়া, নয়া দুনিয়া। টেলীগ্রাম…জোর খবর। ছ'মাসের জেল সম্পাদকের…[illegible]

জুলুমবাজী···নয়া ছুনিয়া—নয়া ছুনিয়া···চোখ বিস্ফারিত করে চমকে ওঠে কিষেনলাল, একি! বদমাশগুলো এরই মধ্যে টেলিগ্রাম বার করে ফেলেছে!

জয়া তাড়াতাড়ি উসকিয়ে দেয়, তাহলে একখানা এনে দেখতে হয় কি লিখেছে পাজীর দল?

নিশ্চয়···নিশ্চয়···সজোরে কলিং বেল টিপে কিষেনলাল।

চাঁপরাশি—ছুটে এসে দাঁড়ায়।

জলদি একঠু নয়া ছুনিয়া লে আও।

যথা সময়ে কাগজ এনে হাজির করে রাম তিরত্। প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে মাল্য ভূষিত সম্পাদক সন্তোষ রায়ের বিরাট ফোটোগ্রাফ। হাজার হাজার কৃষক, মজুর, উদ্বাস্তু দমদম সেণ্ট্রাল জেলের গেট পর্যন্ত মিছিল করে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে প্রিয় নেতার উদ্দেশে। প্রসন্ন মুখাবয়ব সম্পাদকের। হাত জোড় করে শেষ বাণী বর্ষণ করেছেন মেহনতী জনতার প্রতি, আপনাদের বহু বাঞ্ছিত সংগ্রাম এবার শুরু হ'ল। সুসংবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে হবে আপনাদের। ওপর ওয়ালার ভয় করবেন না। জয় সুনিশ্চিত।

একি! এ যে মিষ্টার দত্ত! শেষটায় ভাল চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে কুলি কামিনের সঙ্গে হুজুগে মাতলেন?···হতবাক হয়ে যায় কিষেনলাল।

জয়া অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে ঝুকে পড়ে সম্পাদকের নামটা দেখে নেয়। হ্যাঁ হ্যাঁ সতীনাথ দত্ত। পরিষ্কার করে লেখা। পত্রিকার কাজে ইস্তাফা দিয়ে 'নয়া ছুনিয়ার' সম্পাদক পদে আত্মনিয়োগ করেছেন। উল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়ে জয়া। ঘর ছাড়ার পর এরূপ আনন্দ আর একদিনের জন্যও উপভোগ করতে পারেনি। সতীনাথ, তার পরিচিত সতীনাথ···আজ নয়া ছুনিয়ার সম্পাদক···সহসা কিষেনলালের কথা মনে হতে পুনরায় কৃত্রিমভাবে প্রশ্ন করে, কে মিষ্টার দত্ত শেঠজী?

পত্রিকার সহ-সম্পাদক মিষ্টার সতীনাথ দত্ত।

সতীনাথ দত্ত!

হ্যাঁ বিবিসাহেবা, সতীনাথ দত্ত। তুমি জানতে নাকি ওকে?

না···মানে···ভদ্রলোকের অনেক লেখা পড়েছি। খুব ভাল লিখতেন।

আর ভাল মন্দ বিবিসাহেবা! বাংলা দেশের সব মানুষেরই দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যত সব বাজে হুজুগে মাতা···

জয়া নীরবেই মনে মনে হাসতে থাকে। খুব খুশি হয়েছে আজ ও। হয়ত ওকে ভুল বুঝেই দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে সাংবাদিক। বুঝুক; ভুল বুঝুক ক্ষতি নেই। কিছু প্রত্যাশা করে না ও তাঁর কাছে।···

কিষেনলাল গর্জে ওঠে, দত্তই হোক—আর দানবই হোক, শেঠ কিষেনলাল কাকেও ছেড়ে কথা কইবে না বিবিসাহেবা? খুব শীগ্‌গিরই দেখতে পাবে কেমন শিক্ষা আমি দিয়েছি হতভাগাদের?···রক্তিম মুখ বীভৎস হয়ে ওঠে কিষেনলালের। শয়তানের মুর্তিতে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয় জয়া। বাজিয়ে দেখতে চেষ্টা করে, কিছু স্থির করতে পারলেন, সমূহ কি করা উচিত আমাদের।

তুমি বাংলোয় ফিরে যাও বিবিসাহেবা। আমাকে এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে।···তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে একাকী গাড়ীতে ওঠে কিষেনলাল। জয়া তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকে।

বিয়াল্লিশ

বাংলোয় ফিরে এসেছে জয়া। মনে বইছে খুশির হাওয়া। খোকনের জন্য লজেন্স, বিস্কুট এনেছে। অনেকদিন পর কোলে উঠতে পেরেছে বেচারা। একটা বিস্কুট মুখে দিয়ে খিল খিল করে হাসছে কেমন! আহ্লাদে দিদির কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাসীর কোলে। জয়া ছাড়া পেয়ে ছুটে যায় ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে টাকাগুলো গুনতে থাকে। চাঁদা পাঠাতে হবে সতীনাথকে। রোটারীটা না হলেই নয়। হাজার হাজার লাখ লাখ কাগজ ছড়িয়ে দিতে হবে শোষিত মানুষের মধ্যে। জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। মনে পড়ছে বাবার কথা। তাঁর আদর্শের কথা। মূর্খ, অজ্ঞ, শোষিত মানুষের জাগরণের স্বপ্নই তিনি দেখেছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের পাশে থেকে কাজ করে গেছেন। সন্তান হিসেবে সেই অসমাপ্ত কাজ আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রত ওর। এমনি করেই ধাপে ধাপে আসবে পূর্ণাঙ্গ সফলতা। বন্ধনহীন মহামুক্তি।

সতীনাথ হয় ত' খুবই রেগেছে। বড় অভিমানী বেচারা। কাছে যাবার উপায় নেই। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। হারাবে না-ই বা কেন? কত আশা নিয়ে হাত বাড়িয়েছিল। নিষ্ঠুর আঘাত পেয়েছে।…থাক, দরকার নেই কাছে গিয়ে। এখানে শত্রু শিবিরে থেকেই যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করবে। রামলোচনবাবু রয়েছেন। তাঁর হাত দিয়েই পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু মোটে ত' হল দশ হাজার টাকা! বাকী নব্বুই হাজার? শেষটায় কি হাতছাড়া হয়ে যাবে রোটারীটা? কিষেনলাল টের পেলে বেশী দাম দিয়েই কিনে ফেলবে। কিন্তু রাতারাতি কে দেবে অত টাকা? কৃষক মজুরের নিকট থেকে চাঁদা তুলে জড় করতে বাজী মাৎ হয়ে যাবে।

ধূর্ত শয়তান। প্রথম দিনকয়েক অর্থের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল। যখন যা চাওয়া যেত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আজকাল টাকা চাইতে গেলেই কৈফিয়ৎ তলব করে। মিষ্টি হেসে হিতোপদেশ দেয় খরচ কমাতে।...তা' হোক। হতাশ হ'লে চলবে না। লাখ টাকা জোগার করতেই হবে। টাকার অভাবে সতীনাথ কাজ করতে পারবে না, এ কেমন কথা! ছলে বলে কৌশলে। ছিনিয়ে নিতেই হবে পিশাচটার হাত থেকে—জনতার চাবিকাঠি। রামলোচনকে আসতে বলে দিয়েছে।...না না, যেভাবেই হোক টাকা চাই—লাখ টাকা।...ভাবতে ভাবতে কলঘরের দিকে উঠে যায় জয়া। পরিষ্কার করে হাত মুখ ধুয়ে ড্রেসিং টেবিলে এসে বসে। পমেড্ ল্যাভেণ্ডারে বিন্যস্ত করে নেয় কালো কোঁকড়ান চুল। সেদিনের সেই সাংবাদিক সম্মেলনের মত করে। লম্পটটা অনেকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। তেমনি ভাবেই হীরের সেট আর জামা কাপড়ে মাতোয়ারা করে তোলে তনুলতাকে। বশীভূত হবে নাকি কিষেনলাল?... আয়নাটার দিকে চেয়ে কিঞ্চিৎ হাসতে থাকে।—সামান্য লাখ টাকা। চোরাকারবারীর একদিনের উপায়।...মুর্ দেখছি নিজের শালীটাকে দিব্যি লেলিয়ে দিয়েছে। দু'একদিন অন্তর অন্তরই নাকি হোটেলে আড্ডা জমে।...টাকা...টাকা...মানুষের মনে শয়তানে বাসা বেঁধেছে। টাকার বিনিময়ে না করতে পারে এমন কাজ নেই। দূর করে দিতে হবে এ ছুরপনেয় কলঙ্ক। মুক্তি পাবে মানুষ। আর তাকে এমনিভাবে ছুটোছুটি করতে হবে না।...স্প্রে থেকে আর একবার ছিটিয়ে দেয় ল্যাভেণ্ডারের জল মুখে মাথায়। ভুর্ ভুর্ করতে থাকে বসন্তের বাতাস। সন্ধ্যা তারাটা জ্বল জ্বল করছে দূর্ গগনে। মোটরের হর্ণ শোনা যায়। কিষেনলাল এসেছে, শেঠজী। লাখ টাকা...লাখ টাকা...আজ রাতের মধ্যে চাই। হাসি মুখে ছুটে যায় জয়া সিঁড়ির কাছে। স্বপ্নাম্বিত দেহলতা।...

তেতাল্লিশ

পরদিন প্রভাতে বিছানা থেকে ওঠা শক্ত হয়। পাঁজরার হাড়গুলো যেন গুঁড়ো হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে মাতালটার কাছ থেকে এক ছড়া নেকলেসের দাম আদায় হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা। হাতে জমান আছে আরও দশ হাজার। বাকীটা গয়নাগুলো বিক্রি করে হয়ে যাবে। রোটারীটা বো বো করে পাক খেতে থাকে। হাজার হাজার নয়া দুনিয়া এখানে সেখানে। সমস্ত শোষিত মানুষের হাতে। চক চকে ঝক ঝকে ছাপা।...স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে জয়া। কোনও রকমে বিছানা থেকে উঠে আজকের 'নয়া দুনিয়া' দেখতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ভোর ছ'টা না বাজতেই কাগজ দিয়ে যায় হকার। নির্দিষ্ট সময়েই সবগুলো পৌঁছেচে। কিন্তু নয়া দুনিয়া নেই। নিদারুণ অস্বস্তিতে রামসুন্দরকে ডেকে পাঠায়।

না, নয়া দুনিয়া আজ দেয়নি, ছুটে এসে জানায় দরোয়ান।

কেন? কারণ কিছু বলে গেছে?···পুনর্বার প্রশ্ন করে জয়া।

দ্বার রক্ষকের পক্ষে অধিক প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভবপর হয় না। যা দিয়ে যায় তাই সে গাঁজা করে পৌঁছে দেয় মাত্র। কোনটার কি তাৎপর্য। কোনটা না হলে বিবিসাহেবার অসুবিধে হবে, অতটা বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয় তার পক্ষে।···

জয়া বিরক্তির সঙ্গে তাকে বিদায় দিয়ে ভৃত্য মধুকে বাজারের মোড়ে পাঠিয়ে দেয়। যেভাবেই হোক একখানা কাগজ পেতেই হবে।···মধু ফিরে আসে। কাগজ সেখানেও নেই। কোন হকারই নাকি আজ নয়া দুনিয়া পায়নি। কারণ কি, তাও কেউ বলতে পারছে না। উৎকণ্ঠায় ঘর বার করতে থাকে জয়া। বেলা প্রায় ন'টা। রামলোচনবাবু বিষন্ন

মুখে বাংলোয় প্রবেশ করেন। অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে জয়া, কি হয়েছে কাকাবাবু? আপনাকে…

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে মা। শত্রুরা আমাদের কাগজ ও প্রেস সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমাকে ওবকম রুক্ষ্ম দেখাচ্ছে?…

জয়া সে কথায় কাণ না দিয়ে পুনশ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে, পুড়িয়ে দিয়েছে!

হ্যাঁ মা, নয়া, দুনিয়ার আপিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। গতকাল রাত দশটায় ভদ্রবেশে পাঁচ সাতজন গুণ্ডা সতীনাথ বাবুব সঙ্গে সামান্য কথা নিয়ে বিতণ্ডা শুরু করে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই মৌখিক বিতণ্ডা রূপান্তবিত হয় বেপরোয়া হামলায়। লরী বোঝাই বোঝাই গুণ্ডাব দল আসতে থাকে। সোডার বোতল, হাত বোমা ও ইষ্টক বর্ষণ চলে নির্বিচারে। অবশেষে টিন ভর্তি পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রতিবোধ কবতে গিয়ে গুরুতররূপে আহত হন সতীনাথবাবু ও অপর কযেকজন কর্মি। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে থানা এবং দমকল আপিসে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন পৌছে কাজ ততক্ষণে হাসিল। গুণ্ডারা নির্বিঘ্নে পালাবার সুযোগ পায়।…বলতে বলতে ক্রোধে দুঃখে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে রামলোচনের।…

সতীনাথ আহত।…নয়া দুনিয়া ভস্মীভূত।…জয়ার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে কিষেনলালের পৈশাচিক মূর্তি। কেমন দাঁত বার করে হাসছে শয়তান?…বহুকষ্টে নিজেকে প্রতিহত করে প্রত্যুত্তর করে জয়া, বুঝেছি কাকাবাবু। এ শয়তানেব হিংস্র দংষ্ট্রাঘাত। আমাদের সম্মুখে আজ আরও কঠিন পরীক্ষার দিন উপস্থিত।…

হ্যাঁ মা, এযে সুপরিকল্পিত আক্রমণ তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

জয়া কিঞ্চিৎ দম ধরে পুনশ্চ প্রশ্ন করে, নয়া দুনিয়া কি তাহলে বন্ধ থাকবে?

না মা, বন্ধ থাকবে না। তবে কোন প্রেসই আমাদের ভার নিতে রাজী নয়।

বুঝলাম। কিন্তু উপায় ?

ওদের অত্যাচার যত বাড়বে আমাদের পথ ততই পরিষ্কার হবে মা। হাজার স্বেচ্ছা সেবক ভার নিয়েছে আজকের নয়া দুনিয়ার জন্য। সৌভাগ্যক্রমে করিম সাহেব কাল উপস্থিত ছিলেন। তিনিই আজকের কাগজ পরিচালনা করছেন। বিকেলের দিকে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় একখানা করে হাতে লেখা কাগজ বিলিয়ে দেওয়া হবে। কর্মিরা স্ব স্ব কণ্ঠধ্বনিতে প্রচারিত করবে মর্মবাণী।

এভাবে ক'দিন চলবে কাকাবাবু ?

একদিন চলাও উচিত নয় মা। কিন্তু রোটারী না হওয়া পর্যন্ত কোন উপায়ও নেই।

জয়া সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে যায়। সংগৃহীত টাকা আর গয়নাগুলো আঁচলে করে এনে দেয় রামলোচনের হাতে।

এ যে তোমার গায়ের অলঙ্কার মা···আশ্চর্যান্বিত হয়ে বাধা দেন রামলোচন।

গভীর আবেগে উত্তর করে জয়া, ও আমার অলঙ্কার নয় কাকাবাবু, কলঙ্কের পশরা। শত সহস্র নিরন্নের মুখের গ্রাস। আপনি দয়া করে এগুলো আমার চোখের সম্মুখ থেকে নিয়ে যান। আমাকে মুক্ত করুক।···

রামলোচন তবু ইতঃস্তত করতে থাকেন, কিন্তু মা···

বুঝেছি কাকাবাবু, এগুলো ক্যাশ করায় আপনার পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা আছে। দিন, আমিই গিয়ে এক ফাঁকে ক্যাশ করে রাখব।

তাতে তোমারও বিপদ আছে মা। কিষেনলাল সন্দেহ করবে।

বিপদকে আর পাশ কাটাবার উপায় নেই কাকাবাবু। রোটারীটা আমাদের কিনতেই হবে।...

ঠিক বলেছ মা। শোষিত মানুষ আজ আর কারও স্পর্ধাকে ভয় করে না। প্রস্তুতির জন্য তিনদিনের নোটিশ ছাড়া হয়েছে সমস্ত ইউনিয়ন কর্মিকে। সমস্ত ভারত ময় শুরু হবে আন্দোলন। দাও আমিই নিয়ে যাচ্ছি তোমার ও অঙ্গাভরণ।...

জয়াব মুখায়ব আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমস্ত বাংলা—সমস্ত ভারত—সমস্ত পৃথিবী যেন আজ মুক্ত হতে চলেছে। মিলন পতাকাবাহী হাজার হাজার বঞ্চিত মানুষ একযোগে মিছিল করে চলবে ··কিষেনলাল শত সহস্র কিষেনলালের সাধ্য নেই সে গতিকে রোধ করে···গয়নাগুলো হাতে দিয়ে পুনরায় খুশিতে আব্দার করে জয়া, কাকাবাবু, আপনি আর বিলম্ব করবেন না। বোটাবীটা আবার না হাত ছাড়া হয়ে যায়।...

রামলোচন হাসতে হাসতেই জবাব দেন, যাচ্ছি মা। বুড়ো হলেও তোমার এ ছেলে কাজকে ভয় করে না।···চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বাব কবে জয়াব হাতে দেয়, দেখত' মা, এতে চলবে কি না? সংগ্রামে প্রস্তুতির জন্য আমাদেব ফ্যাক্টবী শ্রমিকদের উদ্দেশে লেখা? আজ রাত থেকেই বিলি শুরু হবে।

চমৎকার হয়েছে। কে লিখেছেন কাকাবাবু?

অমিয়নাথবাবু।

বাঃ চমৎকার লিখতে পারেন ত' তিনি?

শুধু লিখতেই পারেন না, সংগঠনের কাজেও বিশেষ পারদর্শী। তাঁর হুকুমের প্রতীক্ষায় দশ হাজার কর্মি প্রস্তুত আছে।...

তা'হলে জয় আমাদের সুনিশ্চিত কাকাবাবু, কি বলেন?

নিশ্চয়। আমাদের জয় মানেই জনগণের জয়। কারও শক্তি নেই

এ দুর্বার স্রোতকে রোধ করতে পারে।···আচ্ছা মা, এখন তা'হলে আসি।

হ্যাঁ, আসুন আপনি।···দু'হাত তুলে নমস্কার জানায় জয়া। দূরে পথে মিলিয়ে যান রামলোচন। জয়া উদাসভাবে ভাবতে থাকে, সতীনাথ গুরুতর রূপে আহত, নয়া দুনিয়া ভস্মীভূত···ওকি একবারও দেখতে যাবে না? না না, সৈনিকের হৃদয়ে মমতা থাকতে নেই। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। গড়িয়ে পড়তে থাকে দু'ফোঁটা অশ্রু মলিন দুটি গণ্ড বেয়ে।

চুয়াল্লিশ

সন্ধ্যার দিকে নয়া দুনিয়ার আপিসে উপস্থিত হয়েছে সতীনাথ। চেয়ার টেবিল কিছুই নেই। পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে শত্রুরা। মাদুরের ওপর বসেই কাজ করে যেতে হবে। সারাদিন মাথা তুলতে পারেনি। অসম্ভব যন্ত্রণা ছিল। ডাক্তারের অষুধে আশ্চর্য কাজ করেছে। এখন আর তেমন কষ্ট নেই। ব্যাণ্ডেজ খুলে দিতে দিন কয়েক সময় লাগবে। কিন্তু ততদিন অলসভাবে বসে থাকবার ফুরসৎ কোথায়? করিম সাহেবের পরিচালনায় সান্ধ্য টেলিগ্রাম বার হয়েছে। তিনি নিয়মিত কাজ করে যেতে পারলে ভাবনার ছিল না। কিন্তু তাঁকেও খনি অঞ্চলে না ছুটলে নয়। পরশু ময়দানে মিটিং। আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে।···আনন্দমোহনবাবুও সংগঠনের কাজে ব্যস্ত।···নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলে সতীনাথ। অগ্নিস্রাবী ভাষায় লিখে যায় জীবনের জয়গান। প্রভাতী সংখ্যা সময় মত বার করতেই হবে। এক জায়গায় জড় হয়ে কাজ করা উচিত নয়। কে জানে, গুণ্ডার দল আবার না

আগুন ধরিয়ে দেয় ? ঘরে বসেই নকল করে যায় কর্মিরা। রোটারী না হওয়া পর্যন্ত হাতে লিখেই চালাতে হবে।…

রাত প্রায় আটটা। রামলোচনবাবু উপস্থিত হন। বড় ভয়ে ভয়ে আসতে হয়েছে সমস্তটা পথ। শোষিত মানুষের বুকের রক্ত তাঁর কোচার খোটে বাঁধা। জয়া নিষেধ করে দিয়েছে তার নাম উচ্চারণ করতে। সতীনাথ জানতে পারলে কিছুতেই এ দান গ্রহণ করবে না। বিশ্বাস-ঘাতককে কে বিশ্বাস করবে ? নিজের দান বলেই যেন চালিয়ে দেন রামলোচন। কাজ হলেই হল। নামে কি প্রয়োজন ? রামলোচন তাই কববে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জয়াকে।…

ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করে সতীনাথ, কিছু বলবেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বেশ বলুন। কেউ এখন আসবে না এখানে।

রোটাবীর টাকাটা আমি জোগার করেছি।

সম্পূর্ণ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্পূর্ণ।…বলতে বলতে কোচার খোট খুলে বার করে দেন টাকা আর গয়নাগুলো রামলোচন।

সতীনাথেব প্রসন্ন মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। রূঢভাবে প্রশ্ন করে, কোথায় পেলেন আপনি এগুলো ?

সময় মত স্পষ্ট করে জবাব দিতে পারেন না রামলোচন। আমতা আমতা করে বলতে যান, আজ্ঞে, নাম জানাতে নিষেধ করেছেন তিনি।…

তা'ত করবেই। গুপ্তচরের ধারাই ওটা।

না না, তিনি গুপ্তচর নন। পরম…

চুপ করুন। আপনি না জানালেও আমি জানি। এ দান বিধেন লালের সেক্রেটারী জয়া দেবীর।…গয়নাগুলো সাংবাদিক সম্মেলনে দেখেছিল সতীনাথ।

রামলোচন তবু জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে যান, হ্যাঁ, তিনিই এগুলো দান করেছেন। কিন্তু কোনক্রমেই আপনি তাঁকে গুপ্তচর বলতে পারেন না।…

সতীনাথ পূর্ববৎ রূঢ়ভাবেই বাধা দেয়, আপনাকে সোজা মানুষ পেয়ে ঠকিয়েছে। ওরা যে কি চিজ তা আপনি জানেন না। সব কাজ ভণ্ডুল করবেন দেখছি আপনারা।…

রামলোচন অপ্রস্তুত হয়ে যান। জয়া,…সেক্রেটারী জয়া, বিশ্বাসঘাতনী! তাও কি সম্ভব? কি প্রয়োজন ছিল ওর কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে টাকা সংগ্রহ করার!…

মৌন দেখে সতীনাথ পুনরায় প্রশ্ন করে, আমাদের কাজ কর্মের কথা কিছু বলেননি ত'!…

তিনি সবই জানেন।

সর্বনাশ করেছেন। এক্ষুনি যান, এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বলুনগে, নয়া দুনিয়ার আপিস বন্ধ। কে কোথায় পালিয়েছে ঠিক নেই।…

কিন্তু রোটারীটা?

রোটারীর ভাবনা পরে ভাববেন। আপাতত যা বল্‌লুম তাই করুন।…

রামলোচন পাথরের মত পুঁটলীটা পুনরায় তলপেটে গুজে বার হয়ে যান। সারা পথ ভেবে কুল পান না, জয়া বিশ্বাসঘাতণী! কুসুম কোমল মেয়েটা গুপ্তচর!…

রাত প্রায় দশটা। খেয়ে দেয়ে শুতে যাবে জয়া রামলোচন বাংলোয় এসে উপস্থিত হন। বিমূঢ়ের মতই প্রশ্ন করে জয়া, এত রাত্রে কাকাবাবু?

আপাদ মস্তক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উত্তর করেন রামলোচন, হ্যাঁ মা, এত রাত্রেই আবার আসতে হ'ল।

নূতন কোন বিপদ ঘটেনি ত'? রোটারীটা…

রোটারী কেনা হ'ল না মা।

কেন? শয়তান কি…

না, সতীনাথবাবু তোমাব দান গ্রহণ করলেন না।

সে কি! আপনাকে না নিষেধ করেছিলাম আমার নাম বলতে।

আমাকে কিছুই বলতে হয়নি মা। তিনি দেখেই চিনতে পেরেছেন।

দম বন্ধ হয়ে আসে জয়ার। বিদ্রূপে ফেঁটে পড়ে, চিনতে পেরেছেন? গুপ্তচরের গায়ের গন্ধেই চিনতে পেরেছেন?…

আমি অনন্যোপায় মা।…বলতে বলতে পুঁটলীটা টিপয়ের ওপর রেখে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হন রামলোচন।

জয়া ভ্রূকুটি করেই বলতে থাকে, না কাকাবাবু, অমনি যাবেন না। গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে যান। গুপ্তচরের নিঃশ্বাস লেগে আছে আপনার হাতে…হয়ত বা আপনিও…

বুঝেছি মা, তুমি নিদারুন আঘাত পেয়েছ। কিন্তু সতীনাথবাবুর অনুমতি ভিন্ন এক্ষেত্রে আমার আর কিছুই করার নেই। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।…

আমাকে আর অপরাধী করবেন না কাকাবাবু। আপনি এখন আসুন।…রুদ্ধ হয়ে আসে জয়ার কণ্ঠস্বর।

সান্ত্বনা দানের কোন ভাষা খুঁজে পান না রামলোচন। বোবার মতই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।…

গয়নাগুলো বুকের মধ্যে মুঠো করে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে জয়া।

পঁয়তাল্লিশ

সর্বভারতের শোষিত বঞ্চিত মানুষ একত্রিত হয়েছে তাদের দাবী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে। শহরে, বন্দরে, পল্লীতে চলেছে বিরাট জন সমাবেশ। সংগ্রামের প্রস্তুতি। হাট, বাজার, কল, কারখানা বন্ধ। নয়া দুনিয়ার ওপর হামলায় ক্ষুণ্ণ হয়েছে জাগ্রত গণচেতনা। বিপ্লবের পথে রুখে দাঁড়াবে লাঞ্ছিত মানুষেরা।···নিয়ম তান্ত্রিক অগ্রগতিকে গলাটিপে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত তাদের সকল অভিসন্ধিকে বানচাল করে দিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে সমগ্র দেশের শ্রমিক, কৃষক, উদ্বাস্তু।···

মিছিল চলেছে। কোলকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে বিকেল পাঁচটায় আবার জমায়েৎ। নিরন্ন ক্ষুধিত মানুষ ফেটে পড়েছে বাংলায়। সারা ভারতময় জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখা। কিষেনলালের মত প্রতিক্রিয়াশীলরা হিংসায় উন্মত্ত। সরকার থেকে জারী করা হয়েছে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা। সভা সমিতি নিষিদ্ধ। কিন্তু সে কথায় কাণ দেবার অবসর নেই উত্থিত জনতার। যারা মুখে নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির সমর্থক হয়েও গুণ্ডাবাজী দমন করতে অক্ষম, তাদের নীতি মেনে চলা অসম্ভব। মিছিল চলবে, সভা সমিতিও হবে···লক্ষ লক্ষ হাতে লেখা নয়া দুনিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জনগণের মধ্যে। সারা ভারতের রাস্তা ঘাটে।···

কিষেনলালের কারখানা আলগিয়ে আছে ম্যাক্ওয়েল মুর্। পাঁচ শত সসস্ত্র সৈনিক—তিনদিন আগে তাঁবু ফেলেছে। কারখানা রূপান্তরিত হয়েছে খণ্ড যুদ্ধ শিবিরে। গতকাল হতে কোন শ্রমিককেই বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। খাওয়া থাকার ব্যবস্থা পর্যন্ত কারখানার মধ্যেই হয়েছে।' রামলোচন, অমিয়নাথ পর্যন্ত আটক পড়েছেন। গুপ্তচরে

ছেয়ে আছে সর্বত্র। তবু কেমন করে যেন ইস্তাহার বিলি হয়ে যায়। কর্মিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যে ভাবেই হোক বেষ্টনী ভেদ করে ময়দানে যোগদান করবেই তারা। ভয় আর প্রলোভন, পরস্পর দুই বিরোধি শক্তিতে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছে কিষেনলাল। লক্ষ্মী, অবণী, বলাইয়ের মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। গালমন্দ শুনেও কেউ কেটা হয়ে লেগে আছে হতভাগারদল।...

পয়লা মে। আজ থেকে শুরু হবে মুক্তি অভিমান। চাষেব সুব্যবস্থা, শ্রমেব মূল্য, উদ্বাস্তু সমস্যা সব কিছুই স্থিরিকৃত হবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। দেশের সন্তান সকলেই ভাই ভাই। কারও সঙ্গে মূলত কোন বিবাদ নেই। সামগ্রিক কল্যানের পথ মুক্ত করে দেবে যারা তারা জাতির মিত্র, পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আর যারা কায়েমী স্বার্থে বাধা দেবে তারা ঘৃণ্য, শত্রু, দেশদ্রোহী। তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে ক্ষমতা।...

জয়া সকাল দশটায় যথারীতি কারখানায় যোগদান করেছে। শিশু ভাইটি বাংলোয় মালিনী মাসীর কাছে আছে। কে জানে, জীবনে আর দেখা হবে কিনা?...কিষেনলাল ক'দিন থেকে ভাল করে কথা বলছে না। হয়ত কিছু টের পেয়ে থাকবে। তা হোক, তবু আর পেছুবার উপায় নেই। বারটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মিরা দলে দলে বেরিয়ে পড়বে। অমিয়নাথ রামলোচনের পরিচালনায় এগিয়ে যাবে সকলে মিছিল করে। আজই সর্বপ্রথম প্রকাশ্য আন্দোলনে যোগদান করছেন ওঁরা।...যদি দম রাখতে না পারেন? দুর্জনের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে পড়েন যদি?...শেষটায় কি নেতার অভাবে পণ্ড হয়ে যাবে সকল আয়োজন?...কর্মিরা ছত্রভঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে?...ফিরে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেই এসেছে জয়া। প্রয়োজন হ'লে মুখোমুখি দাঁড়িয়েই সংগ্রাম করবে। ভয় কি? কিষেনলাল জানুক, তার শয়তানিব জবাব

পাবার দিন উপস্থিত। যদি মৃত্যু হয় ক্ষতি নেই। সারা ভারতের বন্ধন রজ্জু শিথিল হবে। ছিন্ন হবে গোলামীর ফাঁস। শোষিত মানুষ পাবে মুক্তি—বাঁচার আনন্দ।...

গেট পাশ ভিন্ন বাইরের লোকের ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য জয়াকে কোনরূপ বেগ পেতে হয়নি। কিষেনলাল উপস্থিত নেই। মুরের ওপর সকল ভার ন্যস্ত। ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে শ্বেত শয়তান। চৌমাথার মোড়ে মেশিন গান উঁচিয়ে সন্ত্রস্ত আছে সান্ত্রীরা। গুপ্তচরের মারফৎ জানতে পেরেছে হয়ত অভিযানের সময় তালিকা। উত্তর পল্লীর উদ্বাস্তুরাও এই পথ দিয়েই মিছিল করে যাবে। সুতরাং এখানেই রচিত হয়েছে প্রথম প্রতিরোধ ব্যূহ। কারখানার শ্রমিকরা যদি গোলমাল শুরু করে তবে তাদেরও বাধা দেওয়া হবে এখান থেকেই। মিলিটারী ক্যাপটেন সকাল থেকেই উপস্থিত আছে। শান্তি প্রিয় ধরিত্রী দানবের পদভরে প্রকম্পিত। খাঁ খাঁ করছে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর।..

মুর্ ফন্দী করেছে বারটার সিফ্‌ট্ চেঞ্জের ভেঁপু বাজবে না। সতর্কতা সত্ত্বেও যদি গোলমাল করবার মতলব থেকে থাকে তা সঙ্কেতের অভাবেই কার্যকরী হবে না। শয়তানের চরখা কখনও অলস থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বেই এসে বয়লার ঘর আগলিয়ে থাকে। নিষেধ করে দেয় চালককে ভেঁপু বাজাতে। জয়া সমস্ত দিক লক্ষ্য করেও মুরের মনোভাব বুঝে উঠতে পারে না। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট। উৎকণ্ঠায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে। দোতলার গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করে আবহাওয়া। সান্ত্রীরা রাইফেল উঁচিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাভাবিক কল চলার শব্দ ভেসে আসছে কারখানার মধ্য হতে। কিন্তু মুরের চেম্বার যে শূন্য! কোথায় গেল শয়তানটা?...

তাড়াতাড়ি ছুটে যায় জয়া ফ্যাক্টরীর ভেতর। বাঁ পাশের ষ্টোর রুমে

অমিয়নাথ রামলোচন সসব্যস্তে অপেক্ষা করছেন। চোখাচোখি হতেই ক্ষীণ হেসে আবার ভেতরের দিকে অগ্রসর হয় জয়া। সমস্ত কর্মিরাই উৎকর্ণ হয়ে আছে ভেঁপুর দিকে। কিন্তু একি! কাঁটায় কাঁটায় বারটা যে! হুইসেল বাজছে না কেন? রামলোচন অমিয়নাথ হাতের কাজ বন্ধ করে উদ্বেগ বোধ করেন। ক্ষিপ্রগতিতে বয়লার ঘরে এসে থমকে দাঁড়ায় জয়া। মুর্ হাণ্টার হাতে চালকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে নীরবেই খানিক তাকিয়ে দেখে। না, পাজীটার ভ্রূক্ষেপ নেই। গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করে, সিফ্‌ট্ চেঞ্জের ভেঁপু বাজছে না কেন মিষ্টার মুর্?

চমকে ওঠে শয়তান। পেছন ফিরে জবাব দেয়, টাইম চেঞ্জ হোয়েচে ম্যাডাম্।

শ্রমিকরা এ খবর জানে?

নো ম্যাডাম।

আইনত তাদের আপনি বেশী সময় খাটাতে পারেন না। হুইসেল বাজিয়ে দিন।

আমি তা পারে না ম্যাডাম। বহুৎ গোলমাল শুরু হোবে।

আমি যা বলছি শুনুন। এক্ষুনি হুইসেল বাজিয়ে দিন।

আপনাকে বহুৎ বহুৎ সেলাম করে। লেকিন সেটি হোবে না। শেঠজী মানা কিয়া।...

আলবৎ হবে।...আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করে জয়া নিজেই ছুটে গিয়ে চেন্ টানে। ভোঁ ভোঁ শব্দে বেজে ওঠে ভেঁপু।

মুর্ ক্ষিপ্ত হয়ে বিলাপ শুরু করে, কি কর্‌ল্যান ম্যাডাম কি কর্‌ল্যান। সর্বনাশ হো গিয়া...

জয়া সে কথায় কাণ না দিয়ে—তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে গাড়ী বারান্দায় উঠে আসে। সহস্র সহস্র শ্রমিক জড় হয় এসে লবীতে।

পল্লীর পথ ধরে এগিয়ে আসছে উদ্বাস্তুদের মিছিল। পরিচালনা করছে কে ও? বিজয়া না?…হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিজয়া…সতীনাথ…ঐ ত' মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ··বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে শত সহস্র মানুষ। খুনেরা এখনই শেষ করে দেবে। বিজয়া…বিজয়া…কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে জয়ার।…সতীনাথ অবাক হয়ে যায়। দূর থেকেই চিনতে পারে জয়াকে। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে দ্রুত এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে প্রাণপণ। রাইফেল গর্জে ওঠে মুহুর্মুহু। মিছিল তবু থামে না। ক্যাপ্‌টেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মেসিন গান চালিয়েও রোধ করতে পারে না দুর্বার জনস্রোত।…

বাক শক্তি লুপ্ত প্রায় জয়ার। আর একবার শেষ আবেদন জানায় শইসব, ভাইয়ের বুকে গুলি ছু-রো-না…এ-গি-য়ে যা-ও…মিলিয়ে যায় কণ্ঠস্বর।…

শেষ